বিশ্বনবীর পরিবার
বা
আহলে বাইত

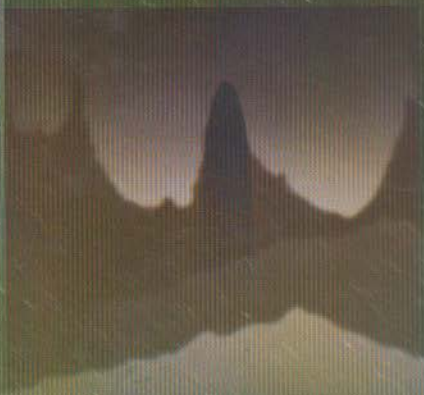

নাসির হেলাল

বিশ্বনবীর পরিবার

বা

আহলে বাইত

নাসির হেলাল

খন্দকার প্রকাশনী

www.pathagar.com

বিশ্বনবীর পরিবার
বা
আহলে বাইত

নাসির হেলাল

প্রকাশক
খন্দকার প্রকাশনী
বাংলাবাজার বুক এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
জুন, ১৯৯৮

২য় মুদ্রণ
জুলাই, ২০০০

স্বত্ব
মেহেরুন নেছা মিলি

প্রচ্ছদ পরিকল্পনায়
নাছির হেলাল

বর্ণ বিন্যাস
মডার্ণ কম্পিউটার সেন্টার
৪৮, বাংলাবাজার, ঢাকা

মুদ্রণ
হেরা প্রিন্টার্স

দাম ঃ একশত টাকা।

www.pathagar.com

জান্নাতবাসী
শ্বশুর
হযরত মাওলানা আবদুল খালেক-এর
আত্মার মাগফেরাতের উদ্দেশ্যে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

নিঃসন্দেহে বিশ্বনবী (স.)-এর পরিবারই দুনিয়ার সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিবার। আর রাসূল (স.) যাঁদেরকে নিজের আহাল বলে ঘোষণা দিয়েছেন তারা হলেন শ্রেষ্ঠ মানুষ। অবশ্য একথা প্রতিটি মুমীন মুসলমান একান্তভাবে বিশ্বাস করেন।

বাজারে নানা বিষয়ে বই পত্র থাকলেও আহলে বাইত বা বিশ্বনবীর পরিবারের ওপর বাংলা ভাষায় খুব বেশি বই নজরে আসে না। সেই অভাবকে পুরণ করেছেন প্রখ্যাত গবেষক ও লেখক কবি *নাসির হেলাল*।

তিনি তাঁর স্বভাব সুলভ সহজ সরল ভাষায় নবী পরিবারের সদস্য-সদস্যাদের জীবনী অত্যন্ত মমতার সাথে ও নিপূণতার সাথে উপস্থাপন করেছেন। অবশ্য ইতোপূর্বে প্রকাশিত তাঁর লেখা– *'বেহেশতের সুসংবাদ পেলেন যাঁরা'*, *'মুমীনদের মা'* ও *'নবী দুলালী'* গ্রন্থ তিনটি ব্যাপক পাঠক প্রিয়তা পেয়েছে।

এ গ্রন্থটিতে লেখক প্রথমেই *'আহলে বাইত'* কারা, সে সম্বন্ধে কোরআন হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে *'আহলে বাইত'* শিরোনামে একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধ পেশ করেছেন। এরপর মর্যাদা অনুযায়ী নবী পরিবারের সম্মানিত সদস্যদের জীবনী আলোচনা করেছেন। বিশেষ করে হযরত আলী (রা.) ও হযরত হোসাইন (রা.)-র জীবনী, সাথে সাথে কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা ভিন্ন মাত্রায় উপস্থাপিত হয়েছে। আশাকরি গ্রন্থটি সকল বয়সের মানুষের কাছে ভাল লাগবে।

গ্রন্থটির কোথাও যদি কোনো ত্রুটি কোনো পাঠকের চোখে পড়ে তা লিখিতভাবে জানালে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

গ্রন্থটি প্রকাশ করতে গিয়ে যারা সহযোগীতা করেছেন, তাদের সবাইকে আন্তরিক মোবারকবাদ।

আল্লাহ হাফিজ

খন্দকার মঞ্জুরুল কাদির

www.pathagar.com

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

গবেষণা

১. যশোর জেলার ছড়া (লোক সাহিত্য)
২. যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার
৩. বারবাজারের ঐতিহ্য

সম্পাদনা

৪. মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা রচনাবলী (প্রথম খণ্ড)
৫. মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড, যন্ত্রস্থ)

জীবনী

৬. বেহেশতের সুসংবাদ পেলেন যারা (দ্বিতীয় প্রকাশ)
৭. মু'মীনদের মা
৮. নবী দুলালী
৯. মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা

ইসলামী সাহিত্য

১০. হাদীসের পরিচয়

www.pathagar.com

সূচী

১.	আহলে বাইত	৯
২.	হযরত খাদীজা (রা.)	১২
৩.	হযরত ফাতিমা (রা.)	২১
৪.	হযরত আলী (রা.)	৫৮
৫.	হযরত হাসান (রা.)	৭০
৬.	হযরত হোসাইন (রা.)	৭৫
৭.	হযরত যয়নুল আবেদীন (র.)	৮৫
৮.	হযরত যয়নাব (রা.)	৯৪
৯.	হযরত রুকাইয়া (রা.)	১০৩
১০.	উম্মে কুলছুম (রা.)	১১০
১১.	হযরত ইবরাহীম (রা.)	১১৩
১২.	হযরত সাওদা (রা.)	১১৫
১৩.	হযরত আয়েশা (রা.)	১২০
১৪.	হযরত হাবসা (রা.)	১৩৫
১৫.	হযরত যয়নব (রা.)	১৪৩
১৬.	হযরত উম্মে সালমা (রা.)	১৪৬
১৭.	হযরত জয়নব (রা.)	১৫৪
১৮.	হযরত জুয়াইরিয়া (রা.)	১৬১
১৯.	হযরত উম্মে হাবীবা (রা.)	১৬৫
২০.	হযরত সুফিয়া (রা.)	১৬৯
২১.	হযরত মায়মুনা (রা.)	১৭৪
২২.	হযরত রায়হানা (রা.)	১৭৭
২৩.	হযরত মারিয়া (রা.)	১৭৮
২৪.	বিশ্ব নবীর চাচাগণ	১৮১
২৫.	হযরত হামযা (রা.)	১৮১
২৬.	হযরত আব্বাস (রা.)	১৮৯
২৭.	গ্রন্থপঞ্জী	১৯২

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আহ্‌লে বাইত

اَللّٰهُمَّ هٰؤُلَاءِ اَهْلُ بَيْتِىْ فَاذْهَبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيْرًا -

'হে আল্লাহ্! এরা আমার পরিবার-পরিজন। আপনি এদের থেকে অপবিত্রতা দূর করুন এবং এদেরকে পবিত্র করুন।'

কথাগুলি রাসূল (সা.) হযরত উম্মে সালমা (রা.)-র গৃহে অবস্থান কালীন সময়ে হযরত আলী, হযরত ফাতিমা, হযরত হাসান এবং হযরত হোসাইনকে একত্র করে একটি কম্বলের নীচে নিয়ে যখন বলেছিলেন তখন নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়েছিল–

اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا -

'আল্লাহ্ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পুত পবিত্র করতে।' (সূরা আহযাব–৩৩)

উম্মে সালমা (রা.) বলেন, এই আয়াত যখন নাযিল হয় তখন রাসূল (সা.) আমার গৃহে ছিলেন। রাসূল (সা.)-এর একথা শুনে আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি কি আহ্‌লে বাইত নই? রাসূলে কারীম (সা.) জবাব দিলেন–

بَلٰى اِنْشَاءَ اللّٰهُ অবশ্যই।

যায়েদ ইবনে আকরাম (রা.) হতে বর্ণিত আছে, 'মক্কা এবং মদীনার মধ্য পথে গাদীরে খুম নামক স্থানে আল্লাহ্ পাকের হামদ, ও নাত এবং ওয়াজ-নসীহতের সময়ে রাসূলে পাক সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বলেন, 'হে মানবমন্ডলী! ভাল করে শোন, আমি কিন্তু মানুষ! সুতরাং যখন ফেরেশ্‌তা জান কবজ করার জন্য আসবে, তার সাথে আমাকে অবশ্যই সাড়া দিতে হবে। আমি তোমাদের জন্য দুই জিনিস রেখে যাচ্ছি, একটি হচ্ছে–আল্লাহ্‌র পবিত্র কোরআন,

www.pathagar.com

এরমধ্যে হেদায়াত এবং নূর বিদ্যমান রয়েছে। তাই তোমরা আল্লাহ্‌র কোরআনকে আঁকড়ে ধরবে এবং সেই মুতাবেক আমল করবে।'

রাসূল (সা.) একথা তিনবার উচ্চারণ করেন। হযরত হোসাইন (রা.) প্রশ্ন করলেন, হে যায়েদ! আহলে বাইত কারা? রাসূলে পাকের স্ত্রীগণ কি আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত নন? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ রাসূল (সা.)-এর স্ত্রীগণও আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত; তবে মূলতঃ আহলে বাইতের সদস্য তাঁরা যাদের প্রতি ছদকাহ্ গ্রহণ করা হারাম। হোসাইন (রা.) যায়েদ ইবনে আকরাম (রা.) কে প্রশ্ন করলেন, তারা কারা? তিনি বললেন–হযরত আলী, আকীল, জাফর এবং হযরত আব্বাসের পরিবার পরিজন। হোসাইন (রা.) আবার প্রশ্ন করলেন, তাদের সকলের জন্যই ছদকা হারাম করা হয়েছে? তিনি বললেন–হ্যাঁ।'

উপরিউক্ত আলোচনায় কোরআন হাদীসের উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, হযরত আলী, হযরত ফাতিমা, হাসান-হোসাইন (রা.) রাসূল (সা.)-এর স্ত্রী ও সন্তানসন্ততিগণ আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত। অপরদিকে ছাদকাহ্ গ্রহণ করা হারাম সম্পর্কিত হাসীস থেকে জাফর, আকীল ও হযরত আব্বাস (রা.)-র বংশধরগণ আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা প্রমাণ হয়।

তবে গুরুত্বের দিক দিয়ে প্রথমেই আসে হযরত খাদীজাতুল কোবরার নাম। এরপর তাঁদের সন্তানসন্ততিগণ। ছোট বেলায় যারা মৃত্যুবরণ করেছেন, বড় হয়ে বিবাহ্ শাদী হয়েছে, সবাই এর অন্তর্ভুক্ত। এক্ষেত্রে হযরত ফাতিমা (রা.) ও হযরত আলী (রা.) নবীবংশের ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছেন, তাদের মহান দু'সন্তান হযরত হাসান (রা.) ও হোসাইন (রা.)-এর মাধ্যমে। তৃতীয় পর্যায়ে আছেন রাসূল (রা.)-এর পবিত্র স্ত্রীগণ। আর সর্বশেষে আছেন হযরত জাফর, হযরত আকীল ও হযরত আব্বাস (সা.)-এর বংশধরগণ।

আসলে নবী পরিবারই হচ্ছে বিশ্বমুসলিমের জন্য আদর্শ পরিবার, সর্বযুগে অনুসরণ ও অনুকরণ যোগ্য পরিবার।

সহীহ্ আল বুখারীর রেওয়ায়াতে আহলে বাইতের প্রতি এইভাবে সালাত ও সালাম পেশ করতে বলা হয়েছে–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ -

'হে আল্লাহ! আপনি হযরত মুহম্মদ (সা.) ও তার স্ত্রীগণ এবং তাঁর সন্তান-

www.pathagar.com

সন্ততিদের প্রতি অফুরন্ত রহমত নাযিল করুন।'

নবী পরিবারের মর্যাদা সাহাবায়ে কিরামদের নিকটও সব থেকে বেশী ছিল- হযরত আবুবকর (রা.) বলেন, 'আল্লাহর কসম! আমার আত্মীয়তার তুলনায় রাসূলে পাকের আত্মীয়তার মূল্যায়ন আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়।'

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত রাসূল (রা.) ইরশাদ করেন, 'তোমরা আল্লাহ্ পাককে মহব্বত করো, কারণ, তিনি তোমাদেরকে তার নেয়ামত থেকে রিযিক দান করেছেন; আর আমাকে মহব্বত করো, আল্লাহ্ পাকের মহব্বতের জন্য এবং আমার মহব্বতের জন্য আহলে বাইতকে মহব্বত করো।'

আল্লাহ্ পাক নবী পরিবারের মর্যাদা সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন–

وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ -

'তোমরা জেনে রাখ যে, তোমরা যুদ্ধে গণীমতের যা মাল লাভ করো তার এক-পঞ্চামাংশ আল্লাহর রাসূলের, রাসূলের আত্মীয় স্বজনের, ইয়াতীমদের, দরিদ্রদের এবং পথচারীদের।' (সুরা আনফাল–৪১ আঃ)

রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন–

'আমার পরিবার পরিজনের জন্য যাকাতের মাল হালাল নয়।' (সহীহ্ বুখারী)

একটি দীর্ঘ হাদীসের এক জায়গায় রাসূল (সা.) ইরাশাদ করেন–

'সাদকা মুহাম্মদ (সা.)-এর পরিবার পরিজনের জন্য বৈধ নয়, কারণ সাদকা হচ্ছে মানুষের আর্বজনা।'

www.pathagar.com

হযরত খাদীজা (রা.)

তাঁর নাম 'খাদীজা', ডাক নাম 'উম্মুল হিন্দ', উপাধি 'তাহিরা' অর্থাৎ পূণ্যবতী নারী। নবী করীম (সা.)-এর প্রথমা স্ত্রী, প্রথম মুসলমান উম্মুল মু'মীনীনদের প্রধান হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা.) হস্তী বছরের ১৫ বছর পূর্বে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। আব্বার নাম খুওয়ালিদ ইবনে আসাদ ইবনে আবদুল ওয়যা ইবনে কুসাই, মায়ের নাম ফাতিমা বিনতু যায়িদাহ্। আর নানা ছিলেন আসাম ইবনে হারাম ইবনে ওয়াহা ইবনে হাজার ইবনে আব্দ ইবনে মাহীছ ইবনে আমের। উল্লেখ্য যে কয়েক পুরুষ ওপরে গিয়ে খাদীজা (রা.)-র পিতৃকূল ও মাতৃকূল এক ছিল। অর্থাৎ তাঁর উর্ধ্বতন পঞ্চম পুরুষ এবং নবী করীম (সা.)-এর উর্ধ্বতন পঞ্চম পুরুষ একই ব্যক্তি ছিলেন। এই ব্যক্তির নাম ছিল কুসাই। তাহলে বোঝা গেল হযরত খাদীজা বিনতু খুওয়ালিদ (রা.) ছিলেন আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ বংশ কোরাইশ বংশের পূত পবিত্র সন্তান।

হযরত খাদীজা (রা.) নিজেই তৎকালীন আরবে অত্যন্ত মর্যাদা সম্পন্না ও সম্মানিতা একজন মহিলা হিসেবে ব্যাপকভাবে পরিচিতা ছিলেন। সেই জাহেলী যুগেও তাঁর পূত পবিত্র চরিত্রের জন্য তিনি 'তাহিরা' উপাধিতে ভূষিতা হন।

ইনিই সেই সম্মানিতা মহিলা যিনি নবী নন্দিনী হযরত ফাতিমাতু জোহরার মা, ইনিই হাসান ও হোসাইন (রা.)-এর নানি এবং আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনাঢ্য ব্যবসায়ী।

হযরত খাদীজা (রা.)-র বাল্যকাল সম্বন্ধে তেমন কিছুই জানা যায় না। তবে রসূল (সা.)-এর সাথে বিয়ে হবার আগে তাঁর আরও দু'বার বিয়ে হয়েছিল। এরও আগে খাদীজা (রা.)-র আব্বা খুওয়ালিদ তাঁকে বিয়ে দেয়ার জন্য সেই সময়ের বিশিষ্ট তাওরাত ও ইনজীল বিশেষজ্ঞ ওয়ারাকা ইবনে নাওফিলের সাথে সম্বন্ধ ঠিক করেন। ওয়ারাকা খাদীজার চাচাত ভাই ছিলেন। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক সে বিয়ে হয়নি। পরে আবূ হালা ইবনে যাররাহ্ আত-তামীমীর সাথে তাঁর প্রথম বিয়ে হয়। এ স্বামীর ঔরসে তাঁর গর্ভে দু'জন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। যাঁদের নাম ছিল হালা ও হিন্দ। রসূল (সা.) নবুয়াত প্রাপ্তির পর এ দু'জনই ইসলাম কবুল করেন এবং সম্মানিত সাহাবা হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। কিন্তু তাদের পিতা আবূ হালা ইবনে যাররাহ সেই যাহেলী যুগেই ইন্তেকাল করেন।

www.pathagar.com

প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর হযরত খাদীজা (রা.) আতীক বিন আবিদ আল-মাখযুমীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এ স্বামীর ঔরসে হিন্দা নামে তাঁর এক কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। ইনিও ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নেন এবং সম্মানিত মহিলা সাহাবীর মর্যাদা লাভ করেন। দ্বিতীয় স্বামী আতিকের মৃত্যু হলে তিনি বিশেষভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যে মনোনিবেশ করেন।

সমস্ত ঐতিহাসিকগণ এক বাক্যে স্বীকার করেছেন যে, আরবের সেই জাহেলী যুগে মক্কার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদশালী ব্যবসায়ী ছিলেন হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা.)। জানা যায় তাঁর বাণিজ্য বহর যখন সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করত তখন দেখা যেতো একা খাদিজার পণ্য সামগ্রী কুরাইশদের সমগ্র সমাগ্রীর সমান।

পিতার মৃত্যুর পর খাদীজা (রা.)-র পক্ষে ব্যবসা পরিচালনা করা একটু কঠিন হয়ে পড়ে। কারণ তাঁর পিতার ব্যবসা আরবের বাইরেও বিস্তৃত ছিল। এজন্য তিনি একজন বিশ্বস্ত লোক খুঁজতে লাগলেন যাতে তাঁর ব্যবসা দেশের বাইরেও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়।

নবী করীম (সা.) তখন ২৫ বছরের যুবক। ইতোমধ্যেই তিনি তাঁর চাচা আবূ তালিবের সাথে ও আলাদাভাবে কয়েকবার বাণিজ্য সফরে গিয়ে প্রভূত সাফল্য বয়ে এনেছিলেন। সাথে সাথে ব্যবসা সম্পর্কিত পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা ও অর্জন করেছিলেন। অন্যদিকে তিনি নানাবিধ সামাজিক কার্যক্রমে জড়িত হওয়ার কারণে সর্বোপরি ঐ বয়সেই আল-আমীন উপাধিতে ভূষিত হওয়া সমগ্র আরবে তিনি পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর সততা, নিষ্ঠা, আমানতদারিতা, ন্যায়-পরায়ণতা, বিশ্বস্ততা ও চারিত্রিক মাধুর্যতার কথা খাদিজা (রা.)-র কানেও পৌঁছতে দেরি হয়নি।

এদিকে খাদিজা (রা.) তাঁর ব্যবসা পরিচালনা করার জন্য বিশ্বস্ত লোক খুঁজছেন জানতে পেরে রসূল (সা.)-এর চাচা আবূ তালিব তাঁকে ডেকে বললেন, 'ভাতিজা! আমি একজন দরিদ্র মানুষ, সময়টাও খুব সংকটজনক। মারাত্মক দুর্ভিক্ষের কবলে আমরা নিপতিত। আমাদের কোন ব্যবসায় বা অন্য কোন উপায়-উপকরণ নেই। তোমার গোত্রের একটি বাণিজ্য কাফেলা সিরিয়া যাচ্ছে। খাদীজা তাঁর পণ্যের সাথে পাঠানোর জন্য কিছু লোকের খোঁজ করছেন। তুমি যদি তাঁর কাছে যেতে, হয়তো তোমাকেই তিনি নির্বাচন করতেন। তোমার চারিত্রিক নিষ্কলুষতা তাঁর জানা আছে।' চাচা আবূ তালিবের প্রস্তাবের জবাবে রসূল (সা.) বললেন, 'সম্ভবতঃ তিনি নিজেই লোক পাঠাবেন।'

দেখা গেল সত্যি সত্যিই খাদীজা (রা.) লোক পাঠিয়েছেন, 'মুহাম্মদ (সা.) যদি তাঁর ব্যবসার পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে সিরিয়া যান তো তিনি তাঁকে অন্যদের

www.pathagar.com

তুলনায় দ্বিগুণ মুনাফা দেবেন।' রসূল (সা.) রাজি হয়ে গেলেন এবং একদিন সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন।

সিরিয়ার পথে এক গীর্জার পাশে একটি গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নেয়ার জন্য বাণিজ্য কাফেলা নামিয়ে বসলেন রসূল (সা.)। সংগে আছে খাদীজা (রা.)-র বিশ্বস্ত দাস মায়সারা। এ সময় গীর্জার পাদ্রী এগিয়ে এসে মায়সারাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'গাছের নিচে বিশ্রামরত লোকিট কে?' মায়সারা বললেন, 'মক্কার হারামবাসী কোরাইশ গোত্রের একটি লোক।' পাদ্রী বললেন, 'এখন এই গাছের নিচে যিনি বিশ্রাম নিচ্ছেন তিনি একজন নবী ছাড়া আর কেউ নন।' ঐ পাদ্রীর নাম 'নাসতুরা'। অবশ্য কোন কোন ঐতিহাসিক বলেছেন ঐ পাদ্রীর নাম ছিল 'বুহাইরা'।

সিরিয়ার বাজারে গিয়ে যথাসম্ভব উচ্চ মূল্যে পণ্য-সামগ্রী বিক্রি করে প্রয়োজনীয় মাল সামান কম মূল্যে ক্রয় করলেন রসূল (সা.)। তারপর সংগী মায়সারাকে নিয়ে মক্কার পথে রওয়ানা হলেন। পথ চলতে চলতে মায়সারা তাজ্জব হয়ে লক্ষ্য করলেন, 'নবী করীম (সা.) তাঁর উটের পিঠে সওয়ার হয়ে চলেছেন, আর দু'জন ফেরেশতা দুপুরের প্রচণ্ড রোদ থেকে বাঁচানোর জন্য তাঁর মাথার ওপর ছায়া বিস্তার করে আছে।' এভাবে তাঁরা মক্কায় ফিরলেন। ঘরে ফিরেই মায়সারা তাঁর মনিব খাদিজা (রা.)-কে পাদ্রীর মন্তব্য ও পথের ঘটনা সব খুলে বললেন।

মক্কায় ফিরে সিরিয়া থেকে আনা পণ্য-সামগ্রী বিক্রি করে দিয়ে রসূল (সা.) দেখলেন এ যাত্রা প্রায় দ্বিগুণ মুনাফা অর্জিত হয়েছে। তিনি সমস্ত হিসাব-নিকাশ খাদীজা (রা.)-কে বুঝিয়ে দিলেন।

সুন্দরী, বুদ্ধিমতি, বিচক্ষণ সর্বপরি অসম্ভব ভদ্রমহিলা ছিলেন হযরত খাদীজা (রা.)। কিন্তু তিনি ছিলেন একজন বিধবা। যে কারণে মক্কার অনেক সম্ভ্রান্ত কোরাইশ যুবক তাঁকে বিয়ে করতে আগ্রহী ছিলেন। তাদের অনেকে প্রস্তাবও পঠিয়েছিলেন। সে সব প্রস্তাব খাদীজা (রা.) বিনয়ের সাথে প্রত্যাখ্যান করেন। এরপর অনুগত ও প্রিয় দাস মায়সারার নিকট রসূল (সা.) সম্বন্ধে বিস্তারিত জানার পর হযরত ইয়ালার স্ত্রী ও খাদীজা (রা.)-র বান্ধবী 'নাফিসা বিনতু মানিয়া'র মাধ্যমে রসূল (সা.)-এর নিকট বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। নাফিসা রসূল (সা.)-এর নিকট এভাবে প্রস্তাব পেশ করেন, 'আপনাকে যদি ধন-সম্পদ, সৌন্দর্য ও জীবিকার নিশ্চয়তার দিকে আহবান জানানো হয়, আপনি কি গ্রহণ করবেন?'

এখানে সকলের অবগতির জন্য একটি তথ্য দিয়ে রাখি, আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে আরবের সেই জাহেলী যুগেও মেয়েদের বিয়ের ব্যাপারে তাদের

www.pathagar.com

মতামতের স্বধীনতা ছিল। তারা নিজেদের বিয়ে-শাদী সম্পর্কে নিজেরা সরাসরি কথা বলতে পারতো। প্রাপ্ত বয়স্কা ও অপ্রাপ্ত বয়স্কা সবাই সমভাবে এ অ ধিকার ভোগ করতো।

যে কারণে খাদীজা (রা.)-র চাচা বেঁচে থাকা অবস্থায়ও তিনি সরাসরি রসূল (সা.)-এর নিকট নিজের বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। রসূল (সা.) প্রস্তাব গ্রহণ করলে খাদীজা (রা.)-র চাচা আমর বিন আসাদের পরামর্শে পাঁচশ' স্বর্ণমুদ্রা দেনমোহর ধার্য করা হয়।

বিয়ের দিন রসূল (সা.)-এর পক্ষ থেকে খাদীজা (রা.)-র বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেন, আবূ তালিব, হামজা (রা.)-সহ তাঁর খান্দানের আরো কিছু লোক। খাদিজার পক্ষ থেকেও বেশ কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত হলেন। উভয়পক্ষের বিশিষ্ট মেহমানদের উপস্থিতিতে আবূ তালিব প্রাণপ্রিয় ভাতিজার বিয়ের খোতবা পাঠ করেন এবং বিয়ে পড়ান। এ সময়ে নবী করীম (সা.)-এর বয়স ছিল মাত্র ২৫ বছর, আর খাদীজা (রা.)-র বয়স ছিল ৪০ বছর।

হ্যাঁ! রসূল (সা.) হযরত খাদিজা (রা.)-র চেয়ে ১৫ বছরের ছোট ছিলেন।

এই বিয়ের ১৫ বছর পর অর্থাৎ রসূল (সা.)-এর বয়স যখন ৪০ বছর তখন তিনি নবুয়াত লাভ করেন। হেরা গুহায় প্রথম অহী নাযিলের বিষয়টি সর্বপ্রথম তিনি খাদীজা (রা.)-কে জানান। খাদীজা (রা.) তো তাঁর বিয়ের পূর্ব থেকেই রসূল (সা.)-এর নবী হওয়া সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। যে কারণে তিনি বিষয়টি সামলে নিতে পেরেছিলেন। এ ব্যাপারে সহীহ বুখারী শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে— হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, 'রসূল (সা.)-এর প্রতি প্রথম ওহীর সূচনা হয় ঘুমে সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। স্বপ্নে যা কিছু দেখতেন তা সকালবেলার সূর্যের আলোর মত প্রকাশ পেত। তারপর তিনি নির্জনে থাকতে ভালবাসতেন। খানাপিনা সংগে নিয়ে হেরা গুহায় চলে যেতেন। সেখানে একাধারে কয়েকদিন ইবাদতে মশগুল থাকতেন। খাবার শেষ হয়ে গেলে আবার খাদীজার কাছে ফিরে আসতেন। খাদ্যদ্রব্য নিয়ে আবার গুহায় ফিরে যেতেন। এ বস্থায় একদিন তাঁর কাছে সত্যের আগমন হলো। ফেরেশতা এসে তাঁকে বললেন, আপনি পড়ুন। তিনি বললেন, আমি তো পড়া-লেখার লোক নই। ফেরেশতা তাঁকে এমন জোরে চেপে ধরলেন যে, তিনি কষ্ট অনুভব করলেন। ছেড়ে দিয়ে আবার বললেন, পড়ুন। তিনি আবারো বললেন, আমি পড়া-লেখার লোক নই। ফেরেশতা দ্বিতীয় ও তৃতীয়বারও তাঁর সাথে প্রথমবারের মত আচরণ করলেন। অবশেষে বললেন, পড়ুন আপনার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্তপিণ্ড থেকে.....। রসূল (সা.) ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ঘরে ফিরলেন।

www.pathagar.com

খাদীজা (রা.)-কে ডেকে বললেন, আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও, তিনি কম্বল দিয়ে ঢেকে দিলেন। তাঁর ভয় দূর হয়ে গেল। তিনি খাদীজা (রা.)-র নিকট পুরো ঘটনা খুলে বললেন এবং নিজের জীবনের আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করলেন। খাদীজা (রা.) বললেন, না, তা কক্ষনো হতে পারে না। আল্লাহ্‌র কসম, তিনি আপনাক লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি আত্মীয়তার বন্ধন সুদৃঢ়কারী, গরীব-দুঃখীর সাহায্যকারী, অতিথিপরায়ণ ও মানুষের বিপদে সাহায্যকারী। অতঃপর খাদীজা (রা.) রসূলুল্লাহ (সা.)-কে সংগে করে তাঁর চাচাত ভাই ওয়ারাকা ইবনে নাওফলের নিকট নিয়ে যান। সেই জাহেলী যুগে তিনি খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। হিব্রু ভাষায় ইনজীল কিতাব লিখতেন। তখন তিনি বৃদ্ধ ও দৃষ্টিহীন। খাদীজা (রা.) বললেন, শুনুন তো আপনার ভাতিজা কি বলে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ভাতিজা, তোমার বিষয়টি কি? রসূলুল্লাহ (সা.) পুরো ঘটনা বর্ণনা করলেন। শুনে ওয়ারাকা বললেন, এতো সেই 'মানুষ' আল্লাহ যাঁকে মূসা (আ.)-র নিকট পাঠিয়েছিলেন। আফসোস! সেদিন যদি আমি জীবিত ও সুস্থ থাকতাম, যেদিন তোমার দেশবাসী তোমাকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে। রসূলুল্লাহ (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, এরা আমাকে দেশ থেকে বের করে দেবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমি যা নিয়ে এসেছো, যখনই কোন ব্যক্তি তা নিয়ে এসেছে, সারা দুনিয়া তাঁর বিরোধী হয়ে গেছে। যদি সে সময় পর্যন্ত আমি বেঁচে থাকি, তোমাকে সব ধরনের সাহায্য করবো। (সহীহ বুখারী-১ম খন্ড)। ওয়ারাকা এই ঘটনার কিছুদিনের মধ্যেই ইন্তেকাল করেন।

ইসলাম গ্রহণ করার পর থেকে হযরত খাদীজা (রা.) পুরোপুরি রসূলুল্লাহ (সা.)-কে অনুসরণ করা শুরু করেন। নামায ফরজ হওয়ার আগে থেকেই তিনি রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে ঘরের ভেতর নামায আদায় করতেন। এ অবস্থা একদিন বালক আলী দেখে ফেলেন এবং জিজ্ঞেস করেন, 'মুহাম্মদ এ কি?' রসূল (সা.) এ সময় নতুন দীনের দাওয়াত আলী'র কাছে পেশ করেন এবং বিষয়টি গোপন রাখার জন্য বলেন। এ সময় ইসলামের হাল অবস্থা ছিল আফীক আল কিন্দীর ভাষায়, 'আমি জাহেলী যুগে মক্কায় এসেছিলাম স্ত্রীর জন্য আতর এবং কাপড়-চোপড় ক্রয় করতে। সেখানে আব্বাস ইবনে আবদুল মোত্তালেবের কাছে অবস্থান করি। ভোরবেলা কা'বা শরীফের প্রতি আমার দৃষ্টি পড়ে। আব্বাসও আমার সাথে ছিলেন। এ সময় একজন যুবক আগমন করেন এবং আকাশের দিকে তাকিয়ে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়ায়। কিছুক্ষণ পরই একজন নারী এসে এদের পেছনে দাঁড়ায়। এরা দু'জন

www.pathagar.com

যুবকটির পেছনে নামায আদায় করে চলে যায়। তখন আমি আব্বাসকে বললাম, 'আব্বাস! আমি লক্ষ্য করছি, এক বিরাট বিপ্লব ঘটতে যাচ্ছে।' আব্বাস বললেন, 'তুমি কি জান, এ যুবক এবং মহিলাটি কে?' আমি জাবাব দিলাম, 'না।' তিনি বললেন, 'যুবকটি হচ্ছেন আমার ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মোত্তালিব আর শিশুটি হচ্ছে আলী। আবূ তালিব ইবনে আবদুল মোত্তালিবের পুত্র। যে নারীকে তুমি উভয়ের পেছনে নামায আদায় করতে দেখেছো, তিনি হচ্ছেন আমার জোয়ান ভাতিজা মুহাম্মদ-এর স্ত্রী খাদীজা বিনতু খুওয়াইলিদ। আমার ভাতিজার ধারণা, তার ধর্ম খাছ ইসলামী ধর্ম এবং তিনি যা কিছু করেন, আল্লাহ্‌র হুকুমেই করেন। যতদূর আমার জানা আছে, সারা দুনিয়ায় এ তিনজন ছাড়া আর কেউ তাদের দীনের অনুসারী নেই। এ কথা শুনে আমার মনে আকাঙ্ক্ষা জাগে যে, চতুর্থ ব্যক্তি যদি আমি হতাম।' (তাবাকাত ৮ম খন্ড, পৃ-১১)।

পূর্বেই বলেছি হযরত খাদীজা (রা.) তৎকালীন সময় আরবের একজন প্রভাবশালী মহিলা ছিলেন। ফলে তাঁর ইসলাম গ্রহণের প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই তার পিতৃকুলের লোকদের ওপরও পড়ে। জানা যায় তাঁর পিতৃকুল বনু আসাদ ইবনে আবদিল উযযার জীবিত পনের জন বিখ্যাত ব্যক্তির দশজনই ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইসলাম কবুল করেন। এর মধ্যে খাদীজার ভাতিজা হিযামের পুত্র প্রখ্যাত সাহাবা হাকীম জাহেলী যুগে মক্কার 'দারুন নাদওয়ার' পরিচালনার ভার লাভ করেন। অপর ভাতিজা আওয়ামের পুত্র প্রখ্যাত সাহাবী যুবাইর (রা.)। এই যুবাইর (রা.)-এর মা ছিলেন রসূল (সা.)-এর আপন ফুফু। হযরত খাদীজা (রা.)-এক বোন হালা ছিলেন রসূল (সা.)-এর মেয়ে যয়নাব (রা.)-এর স্বামী আবূল আস ইবন রাবী'র মা। এই হালাও ইসলাম কবুল করেছিলেন।

হযরত খাদীজা (রা.) সেই সম্মানিতা মহিলা যিনি নবীজীর নবুয়াতপ্রাপ্তির সুসংবাদ প্রথম শুনেছিলেন। তিনি নির্দ্বিধায় সর্বপ্রথম রসূল (সা.) নবুয়াতে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন এবং ইসলাম কবুল করেছিলেন। সাথে সাথে তাঁর সমস্ত অর্থ-সম্পদ রসূল (সা.)-এর হাতে সোপর্দ করেছিলেন তাঁর ইচ্ছে অনুযায়ী খরচ করার জন্য। রসূল (সা.)-এর সাথে তাঁর ২৫ বছরের দাম্পত্য জীবনে তিনি রসূল (সা.)-এর বিপদে-আপদে, সুখে-দুখে সর্বোত্তম বন্ধুর ভূমিকা পালন করেছেন। একজন শান্ত্বনা ধাত্রী হিসেবে সময়ে-অসময়ে সকল প্রকার সাহায্য সহযোগিতা করেছেন।

রসূল (সা.) নিজেও খাদীজা (রা.)-কে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন। যে কারণে নিজের থেকে ১৫ বছরের বড় খাদীজা (রা.) জীবিত থাকা অবস্থায় তিনি আর

www.pathagar.com

দ্বিতীয় বিবাহ করেন নি। রসূল (সা.) খাদীজা (রা.)-কে কেমন ভালবাসতেন তা হযরত আয়েশা (রা.)-র বর্ণনা থেকে ধারণা করা যায়। তিনি বলেন, 'খাদীজার প্রতি আমার যতটা ঈর্ষা (?) ছিল রসূল (সা.)-এর অন্য কোন স্ত্রীর প্রতি ততটা ছিল না। একদিন রসূলে খোদা (সা.) আমার সামনে তাঁর কথা উল্লেখ করলে আমি ঈর্ষান্বিত হয়ে বলি, 'সে তো ছিল বৃদ্ধা স্ত্রী, এখন আল্লাহ তা'আলা আপনাকে তার চেয়ে উৎকৃষ্ট স্ত্রী দান করেছেন; তবুও আপনি তার কথা কেন স্মরণ করছেন ?' আমার কথা শুনে আল্লাহ্‌র রসূল ক্রুদ্ধ হন। রাগে তাঁর পশম মোবারক উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তিনি বলেন, 'আল্লাহ্‌র কসম, তাঁর চেয়ে উত্তম স্ত্রী আমি পাইনি। যখন সকলে ছিল কাফির, তখন সে ঈমান এনেছিল। যখন সকলে আমাকে অবিশ্বাস করেছিল, তখন সে আমাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছিল। যখন সকলে আমাকে ত্যাগ করেছিল, তখন সে অর্থ-সম্পদ দিয়ে আমার সহায়তা করেছিল। আল্লাহ ত'আলা তাঁর গর্ভেই আমাকে সন্তান দান করেছেন।'

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, 'এরপর আমি অন্তরে অন্তরে বলি-ভবিষ্যতে আমি কখনো খারাপ অর্থে তাঁর নাম মুখে নেবো না।'

চরিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়েও হযরত খাদীজা ছিলেন অতুলনীয়া। যে কারণে রসূল (সা.) বলেছিলেন, 'সত্যিকার অর্থে তিনি ছিলেন সন্তানের মাতা এবং গৃহকর্ত্রী।'

হযরত আবূ হোরায়রা (রা.) তাঁর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেন, রসূল (সা.) বলেছেন, 'দুনিয়ার সমস্ত নারীর ওপর চারজন নারীর মর্যাদা রয়েছে— মরিয়ম বিনতু ইমরান, ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া, খাদীজা বিনতু খুওয়ালিদ এবং ফাতিমা বিনতু মুহাম্মদ।' হারত ইবনে আব্বাস বলেন, রসূল (সা.) মাটির ওপর চারিটি রেখা এঁকে বলেন, 'জান, এটি কি ? সাহাবীরা বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রসূল (সা.)-ই ভাল জানেন। রসূল (সা.) বললেন, 'জান্নাতী নারীদের মধ্যে চারজন সর্বশ্রেষ্ঠ— খাদীজা বিনতু খুওয়াইলিদ, ফাতিমা বিনতু মুহাম্মদ, মরিয়ম বিনতু ইমরান এবং আছিয়া বিনতু মুযাহিম।'

সত্যি কথা বলতে কি, রসূল (সা.) খাদীজার যত তারিফ করতেন অন্য কোন স্ত্রীর ব্যাপারে ততটা করতেন না।

গোটা আরব যখন রসূল (সা.) এর দুশমনে পরিণত হয় অর্থাৎ ইসলাম প্রচারের প্রথম দিকে তখন একদিন নবীজী (সা.)-কে খুঁজতে খাদীজা (রা) বাইরে বের হন। পথে জিবরাইল (আ.) মানুষের রূপ ধরে তাঁর কাছে আসেন এবং রসূল (সা.)-এর খোঁজ খবর নিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু খাদীজা (রা.) ভয় পেয়ে যান এই

www.pathagar.com

ভেবে যে সম্ভবত তিনি শত্রু, রসূল (সা.)-কে হত্যা করার জন্য খোঁজ খবর নিচ্ছেন। সে কারণে তিনি ভয় পেয়ে যান এবং দ্রুত গৃহে ফিরে আসেন। বিষয়টি রসূল (সা.)-কে খুলে বললে তিনি বলেন, 'ঐ ব্যক্তিটি ছিলেন হযরত জিবরাঈল (আ.)। তিনি আমাকে বলে গেছেন, তোমাকে তাঁর সালাম পৌছাতে এবং জান্নাতে এমন গৃহের সুসংবাদ শুনাতে যে গৃহ তৈরি হয়েছে মণি-মাণিক্য দিয়ে, হৈ-চৈ আর কষ্ট ক্লেষ কিছুই থাকবে না সেখানে।'

একটি বর্ণনা থেকে জানা যায়, একবার রসূলে খোদা (সা.) হযরত ফাতিমা (রা.)-কে অসুস্থ অবস্থায় দেখতে যান এবং জিজ্ঞেস করেন, আদরের দুলালী! তোমার কি অবস্থা ? তিনি বললেন, আমি পীড়িত। তদুপরি ঘরে খাবার কিছু নেই। রসূল (সা.) বললেন, কন্যা! তুমি দুনিয়ার নারীদের সরদার। এতে তুমি কি সন্তুষ্ট নও ? হযরত ফাতিমা (রা.) বললেন, 'পিতা! তাহলে মরিয়ম বিনতু ইমরান ?' রসূল (সা.) বললেন, 'তুমি তোমার যুগের নারীদের সরদার। মরিয়ম ছিল অতীতকালের নারীদের মধ্যে সর্বোত্তম। আর খাদীজা বর্তমান উম্মতের সকল নারীদের মধ্যে উত্তম।'

রসূল (সা.) তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী খাদীজার মৃত্যুর পরও তাঁকে ভুলতে পারেন নি। যে জন্য তাঁর মৃত্যুর পর যতবারই বাড়িতে পশু জবেহ হতো, ততবারই তিনি তালাশ করে করে খাদীজার বান্ধবীদের ঘরে ঘরে গোশতও পাঠিয়ে দিতেন।

একবার রসূল (সা.)-এর কাছে হযরত জিবরঈল (আ.) বসে আছেন, এমন সময় সেখানে খাদীজা (রা.) উপস্থিত হলেন। খাদীজাকে দেখে জিবরাঈল (আ.) রসূল (সা.)-কে বললেন, 'তাঁকে মনি-মুক্তার তৈরি একটি বেহেশতী মহলের সুবংবাদ দিন।'

হযরত খাদীজা (রা.)-র গর্ভে রসূল (সা.)-এর ৬টি সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম সন্তানের নাম ছিল কাসিম। যে কারণে রসূল (সা.)-এর ডাক নাম ছিল আবুল কাসিম। হযরত কাসিম (রা.) অল্প বয়সে মক্কায় ইন্তিকাল করেন। জয়নব (রা.) ছিলেন, দ্বিতীয় সন্তান। তৃতীয় সন্তানের নাম ছিল হযরত আবদুল্লাহ। যিনি নবুয়াতপ্রাপ্তির পর জন্মলাভ করেন। হযরত আবদুল্লাহ অল্প বয়সে ইন্তিকাল করেন। হযরত রুকাইয়া (রা.) হলেন চতুর্থ সন্তান। পঞ্চম সন্তনের নাম হযরত উম্মু কুলসুম। আর ষষ্ঠ সন্তান হলেন খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতিমা (রা.)।

নবুয়াতের দশম বছরে রমযান মাসের ১০ তারিখে মক্কায় হযরত খাদীজা (রা.) ইন্তিকাল করেন। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। তখনো নামায বা নামাযে জানাযার বিধান চালু হয়নি। এ জন্য জানাযা ছাড়াই তাঁকে 'হাজুন' নামক

www.pathagar.com

কবরস্থানে দাফন করা হয়। 'হাজুন' মক্কার একটি পাহাড়ের নাম। বর্তমানে এ জান্নাতুল মাওলা বা জান্নাতুল মুয়াল্লা নামে পরিচিত। নবী করীম (সা.) নিজে খাদীজার লাশ কবরে নামান।

খাদীজা (রা.)-র মৃত্যুর পর হযরত ফাতিমা রসূল (সা.)-এর নিকট তাঁর মায়ের অবস্থা জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'তোমার মা খাদীজা (রা.) —সারা (রা এবং বিবি মরিয়মের মধ্যখানে অবস্থান করছেন।'

রসূল (সা.)-এর পৃষ্ঠপোষক চাচা আবূ তালিব হযরত খাদীজা (রা.)-ইন্তিকালের বছরে ইন্তিকাল করেন। অবশ্য একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, আ তালিবের মৃত্যুর তিন দিন পর খাদীজা (রা.) ইন্তিকাল করেন। যাই হোক সময় ছিল রসূল (সা.)-এর একান্ত প্রিয়জন হারানোর দুঃখজনক সময়। এজন্য মুসলি উম্মাহ্‌র নিকট এ বছরটি 'হুযন' বা শোকের বছর নামে অভিহিত হয়েছে।

প্রিয়তমা স্ত্রী হযরত খাদীজা (রা.) যখন প্রিয় দাস যায়িদ বিন হারিসাকে স্বামী হাতে তুলে দিলেন তখন রসূল (সা.) স্ত্রীকে খুশি করার জন্য যায়িদকে আযাদ কা দিলেন। খাদীজার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে আয়েশা (রা.) যখন রসূল (সা.)-কে রাগা চেষ্টা করতেন তখন তিনি বলতেন, 'আল্লাহ আমার অন্তরে তাঁর (খাদীজার) জ ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন।'

www.pathagar.com

হযরত ফাতিমা (রা)

আরব দেশ। আমাদের বাংলাদেশ থেকে পশ্চিম দিকে কয়েক হাজার মাইলের ব্যবধান। শুধু কি তাই? আমাদের দেশের মত সেখানে মাঝে মাঝে ধান, কাউন দেখা না। চোখ ঘুরালেই দেখা যায় না সবুজের সমারোহ। বরং চোখে পড়ে ধু-ধু মরুভূমি। মাঠের পরে মাঠ শুধু বালু আর বালু। হিমেল বাতাসের পরিবর্তে সেখানে বয়ে চলে মরুভূমির লু-হাওয়া। অবশ্য মাঠের ভেতর মাঝে মাঝে খেজুর আর বাবলা গাছের দেখা মেলে। এই আরব দেশের বিখ্যাত নগরীর নাম মক্কা। মক্কা অবশ্য পৃথিবীর সব থেকে প্রাচীন শহর। কারণ হযরত আদম (আ) সর্বপ্রথম এই মক্কা নগরীতেই আল্লাহ্‌র নির্দেশে বায়তুল্লাহ্ অর্থাৎ কাবাঘর নির্মাণ করেছিলেন। যেটা আজ অবধি বিশ্বের মানুষের কাছে আল্লাহ্‌র ঘর হিসাবেই খ্যাত।

পবিত্র মক্কা নগরীতে আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে শ্রেষ্ঠ বংশ হিসাবে কোরাইশ বংশ খ্যাতিমান ছিল। আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহম্মদ (স) এ বংশের শ্রেষ্ঠ সন্তান। অবশ্য আমাদের জাতির পিতা হযরত ইব্রাহীমও এ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। রসূল (স)-এর উর্ধ্বতন একাদশ পুরুষের নাম ছিল 'ফিহির'। তিনি 'কোরাইশ' নামেও পরিচিত ছিলেন। এ কারণে তাঁর বংশ 'কোরাইশ' নামে বিশ্বে পরিচিতি লাভ করে। নারীকুল শিরোমণি হযরত ফাতিমা (রা) এ বংশেই জন্মগ্রহণ করেন।

জন্ম ও পরিচয়

নাম তাঁর ফাতিমা। উপাধি হচ্ছে, যোহরা, তাহেরা, মুতাহ্‌হারা, রাযিয়া, যাকিয়া, মারযিয়া এবং বতুল। পিতার নাম মুহম্মদ। আর মাতার নাম খাদিজা। হ্যাঁ! তিনি নবীকুল শিরোমণি হযরত মুহম্মদ (স)-এর কনিষ্ঠ কন্যা। পিতার দিক থেকে তাঁর বংশ লতিকা হল, ফাতিমা বিনতু মুহম্মদ (স) বিন আবদুল্লাহ্ বিন আবদুল

www.pathagar.com

মুত্তালিব বিন হাশিম বিন আবদুল মন্নাফ বিন কোসাই বিন কিলাব বিন মোরা বিন কা'ব বিন লোবাই বিন গালিব বিন ফিহির (কোরাইশ)। আর মাতার দিক দিয়ে ফাতিমা বিনতু খাদিজা বিনতু খুয়াইলিদ বিন আসাদ বিন আবদুল ওয্যা বিন কুসাই। উল্লেখ্য যে কয়েক পুরুষ ওপরে গিয়ে তাঁর মাতা খাদীজা (রা)-র পিতৃকুল ও মাতৃকুল এক ছিল। অর্থাৎ খাদিজা (রা)-র উর্ধ্বতন পঞ্চম পুরুষ এবং নবী করীম (স)-এর উর্ধ্বতন পঞ্চম পুরুষ একই ব্যক্তি ছিলেন। এই ব্যক্তির নাম ছিল 'কুসাই'।

তৎকালীন বিশ্বে সর্বশ্রেষ্ঠ বংশে অর্থাৎ কোরাইশ বংশে রসূল (স)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির পাঁচ বছর পূর্বে ফাতিমা (রা) জন্মগ্রহণ করেন। এই সময় রসূল (স) -এর বয়স ছিল ৩০ বছর। সে অনুযায়ী হযরত ফাতিমা (রা)-র জন্ম সাল হয় ৬০৫ খৃস্টাব্দ। জানা যায় এ সময়টা ছিল খুবই মোবারক সময়। কারণ কোরাইশরা এ সময় কাবাঘর পুনঃনির্মাণে ব্যস্ত ছিলেন। কাবাঘর নির্মাণ শেষে 'হজরে আসওয়াদ' বা কালো পাথর বসানো নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। আরবের সব গোত্রের লোকেই দাবি করতে লাগলো পাথরটি যথাস্থানে তারাই বসাবে। কারণ এ কাজটিকে তারা সবাই তাদের জন্য সৌভাগ্যের ব্যাপার মনে করতো। বিষয়টি নিয়ে কথা কাটাকাটি করতে করতে তা এক সময় সংঘর্ষের আকার ধারণ করলো। মারামারি-কাটাকাটি বেঁধে যায় যায় অবস্থা। এমতাবস্থায় বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানী আবূ উমাইয়া সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'ক্ষান্ত হও, আমার কথা শোন। সামান্য কারণে রক্তপাত করবে কেন? ধৈর্য ধরে অপেক্ষা কর। আমার প্রস্তাব ঃ যে ব্যক্তি আজ সর্বপ্রথম কাবাঘরে প্রবেশ করবে তার ওপরই বিবাদের ফয়সালার ভার দেয়া হোক। সে যে সিদ্ধান্ত করবে, তাই আমরা মাথা পেতে নেব। এ কথায় সবাই রাযি তো?'

আবূ উমাইয়ার কথা সবাই একবাক্যে মেনে নিল।

সে অনুযায়ী সকালে কাবাঘরে প্রথম প্রবেশকারী হযরত মুহম্মদ (স) এ সমস্যার সমাধান করেন। তিনি সব কথা শুনে একটি চাদর বিছিয়ে নিজ হাতে 'কৃষ্ণ পাথর' চাদরের মাঝখানে রেখে প্রতি গোত্রের একজন প্রতিনিধিকে চাদরের প্রান্ত ধরতে বললেন এবং যথাস্থানে নিতে বললেন।

সে মুতাবিক পাথর যথাস্থানে নেয়া হলে পুনরায় রসূল (স) নিজ হাতে সেটি তুলে নিয়ে ঠিক জায়গায় স্থাপন করলেন। এভাবে সেদিন আরবের একটি ভয়াবহ যুদ্ধ বন্ধ হয়েছিল এবং উপস্থিত সবাই মহানবীর বুদ্ধিমত্তা দেখে পুলকিত হয়েছিল। ঐদিন বাড়ি ফিরেই রসূল (স) শুনলেন ফাতিমা (রা)-র জন্ম সংবাদ।

www.pathagar.com

কাবাঘরের সংস্কারের কাজ সমাপ্তকালীন সময়ে ফাতিমা (রা)-র জন্ম হওয়ায় আরবের মানুষ ঐ সময়টাকে অতি পবিত্র বলে মান্য করে।

রসূল (স) খুশি হয়ে কন্যার নাম রাখলেন 'ফাতিমা'। আরবী 'ফতম' শব্দ হতে যার উৎপত্তি। যার বাংলা অর্থ হল, রক্ষা করা। পরবর্তীকালে এই ফাতিমা (রা)-র বংশই নবী বংশকে রক্ষা করেছে বা অব্যাহত রেখেছে। তিনি অসম্ভব রূপবতী একজন মহিলা হিসাবে আরবে পরিচিতি লাভ করেন। যে কারণে তাঁর নামের সাথে যুক্ত হয় যোহরা, যার অর্থ কুসুম কলি। তাঁকে রাজিয়া ও মারজিয়া এ কারণে বলা হয় যে, তিনি আল্লাহ্‌র ওপর পূর্ণ আস্থাশীল ছিলেন। নিজের ষড়রিপুকে পূর্ণ আয়ত্বে রাখার কারণে তাঁর উপাধি হয় 'যাকিয়া' বা সংযমী। অন্যদিকে সকল প্রকার ভোগ বিলাস, বর্জন করার জন্য তাকে 'বতুল' বা বর্জনকারিণী উপাধিতে ভূষিত করা হয়। আপন যোগ্যতা বলে নারী জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের আসন অধিকার করার জন্য তিনি 'সাইয়েদা' বা নেত্রী, শ্রেষ্ঠা হিসাবে দুনিয়ায় পরিচিতা হয়ে আছেন।

বাল্য ও শিক্ষা

শৈশবে ফাতিমা (রা) ছিলেন অত্যন্ত ধীর-স্থির ও গম্ভীর প্রকৃতির। এ বয়সের ছেলে মেয়েরা সাধারণত খেলাধুলা ও দৌড়-ঝাপ করে কাটায়। কিন্তু ফাতিমা (রা) ছিলেন এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। তিনি শিশুকাল থেকেই ছিলেন একান্ত নির্জন প্রিয়। তাকে কখনোই সমবয়সীদের সাথে খেলাধুলা করতে দেখা যায়নি। মায়ের পাশে পাশে থাকতেই তিনি বেশি ভাল- বাসতেন।

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, নবী-রসূলদের সর্দার হযরত মুহম্মদ (স) তাঁর পিতা আর নারীকুলের সর্দার তৎকালীন আরবের সব থেকে ধনাঢ্য, সব থেকে সম্মানিতা মহিলা হযরত খাদিজা (রা) তাঁর মাতা। অতএব বুঝতেই পারছো এই পরিবারের পরিবেশ নিঃসন্দেহে সব থেকে ভাল পরিবেশ ছিল। সেই পরিবেশেই লালিতা-পালিতা হয়েছেন মা ফাতিমা।

এখনকার মতো তখন স্কুল-কলেজ ছিল না ঠিকই কিন্তু পারিবারিক শিক্ষা ছিল। আমরা জানি এ সময় কোরাইশ বংশে ১৭ জন শিক্ষিত মানুষ ছিলেন। তাই রসূল (স) ও মা খাদিজা (রা) তাদের আদরের দুলালীকে সম্পূর্ণ পারিবারিক পরিবেশে বিশেষভাবে গড়ে তোলেন।

ফাতিমা (রা) নানা বিষয়ে পিতা-মাতার কাছে এমন সব প্রশ্ন করতেন যাতে তাঁর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় ফুটে উঠতো। একবার খাদিজা (রা) যখন ফাতিমাকে

www.pathagar.com

নানা বিষয় বুঝাচ্ছিলেন এমন সময় তিনি (ফাতিমা) প্রশ্ন করেন, 'আম্মাজান! আল্লাহ্‌র অসংখ্য কুদরত আমরা দেখতে পাই। আল্লাহ্ কি স্বয়ং দেখা দিতে পারেন না?'

মা খাদিজা (রা) উত্তরে বললেন, 'বেটি আমার! যদি আমরা দুনিয়ায় ভালো কাজ এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করি তা'হলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির হকদার হবো এবং সেখানেই আল্লাহ্‌র দর্শন লাভ ঘটবে।'

এমনিভাবে দিনে দিনে ফাতিমা'র মধ্যে আল্লাহপ্রেম, আল্লাহ্‌র প্রতি আস্থা, সত্যবাদিতা, ধৈর্য, বিনয়, নম্রতা, সদাচার, পরোপকার ইত্যাদি গুণাবলীর সৃষ্টি হয়। গল্পচ্ছলে খাদিজা (রা) মেয়েকে পূর্ববর্তী নবী-রসূলদের কিচ্ছা, ইসলামের মহাত্ম শিক্ষা দিয়েছেন।

ফাতিমা (রা) নবী দুলালী হিসাবে যাতে অহংকারীনি হয়ে না ওঠে সে কথা ভেবে রসূল (স) মাঝে মাঝে মেয়ের কাছে ডেকে বলতেন, 'পিতৃ পুরুষের আর জাগতিক ঐশ্বর্যের পরিচয়ই মানুষের সত্যিকারের পরিচয় নয়। বরং, কাল কিয়ামতের ময়দানে তার পরিচয় সে নিজে এবং ইহলোকে সঞ্চিত তার আমলসমূহই।'

একবার ফাতিমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'ফাতিমা! মুহম্মদ (স)-র কন্যা বলে নিজে আমল শূন্য হলে কাল কিয়ামতের ময়দানে রক্ষা পাবে না। মনে রাখবে, কঠিন হাশরের দিনে আল্লাহ্ কারো খাতির করবেন না।'

ছোটবেলা থেকেই ফাতিমা (রা) অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। একবার হযরত খাদিজা (রা)-র এক আত্মীয়ের বিয়ে উপলক্ষে সেখানে যাওয়ার জন্য ফাতিমাকে ভালো জামা-কাপড় ও গহনা তৈরি করে দেয়। কিন্তু আশ্চর্য একরত্তি মেয়ে ফাতিমা ঐ নতুন জামা-কাপড় ও গহনা পরে বিয়ে বাড়িতে যেতে স্পষ্টভাবে অস্বীকার করেন এবং বিয়েতে পুরানো কাপড়-চোপড় পরেই অংশ নেন।

হযরত খাদিজা (রা) নবুয়তের দশম বছরে ইন্তেকাল করেন। ফলে হযরত ফাতিমা (রা)-র ওপর বিপদের পাহাড় নেমে আসে। অতটুকু মানুষের পক্ষে সংসারের কাজ সামলানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। এমনকি এ সময়ে খোদ রসূল (স) নিজ হাতে বাসন-কোসন পর্যন্ত পরিষ্কার করেছেন। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ ও ফাতিমা (রা)-র দেখাশোনার জন্য আত্মীয়-স্বজনের অনুরোধে রসূল (স) হযরত সাওদা (রা)-কে বিয়ে করেন।

রসূল (স) যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন ফাতিমা (রা)-কে প্রয়োজনবোধে শিক্ষার উদ্দেশ্য সবক দিতেন। একদিন রসূল (স) ফাতিমা (রা)-র ঘরে গিয়ে

www.pathagar.com

দেখলেন, তাঁর আদরের দুলালী মূল্যবান কাপড় পরে সেজে-গুঁজে রয়েছেন। এ দৃশ্য দেখে তৎক্ষণাত রসূল (স) ব্যথা-ভারাক্রান্ত মনে বললেন, 'মা আমার! দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী বিলাসিতাকে যারা বর্জন করে তাদের জন্যই আল্লাহ্ রেখেছেন পরকালে অফুরন্ত বিলাস সামগ্রী এবং জান্নাতের অফুরন্ত সুখ। এ দুনিয়ার ঐশ্বর্য আর ধন-সম্পদকেই যে মানুষ সুখের উৎস হিসেবে গ্রহণ করে, সত্যিকারের সুখ তাদের কোনদিন নসীব হয় না মা। মনে রাখবে! আমাদের লক্ষ্যস্থল দুনিয়ার ধন-সম্পদ আর বিলাসিতা নয় বরং নেক আমল আর সৎ আখলাকই আমাদের সত্যিকারের পুঁজি। তাই দুনিয়ার ধন-সম্পদ বিলাসিতার জন্য নয় বরং, বেঁচে থাকার তাগিদে যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই গ্রহণ কর। এর অধিক নয়।

মনে রাখবে! 'জগতের ধন-সম্পদই যেন তোমার এ পৃথিবীতে জন্ম নেয়ার মূল উদ্দেশ্যে পরিণত না হয়। কারণ, দুনিয়া যাদের কাছে চিরস্থায়ী, ধন-সম্পদ লাভে ব্যস্ত থাকবে শুধু তারাই। আর তাদের এ ধন-সম্পদ লাভের উদ্দেশ্য বিলাসপূর্ণ জীবন যাপন। অথচ, এটাই আল্লাহ্র কাছে সবচাইতে বেশি অপছন্দের। তাই এ পথকে পরিহারের চেষ্টা কর। তবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভে সক্ষম হবে।'

রসূল (স) যখন নবুয়ত প্রাপ্ত হন তখন ফাতিমা (রা)-র বয়স মাত্র পাঁচ বছর। নবুয়ত প্রাপ্তির প্রথমদিকে গোপনে পরে প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত রসূল (স) মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দিতে লাগলেন। এ সময়টা ছিলো রসূল (সঃ)-এর নিকট সবথেকে বিপদসঙ্কুল। দাওয়াতী কাজের ৩/৪ বছরের ভিতরেই চারিদিকে প্রচুর শত্রুর জন্ম হয়। এমনকি কোরইশরা ঠাট্টা, বিদ্রুপ, অপমান করতে শুরু করে।

একবার তো কাবা শরীফে রসূল (স) যখন নামায আদায় করছিলেন তখন কাফিররা, উটের পঁচা নাড়িভূড়ি এনে সিজদারত রসূল (স)-র ঘাড়ের ওপর চাপিয়ে দিলো। উকবাহ্ বিন আবূ মুঈত নামে এক নরাধমের নেতৃত্বে এ গর্হিত কাজটি করা হয়। শিশু ফাতিমার কানে এ কথা পৌঁছুতেই তিনি পাগলের মতো কাবাঘরে ছুটে এলেন এবং কারো পরোওয়া না করে পিতার গর্দান থেকে ময়লা সরিয়ে ফেললেন। কাফিররা এ সময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছিল আর হাতে তালি দিচ্ছিল। ৮/৯ বছর বয়সের ফাতিমা (রা) এ দৃশ্য দেখে কাফিরদের দিকে ঘৃণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, 'হতভাগারা! আহকামুল হাকীমিন তোমাদের এই অপকর্মের অবশ্যই শাস্তি দিবেন।'

www.pathagar.com

জানা যায় বদরের যুদ্ধে এই কমবখতগুলো মুসলমানদের হাতে অত্যন্ত করুণভাবে মৃত্যুবরণ করে।

ইসলামের দাওয়াতী কাজে রসূল (স) যখন খুবই ব্যস্ত ছিলেন তখন কাফিরদের বিরোধিতা ছিল চরমে। যে কারণে ফাতিমা (রা) সব সময় উদ্বিগ্ন থাকতেন। আদরের দুলালীর এই পেরেশানীর কথা বুঝতে পেরে রসূল (স) সান্ত্বনা দিয়ে ফাতিমাকে বলেন, 'প্রিয় বেটি আমার! ঘাবড়িয়ো না। আল্লাহ্ তোমার পিতাকে একা ছেড়ে দেবেন না।'

মদীনায় হিজরত

মক্কার কাফির ও মুশরেকদের অত্যাচার-নির্যাতনের সীমা যখন ছাড়িয়ে গেল তখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হিজরত করার নির্দেশ দেয়া হয়। এই ঐতিহাসিক ঘটনাটি ঘটে নবুয়তপ্রাপ্তির ১৩ তম বছরে। রসূল (স) আপন চাচাত ভাই যুবক আলী (রা)-কে নিজ বিছানায় শুয়ে দিয়ে বন্ধু আবূ বকরকে সাথে নিয়ে মদীনার উদ্দেশ্যে জন্মভূমি মক্কা নগরী ত্যাগ করেন। মক্কার লোকজন রসূল (স)-কে গ্রহণ করতে না পারলেও মদীনাবাসীরা অত্যন্ত সম্মানের সাথে তাঁকে গ্রহণ করেন। এমনকি অচিরেই মদীনার শাসনভার তাঁর ওপর অর্পণ করেন। মদীনার সার্বিক পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুকূলে দেখে কিছুদিন পরেই নিজ পরিবার-পরিজনকে কাছে আনার জন্য হযরত যায়েদ (রা) ও আবূ রাফে (রা)-কে মক্কায় পাঠিয়ে দেন। যায়েদ ও আবূ রাফে ছিলেন রসূল (সঃ)-এর পালক পুত্র এবং গোলাম। তাঁরা মক্কা থেকে হযরত ফাতিমা (রাঃ), হযরত সাওদা (রাঃ), উম্মে কুলসুম প্রমুখ মহিলাদেরকে মদীনায় নিয়ে আসেন।

বিবাহ্

তৎকালীন সময়ের রেওয়াজ অনুযায়ী ফাতিমা (রা) যখন মদীনায় হিজরত করেন তখন তিনি বিবাহযোগ্যা। ফলে তাঁর বিয়ের ব্যাপারে সম্বন্ধ আসতে শুরু করলো। এক বর্ণনা মতে হযরত আবূ বকর (রা) নিজে প্রার্থী হয়ে রসূল (স)-এর কাছে পয়গাম পাঠালেন। কিন্তু নবী করীম (স) কোন রা করলেন না অথবা বললেন, 'যা আল্লাহ্র হুকুম হবে।' এরপর হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রা) ফাতিমা (রা)-কে বিয়ে করার প্রস্তাব পাঠালেন। রসূল (স) তাঁকেও একই জবাব দিয়ে বিদায় করলেন। এ ঘটনার পর আবূ বকর (রা), ওমর (রা) ও সায়াদ (রা) পরামর্শ করে হযরত আলী (রা) কে প্রস্তাব দেয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। তিনি রাযিও

www.pathagar.com

হলেন, তবে স্বভাবজাত লজ্জার কারণে রসূল (স)-এর কাছে পেশ করা থেকে বিরত থাকলেন। এমতাবস্থায় হযরত আলী (রা)-র আযাদকৃত একজন বাদী তাঁকে একদিন জিজ্ঞেস করলেন, 'কেউ কি ফাতিমা (রা)-র জন্য পয়গাম পাঠিয়েছেন?' জবাবে আলী (রা) বললেন, 'আমি জানি না।' বাদী বললেন, 'আপনি কেন পয়গাম পাঠাচ্ছেন না?' আলী (রা) বললেন, 'আমার কাছে কি আছে যে, আমি এখন বিয়ে করবো?'

সবকিছু শোনার পর এই মহিলা অনেকটা জোর করেই আলী (রা)-কে রসূল (স)-এর খেদমতে পাঠালেন। তবু স্বভাব শুলভ লজ্জার কারণে আলী (রা) কোন কথা উত্থাপন করতে পারলেন না। বরং তিনি মাথা নীচু করে চুপ চাপ বসে থাকলেন।

আলী (রা)-র ভাব-সাব দেখে রসূল (স) নিজেই জিজ্ঞেস করলেন, 'আলী! কি ব্যাপার আজ যে নিয়ম ভেঙে একেবারে চুপ করে রইলে, ফাতিমা (রা)-র সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছ নাকি?'

উত্তরে আলী (রা) বললেন, 'হ্যাঁ! হে আল্লাহ্‌র রসূল (স)। তখন রসূল (স) আলীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কাছে মোহর আদায় করার মত কিছু আছে কি?'

আলী (রা) জবাবে বললেন, 'সে রকম কোন জিনিসই আমার নেই।'

রসূল (স) বললেন, 'আমি তোমাকে যে যেরাহ বা লৌহবর্ম দিয়েছিলাম, তাই মোহর হিসেবে দিয়ে দাও।'

হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়িয়ে রসূল (স)-এর দরবার থেকে বের হয়ে হযরত আলী (রা) বাজারের দিকে রওনা হলেন বর্মটিসহ। উদ্দেশ্য বর্মটি বিক্রি করা। পথে দেখা হলো হযরত ওসমান (রা)-এর সাথে। তিনি সবকিছু শুনে ৪৮০ দিরহাম দিয়ে কিনে নিলেন। এরপর তিনি বর্মটি হাতে নিয়ে বললেন, 'এখন এ বর্মটি আমার-কি বলেন?'

অবশ্যই! 'এখন বর্মটি আপনার।' দৃঢ় কণ্ঠে বললেন। আলী (রা)।

'এখন এটাকে আমি যা খুশি করতে পারি?' পুনরায় প্রশ্ন করলেন, হযরত ওসমান (রা)।

'অবশ্যই পারেন। কারণ এখন বর্মটির মালিকানা আপনার'। বললেন, আলী (রা)।

হযরত ওসমান (রা) স্মিত হেসে বর্মটি আলী (রা)-র হাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'তাহলে এ বর্মটি বীরশ্রেষ্ঠ হযরত আলী (রা)-কে বিয়ের যৌতুক

www.pathagar.com

হিসেবে দান করলাম। কারণ এ বর্মের যোগ্য অধিকারী তিনিই।'

বর্ম বিক্রির টাকা এনে আলী (রা) রসূল (স)-এর হাতে দিলে তিনি বললেন, 'এর তিনভাগের দু'ভাগ খোশবু ইত্যাদি ক্রয়ে খরচ কর এবং অবশিষ্ট একভাগ বিয়ের সাজ-সরঞ্জাম ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় কর।'

এরপর হযরত আনাস (রা)-কে রসূল (স) পাঠালেন, আবূ বকর (রা), ওমর (রা), আবদুর রহমান (রা) বিন আওফসহ সকল আনসার ও মুহাজিরদেরকে ডেকে আনার জন্য। যখন সবাই এসে উপস্থিত হলেন তখন রসূল (স) মিম্বরের ওপর দাঁড়িয়ে বললেন, 'হে মুহাজির ও আনসারের দল! এখনই জিবরাঈল (আ) আমার নিকট এই খবর নিয়ে এসেছিলেন যে, আল্লাহ্ পাক বায়তুল মা'মুরে ফাতিমা (রা) বিনতু মুহম্মদ (স)-এর বিয়ে নিজের খাছ বান্দাহ্ আলী (রা) বিন আবি তালিবের সাথে দিয়েছেন এবং আমার প্রতি নির্দেশ হয়েছে যে, নতুন করে বিয়ের আকদ করে সাক্ষীদের সামনে ইজার কবুল করাও।' এরপর রসূল (স) বিয়ের খুতবা পাঠ করলেন এবং আলী (রা)-কে উদ্দেশ্য করে বললেন, চার'শ মিসকাল রৌপ্য মোহরের বিনিময়ে আমি ফাতিমা (রা)-কে তোমার সাথে বিবাহ্ দিলাম। তুমি কি তা কবুল করছো?'

'জী, কবুল করলাম।' বিনীতভাবে হযরত আলী উচ্চারণ করলেন।

এরপর সবাইকে সাথে নিয়ে দোয়া করার জন্য হাত তুললেন এবং বললেন, 'আল্লাহ্ তোমাদের মাঝে রহমত নাযিল করুন। তোমাদের জীবনের সব প্রচেষ্টা স্বার্থক হোক। তোমাদের ঘরে পুণ্যাত্মা সন্তান জন্মলাভ করুক। আমিন, সুম্মা আমিন।'

হযরত ফাতিমা (রা)-র এই বিয়ের সময়টা ছিল দ্বিতীয় হিজরী সনের সফর মাস। কেউ কেউ বলেন দ্বিতীয় হিজরী সনের রজব মাস। আবার অন্য একটি বর্ণনায় পাওয়া যায় তৃতীয় হিজরী সনের শওয়াল মাসে এ বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। তবে বেশিরভাগ ঐতিহাসিকগণ বিয়ের সময় ফাতিমা (রা)-র বয়স ১৫ বছর ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। আর এ সময় হযরত আলী' (রা)-র বয়স ছিল ২১ বছর। কিন্তু হিসাব অনুযায়ী বিয়ের সময় ফাতিমা' (রা)-র বয়স হওয়ার কথা অন্ততপক্ষে ২০ বছর। কারণ তিনি নবুয়তের ৫ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করে থাকলে, হিজরত হয় নবুয়তের ১৩ বছরে এক্ষণে ১৮ বছর এবং হিজরতের দ্বিতীয় বা তৃতীয় বছরে বিবাহ্ হলে আরো ২ বছর যোগ হয়ে ২০ বছর হওয়ার কথা।

যাহোক বিয়েতে রসূল (স) তাঁর কন্যা ও জামাতাকে যে উপহার দিয়েছিলেন

www.pathagar.com

তা'হলো, উল ভরা মিশরী কাপড়ে তৈরি একটি বিছানা, একটি নকশা করা পালং, খেজুরের ছাল ভর্তি চামড়ার একটি বালিশ, একটি মশক, দু'টি ঘড়া, একটি যাঁতা, একটি পেয়ালা, দু'টি চাদর, দু'টি বাজুবন্দ ও একটি জায়নামায।

বিবাহ অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর রসূল (স) আলী (রা)-কে ওলীমা'র আয়োজন করতে বললেন। বিবাহ অনুষ্ঠানের খরচ খরচা বাদে যে টাকা বেঁচে গিয়েছিল তা দিয়ে হযরত আলী (রা) ওলীমা অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেন এবং আনসার ও মুহাজিরদের দাওয়াত করে খাওয়ালেন। এতে পনির, খেজুর, জবের নান ও গোশত ছিল বলে জানা যায়। এটা সে সময়ের সর্বোত্তম ওলীমা অনুষ্ঠান ছিল বলে হযরত আসমা (রা) বর্ণনা করেছেন।

স্বামীর ঘরে ফাতিমা (রা)

স্বাধীনভাবে ঘর-সংসার করার জন্য আলী (রা) ছোট একটা বাড়ি ভাড়া নিলেন। কিন্তু অতিশয় লাজুক আলী (রা) রসূলকে গিয়ে বলতে পারলেন না যে, ফাতিমা (রা)-কে আমার ঘরে নিয়ে যাবো। ভাব সাব দেখে রসূল (স) আকার ইঙ্গিতে ফাতিমাকে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেছেনও। এমন কি একবার তিনি আলী (রা)-কে বললেন, 'হে আলী, তোমার গৃহিনী তোমার সৌভাগ্যের কারণ হোক।' তবুও আলী কিছু মুখ ফুটে বলতে পারেন নি।

এমতাবস্থায় আলী (রা)-র সহোদর আকীল একদিন তাঁর হাত ধরে বললেন, 'আমার ইচ্ছে, আপনি আপনার স্ত্রীকে নিয়ে নিজ গৃহে বাস করুন।' আলী তখন রসূল (স)-এর অনুমতির কথা বললেন। এ কথা শুনে আকীল আলী (রা)-কে নিয়ে হযরত আয়েশা (রা)-র কাছে গেলেন এবং সব খুলে বললেন। সব শুনে আয়েশা (রা) রসূল (স)-র দরবারে হাযির হয়ে বললেন, 'হে আল্লাহ্‌র হাবীব! আপনার চাচাত ভাই আলী তাঁর স্ত্রীকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য অভিলাষী হয়েছে, কিন্তু সে বড়ই লজ্জাশীল ও শিষ্ট প্রকৃতির যুবক, কাজেই নিজে সে এ বিষয়ে আপনাকে জানাবার মত সাহস সঞ্চয় করতে পারছে না।' একথা শুনে রসূল (স) হযরত আলী (রা)-কে তাঁর সামনে হাযির করতে বললেন। আলী (রা) হাযির হলে রসূল (স) জানতে চাইলেন, 'আলী আমি তোমার স্ত্রীকে বিদায় করে দেই এইকি তোমার ইচ্ছা?'

উত্তরে আলী (রা) বিনীতভাবে বললেন, 'জি- হ্যাঁ, এই আমার আরজ।'

তখন রসূল (স) কিছু দিরহাম তাঁর হাতে দিয়ে বললেন, বাজার থেকে আটা, পনির, ঘি ইত্যাদি কিনে আন।

www.pathagar.com

নিজ হাতে রসূল (স) রুটির সাথে পনির ঘি ইত্যাদি মেখে জলীস নামে এক প্রকার খাদ্য তৈরি করলেন এবং উপস্থিত সবাইকে খেতে দিলেন। মাটির একটা পেয়ালাতে অবশিষ্ট জলীস ভরে তিনি বললেন, 'এইটুকু ফাতিমা এবং তার স্বামীর জন্য।' এরপর রসূল (স)-এর নির্দেশ ক্রমে ফাতিমা (রা)-কে হাযির করা হলে তিনি ফাতিমার কপালে চুমু দিয়ে হযরত আলী (রা)-র একটি হাত টেনে নিলেন এবং তার ওপর ফাতিমার হাত রেখে বললেন, 'হে আলী তোমার জন্য নবী দুলালী ফাতিমা কল্যাণের কারণ হোক এবং হে ফাতিমা, তোমার স্বামী আলী সব দিক দিয়েই প্রশংসার যোগ্য। এখন তোমরা স্বামী-স্ত্রী নিজ গৃহে গমন কর।'

হযরত ফাতিমা (রা) নব বধূবেশে যখন আলী (রা)-র ঘরে গেলেন, তখন রসূল (স) সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। অবশ্য রসূল (স) আলী (রা)-কে দেখা করার কথা আগেই বলেছিলেন। তাই দরজায় দাঁড়িয়ে অনুমতি চাইতেই দরজা খুলে গেল এবং তিনি ভেতরে প্রবেশ করলেন। এরপর একটি পাত্রে পানি আনালেন। রসূল (স) পানির ভেতর তাঁর পবিত্র হাত ডুবালেন এবং আলী (রা)-র বুক ও বাহুতে পানির ছিটা দিলেন। অতপর ফাতিমা (রা)-কে কাছে ডাকলেন। লজ্জায় জড়সড়ো হয়ে তিনি পিতার সামনে এলেন। রসূল (স) তাঁর ওপরও পানি ছিটিয়ে দিলেন এবং বললেন, 'হে ফাতিমা! আমি তোমার বিয়ে স্ব-খান্দানে সর্বোত্তম ব্যক্তির সাথেই দিয়েছি।'

এ ঘটনাটি হযরত আসমা বিনতে উমাইস এভাবে বর্ণনা করেছেন, 'ফাতিমার বাসরের রাতে আমি তাঁদের বাড়িতে ছিলাম। সকালে রসূল পাক (স) তাশরীফ আনেন এবং আমাকে বলেন, ভাই আলীকে আমার নিকট নিয়ে আস। আমি বললাম, 'ভাইয়ের নিকট কন্যাকে বিবাহ দিলেন কেমন করে?' রসূলে পাক (স) উত্তর দিলেন, ঠিকই করেছি, হে উম্মে আইমান! অতঃপর রসূলে পাক (স)-এর আওয়াজ শুনে অন্যান্য মহিলারা সরে দাঁড়ালেন, আমিও পর্দার আড়ালে চলে গেলাম। ইতোমধ্যে হযরত আলী (রা) হাযির হলেন। রসূলে পাক (স) তাঁর শরীরে পানি ছিটিয়ে দোয়া করলেন। এরপর হযরত ফাতিমাকে ডাকলেন। হযরত ফাতিমা (রা) অত্যন্ত লজ্জাবনত হয়ে হাযির হলেন। রসূলে পাক (স) ফাতিমা (রা)-কে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'হে ফাতিমা! ধন্য তুমি, ধীর হও, আমি তোমাকে আমার সর্বাধিক প্রিয় ঘরাণায় বিবাহ দিয়েছি।' অতঃপর তাঁর ওপরও পানি ছিটিয়ে দোয়া করেন। এরপর ফেরার সময় রসূলে পাক (স) সম্মুখে কালো ছায়া দেখতে পেয়ে বললেন, কে! আসমা বিনতু উমাইস নাকি?' আমি বললাম,

www.pathagar.com

হ্যাঁ ইয়া রসূলুল্লাহ্ (স)'। রসূলে পাক (স) বললেন, 'রসূলের কন্যা ফাতিমার বাসরের সম্মানে আসছ নাকি?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ', তখন তিনি আমার জন্যও দোয়া করলেন।'

নতুন বাড়িতে ফাতিমা (রা)

রসূল (সঃ)-এর বাসভবন থেকে হযরত আলী' (রা)-র ভাড়া করা বাসাটি একটু দূরে ছিল। যে কারণে রসূল (স)-এর যাতায়াতে কষ্ট হত। এজন্য তিনি একদিন হযরত ফাতিমা (রা)-কে বললেন, 'বেটি! প্রায়ই তোমাকে দেখতে আসতে হয়। তোমাকে আমি কাছে নিয়ে যেতে চাই।'

'আপনার আশপাশে হারিসা (রা) বিন নু'মানের অনেক বাড়ি আছে। আপনি তাঁকে কোন একটি বাড়ি খালি করার জন্য বলে দিন।' আবেদন জানালেন ফাতিমা (রা)।

রসূল (স) এ কথা শুনে বললেন, 'আমার কলিজার টুকরা! হারিসা (রা)-র কাছে কোন বাড়ি চাইতে এখন আমার লজ্জা লাগে। কেননা সে প্রথমেই আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (স)-এর সন্তুষ্টির জন্য কয়েকটি বাড়ি দিয়ে দিয়েছে।'

এ কথার ওপর আর কথা চলে না। অতএব ফাতিমা (রা) চুপ হয়ে গেলেন। কিন্তু কথা তো লতার মতো। সে মোটে বসে থাকতে জানে না। একদিন কথাগুলো হযরত হারিসা (রা) বিন নু'মানের কানে পৌঁছালো। তিনি যখন জানলেন রসূল (স)-এর নয়নের মণি ফাতিমা (রা)-কে নিজের কাছে আনতে চান কিন্তু বাড়ি পাচ্ছেন না। তখন তিনি নিজেই ছুটে এলেন রসূল (স) দরবারে এবং আরজ করলেন, 'হে আল্লাহ্র রসূল! আপনি ফাতিমা (রা)-কে নিকটবর্তী কোন বাড়িতে আনতে চান। আপনার বাসগৃহের কাছের বাড়িটি আমি খালি করে দিচ্ছি। আপনি ফাতিমা (রা)-কে ডেকে পাঠান। হে আমার প্রভু! আমার জীবন ও সম্পদ আপনার ওপর কুরবান হোক। আল্লাহর কসম! হুজুর (স) যে জিনিস আমার নিকট থেকে নিবেন তা আমার নিকট পাঠাবার তুলনায় হুজুরের নিকট থাকাটাই আমি বেশি পছন্দ করবো।'

রসূল (স) বললেন, 'তুমি সত্যি বলেছ। আল্লাহ্ পাক তোমাকে বরকত ও কল্যাণ দান করুন।' এরপর হযরত ফাতিমা (রা) ও আলী (রা) হারিসার (রা) প্রদত্ত বাড়িতে এসে উঠলেন।

ব্যক্তিগত জীবনে হযরত ফাতিমা (রা) ছিলেন অনুসরণযোগ্য মহিলা। আচার-আচারণ, কথা-বার্তা, চাল-চলনে তিনি ছিলেন রসূল (স)-এর সর্বোত্তম

www.pathagar.com

উদাহরণ। ফাতিমা (রা) দীনদার, পরহেযগার ও মুত্তাকী মহিলা ছিলেন। কুরাইশদের বয়কটের সময় শেয়াবে আবূ তালিবে বন্দী থাকা অবস্থায় অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছিলেন তিনি। তা'ছাড়া মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের সময় দীর্ঘপথ হাটার কারণেও তিনি খুবই ক্ষীণাঙ্গী হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তবু তিনি নিজ হাতে যাঁতা ঘুরিয়ে আটা তৈরি করতেন। এমনকি যাঁতা ঘুরাতে ঘুরাতে তাঁর হাতে ফোস্কা পড়ে গিয়েছিল। এরপরও সংসারের রান্না-বান্না, ঘর-উঠোন ঝাড়ু দেয়া, কূপ থেকে পানি উঠানো ইত্যাদি সব কাজের আঞ্জাম তাকে দিতে হতো । অবশ্য স্বামী আলী (রা) মাঝে মাঝে তার কাজে সহযোগিতা করতেন।

তোমরা ইতোমধ্যেই বুঝতে পেরেছ যে হযরত আলী (রা) নিতান্তই একজন গরীব মানুষ ছিলেন। যে কারণে তিনি বাসায় দাসী-বাদী রাখতে পারতেন না। এমন কি কোন কোন সময় তাদের দিনের পর দিন, রাতের পর রাত না খেয়ে কাটাতে হতো। এমনি একবার স্বামী-স্ত্রী উভয়েই প্রায় আট প্রহর পর্যন্ত ভুখা কাটানোর পর আলী (রা) কোন এক জায়গায় মজুরীর বিনিময়ে মাত্র এক দিরহাম পেয়েছিলেন। তখন বেশ রাত। দোকান-পাটও প্রায় সব বন্ধ হয়ে গেছে। তবু অনেক খোঁজাখুঁজির পর এক দোকান থেকে এক দিরহামের যব কিনে ঘরে ফিরলেন। অভুক্ত ফাতিমা (রা) হাসিমুখে স্বামীকে অভ্যর্থনা জানালেন। এরপর যবগুলো নিয়ে দ্রুত পিষলেন, রুটি তৈরি করলেন এবং স্বামী হযরত আলী (রা)-কে খেতে দিলেন। স্বামীর খাওয়া শেষ হলে নিজে খেতে বসলেন। হযরত আলী (রা) বলেন, 'এসময় আমার রসূল (স)-এর কথা মনে পড়লো। তিনি বলেছিলেন, 'ফাতিমা দুনিয়ার সর্বোত্তম মহিলা।'

হযরত আলী (রা) একবার ইবনে মাসউদ (রা)-কে বলেন, 'আমার কথা এবং রসূলের সর্বাধিক প্রিয় ফাতিমার অবস্থা নবীজীকে একটু জানাবেন কি? চাক্কি (যাঁতা) চালাতে চালাতে ফাতিমার হাতে দাগ পড়েছে, পানির কলস টানতে টানতে কোমর কালসিটে হয়ে গেছে, বাড়ি-ঘর ময়লা-আর্বজনা ঝাড়ু দিতে দিতে কাপড়-চোপড় সর্বদা ময়লাযুক্ত হয়ে থাকে। রুটি তৈরি করতে করতে মুখমন্ডল মলিন হয়ে পড়েছে, ফলে চেহারা এবং রং বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে।'

ফাতিমা (রা) নিজেই বলেন, 'আটা পিষা এবং রুটির জন্য আটার খামীর বানাতে বানাতে আমার হাত ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পড়েছে।'

এ অবস্থায় হযরত আলী জানতে পারেন যে মুসলমানদের হাতে যুদ্ধ বন্দী অনেক বাদী এসেছে। তখন তিনি ফাতিমা (রা)-কে বললেন, 'যাও তোমার কাজে সহযোগিতার জন্য একজন দাসী নিয়ে এসো, রসূলে পাক (স)-এর

www.pathagar.com

তোমার প্রতি যে মায়া-মমতা আছে এতে আমি আশা পোষণ করি যে, তুমি কোন দাসীর প্রার্থনা জানালে অবশ্যই তিনি দান করবেন।'

হযরত ফাতিমা (রা) আলী (রা)-র পরামর্শ মত রসূল (স)-এর দরবারে হাযির হলেন কিন্তু লজ্জায় কিছুই বলতে পারলেন না। ফাতিমার উপস্থিতির কারণ রসূল (স) নিজেই যখন জিজ্ঞেস করলেন, তখন উত্তরে ফাতিমা বললেন, 'আপনাকে সালাম দিতে এসেছি।'

খালি হাতে ফাতিমা (রা)-ঘরে ফিরলে আলী (রা) সব বুঝে ফাতিমা (রা)-কে সাথে নিয়ে নিজেই রসূল (স)-এর সামনে উপস্থিত হলেন এবং বললেন, 'ফাতিমা লজ্জার কারণে আপনার নিকট কিছু বলতে পারেনি। সে আপনার নিকট তাঁর কাজে সাহায্যের জন্য গণীমতের একজন দাসী প্রার্থনা করছে। কেননা সে তার কাজ একাকী করতে কষ্ট পাচ্ছে।'

হযরত আলী (রা)-র এ আবেদনের প্রেক্ষিতে রসূল (স) বললেন, 'আমি কোন কয়েদীকে তোমাদের খিদমতের জন্য দিতে পারি না। আস- হাবে ছুফ্ফার খাওয়া-পরার সন্তোষজনক ব্যবস্থা এখন আমাকে করতে হবে।

আমি তাদেরকে কি করে ভুলে যেতে পারি যারা নিজেদের বাড়ি-ঘর ছেড়ে ও আল্লা-রসূল (স)-এর সন্তুষ্টির জন্য দারিদ্র্য ও বুভুক্ষা গ্রহণ করে নিয়েছে।'

রসূল (স) এ সময় ফাতিমা (রা)-কে উপদেশ দিয়ে বলেন, 'হে ফাতিমা! ধৈর্য ধর, উত্তম মহিলা সে, যার দ্বারা পরিবারের লোকেরা উপকৃত হয়।'

এরপর তাঁরা স্বামী-স্ত্রী ঘরে ফিরে এলে, রাতেরবেলা রসূল (স) এসে হাযির হলেন। তাঁরা রসূল (স)-কে দেখে সালাম দিলেন। তখন রসূল (স) বললেন, 'তোমরা আমার নিকট যা চেয়েছিলে তার তুলনায় উত্তম একটি বস্তু দিবো কি?' তাঁরা বললেন, 'হ্যাঁ! ইয়া রসূলুল্লাহ।' এরপর রসূল (স) বললেন, 'হযরত জিব্রাঈল আমাকে নামাযের পর তিনটি বাক্য পাঠ করার জন্য বলেছেন। এই তিনটি বাক্য তোমরা নামাযের পর পাঠ করবে–তেত্রিশবার সোবহান আল্লাহ, তেত্রিশবার আল হামদুলিল্লাহ আর চৌত্রিশবার আল্লাহু আকবর। বিছানায় শোয়ার পূর্বেও এই আমল করবে।' আলী (রা) বলেন, 'ঐ দিন থেকে আজ পর্যন্ত আমি এই বাক্যসমূহ পাঠ করা কোন দিন বাদ দেয় নি।' একথা শুনে একজন সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, 'সিফফীনের যুদ্ধের রাতেও কি আপনি এই বাক্যসমূহ পাঠ করেছিলেন?' উত্তরে আলী (রা) বললেন, 'হ্যাঁ।'

www.pathagar.com

স্বামী গৃহের পরিবেশ

হযরত আলী (রা)-র আর্থিক অবস্থা যে ভাল ছিল না তা আমরা আগেই জানতে পেরেছি। তাঁর বাড়িতে সহায়-সম্বল বলতে তেমন কিছুই ছিলো না। এমন কি প্রতিদিন তিন বেলা খাবার পর্যন্ত জুটতো না। পরনের ভালো কাপড় তাদের ছিলো না। এক বর্ণনায় জানা যায়, আলী (রা) যেদিন ফাতিমা (রা)-কে জন্য বাদী প্রার্থনা করে রিক্ত হস্তে রসূল (স)-এর দরবার থেকে ফিরে আসেন, সেদিন রাতে রসূল (স) যখন তাঁদের ঘরে যান, তখন তাঁরা বিছানায় শুয়েছিলেন। কিন্তু তাদের গায়ের চাদর এতো ছোট ছিলো যে, পা ঢাকলে মাথা ঢাকা হতো না, আর মাথা ঢাকা হলে পা ঢাকা হতো না।

হযরত আলী (রা) নিজেই তাঁর অবস্থা সম্বন্ধে বলেছেন, 'যখন নবী দুলালীর সাথে আমার বিয়ে হয়, তখন আমার অবস্থা এমন ছিলো যে, একখানা ভেড়ার চামড়া ছিলো, তার ওপর উটকে খাওয়াতাম এবং রাতে ঐ চামড়া বিছিয়ে শয়ন করতাম। আমার চাকর-গোলাম ছিলো না, নিজের হাতেই যাবতীয় কাজ করতে হতো।'

অন্য এক বর্ণনায় আছে, একবার রসূল (স) ফাতিমা (রা)-র গৃহে গিয়ে দেখেন যে, তিনি উটের চামড়ার পোশাক পরে আছেন এবং তাতেও রয়েছে ১৩ টি তালি। তখন ফাতিমা (রা) আটা পিষছিলেন এবং আল্লাহ্‌র কালাম পড়ছিলেন। এ অবস্থা দেখে রসূল (স) মেয়েকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'ফাতিমা! সবরের মাধ্যমে দুনিয়ার কষ্ট শেষ করো এবং আখিরাতের স্থায়ী খুশির অপেক্ষা করো। আল্লাহ্ তোমাদেরকে উত্তম পুরস্কার দিবেন।'

হযরত আলী (রা) একবার ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘরে ফিরে খাবার চাইলেন। ফাতিমা (রা) বিনয়ের সাথে স্বামীকে বললেন, 'অভুক্ত অবস্থায় আজ তৃতীয় দিন চলছে। যবের একটি দানাও ঘরে নেই।' এ কথা শুনে শেরে খোদা বললেন, 'হে ফাতিমা, আমাকে তুমি বলোনি কেন?' তখন ফাতিমা (রা) বললেন, 'হে আমার মাথার মুকুট! রুখসতির (বিয়ের) সময় আমার পিতা নসিহত করে বলেছিলেন যে, আমি যেন সওয়াল করে আপনাকে লজ্জিত না করি।'

বহু বর্ণনা থেকে পাওয়া যায় হযরত ফাতিমা (রা) প্রায়ই যাঁতা পিষে আটা তৈরি করতেন। এমনকি সন্তানদেরকে কোলে নিয়েও তিনি একাজ করতেন।

হযরত আবূযর গিফারী (রা) বর্ণনা করেছেন, 'একবার রসূল (স) আমাকে পাঠালেন আলী (রা)-কে ডেকে আনার জন্য। আমি যখন তাঁর গৃহে পৌঁছলাম

www.pathagar.com

তখন দেখলাম যে, হযরত ফাতিমা (রা) হযরত হোসাইন (রা)-কে কোলে নিয়ে যাঁতা পিষছেন।'

মোহাদ্দীস মোল্লা জামালুদ্দীন বর্ণনা করেছেন, একদিন ফাতিমা (রা) মসজিদে নববীতে তাশরীফ নিলেন এবং রুটির একটি ছোট টুকরো নবীজীর হাতে দিলেন। নবীজী (স) জিজ্ঞেস করলেন, 'এই রুটি কোত্থেকে এলো?' ফাতিমা (রা) বললেন, 'আব্বাজান! সামান্য যব পিষে রুটি বানিয়েছিলাম। যখন বাচ্চাদেরকে খাওয়াচ্ছিলাম তখন খেয়াল এলো যে আপনাকেও কিছু খাইয়ে দিই।

হে আল্লাহ্‌র রসূল! তৃতীয় বেলা অভুক্ত থাকার পর এই রুটি ভাগ্যে জুটেছে।' রসূল (স) রুটি খেলেন এবং বললেন, 'হে আমার কন্যা! চার বেলা অভুক্ত থাকার পর প্রথম রুটির টুকরো তোমার পিতার মুখে পৌঁছেছে।'

ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান

এক বর্ণনা থেকে জানা যায়, একদিন দুপুরের সময় রসূল (স) ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘর থেকে বের হন। পথে হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত ওমর (রা)-কে সাথে তাঁর দেখা হয়। ঘটনাক্রমে তাঁরাও ক্ষুধার্ত ছিলেন। হাঁটতে হাঁটতে তিন জন এক সময় আবূ আইউব আনসারী (রা)-র বাগানে পৌঁছলেন। অতঃপর খেজুরের খোসা ছাড়িয়ে তিনি অতিথিদের সামনে পেশ করলেন। এই ফাঁকে আবূ আইউব আনসারী একটি ছাগল জবাই করে তাঁর গোশত রান্না করলেন ও কিছু অংশ দিয়ে কাবাব তৈরি করলেন। খাবার পরিবেশন করা হলে রসূল (স) একটি রুটির ওপর কিছু গোশত রেখে তা হযরত ফাতিমা (রা)-র কাছে পাঠাতে বললেন। কারণ ফাতিমা (রা) এ সময় কয়েকদিন অভুক্ত ছিলেন।

ইবেন আব্বাস (রা)-এর এক বর্ণনায় জানা যায়, 'বনী সলীম বংশের এক ব্যক্তি এসে 'হে মুহাম্মদ, হে মুহাম্মদ' বলে চীৎকার করতে লাগলো এবং বলতে লাগলো, "তুমি কি সেই যাদুকর যার ছায়া দেখা যায় না? যদি আমার বংশের লোকজন অসন্তুষ্ট না হতো, তা হলে তুমি বের হওয়া মাত্র এক আঘাতে তোমার মাথা কেটে ফেলতাম।

লোকটির এহেন আচরণে হযরত ওমর (রা) ক্ষেপে গেলেন এবং তাকে শায়েস্তা করার জন্য এগিয়ে গেলেন। রসূল (স) হযরত ওমরকে (রা)-কে থামিয়ে লোকটির সাথে মোলায়েম কণ্ঠে কথাবার্তা বললেন, তার সমস্ত প্রশ্নের হেসে হেসে উত্তর দিলেন। রসূল (স)-এর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে লোকটি ইসলাম

www.pathagar.com

কবুল করলেন। তখন রসূল (স) লোকটিকে বললেন, 'তোমার কাছে কি কোন সম্পদ বা মাল আছে?'

লোকটি বললো, 'আল্লাহ্‌র কসম! বনি সলিমের তিন হাজার লোকের মধ্যে আমিই সর্বাধিক গরীব।' লোকটির কথা শুনে রসূল (স) সাহাবাদের দিকে ফিরে বললেন, 'তোমাদের মধ্যে কে এই মিসকিনকে সাহায্য করবে?'

হযরত সায়াদ (রা) উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল (স)! আমার একটি উটনী আছে, আমি তাকে তা দিচ্ছি।'

এ কথা শোনার পর রসূল (স) বললেন, 'তোমাদের মধ্যে কে আছ যে তার মাথা ঢেকে দেবে?'

আলী (রা) উঠে দাঁড়ালেন এবং নিজের পাগড়ি খুলে ঐ লোকটির মাথায় পরিয়ে দিলেন।

এরপর রসূল (স) বললেন, 'কে আছে যে তার খাবারের বন্দোবস্ত করবে?'

একথা শুনে হযরত সালমান ফারসী (রা) উঠে দাঁড়ালেন এবং লোকটিকে সংগে নিয়ে সাহাবীদের বাড়ি বাড়ি ঘুরতে লাগলেন। কিন্তু কোথাও কিছু পেলেন না। আসলে ঐ সময়ে ইসলামগ্রহণকারী নওমুসলিম সাহাবাদের প্রায় সবারই অবস্থা ছিল অত্যন্ত নাজুক। এক বেলা খাবার জুটলে বাকি দু'বেলা উপোস দিতে হতো। হযরত সালমান ফার্সী কোন দিসা না পেয়ে শেষ পর্যন্ত হযরত ফাতিমা (রা)-র দরজায় গিয়ে কড়া নাড়লেন। ভেতর থেকে সাড়া পেয়ে সালমান (রা) সব কথা বর্ণনা করে বললেন, 'হে আল্লাহ্‌র সত্য রসূল (স)-এর কন্যা! এই মিসকিনের খাবারের বন্দোবস্ত করুন।'

উত্তরে হযরত ফাতিমা (রা) কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললেন, 'হে সালমান! আল্লাহ্‌র কসম। আজ আমরা তিনদিন না খেয়ে আছি। বাচ্চা দু'জন ভুখা অবস্থায় শুয়ে আছে। তবু সায়েলকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে নেই। আমার এই চাদর শামউন ইহুদীর নিকট নিয়ে যাও এবং বলো ফাতিমা (রা) বিনতু মুহাম্মদ (স) এই চাদর রেখে গরীব মানুষকে কিছু দাও।'

সালমান (রা) লোকটিকে নিয়ে শামউন ইহুদীর কাছে গেলেন এবং তাকে সব কথা খুলে বললেন। বর্ণনা শুনে শামউন ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'হে সালমান! আল্লাহ্‌র কসম, এঁরা তাঁরা যাঁদের ব্যাপারে তওরাতে উল্লেখ করা হয়েছে। তুমি সাক্ষী থেকো যে, আমি ফাতিমা (রা)-র পিতা (স)-র ওপর ঈমান এনেছি।' এরপর বললেন,' চাদর বন্ধক দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই, যত খুশি যব নিয়ে যাও।'

www.pathagar.com

চাদর ও যব নিয়ে হযরত সালমান ফারসী (রা) ফাতিমা (রা)-র গৃহে ফিরে এলেন এবং ঘটনার বর্ণনা দিলেন।

সব শুনে নবী দুলালী ফাতিমাতুজ জোহরা (রা) নিজ হাতে যব পিষে রুটি তৈরি করে লোকটিকে খাওয়ানোর জন্য সালামন (রা)-কে দিলেন।

সমস্ত রুটি দেয়ার কারণে সালমান (রা) বললেন, 'এ থেকে বাচ্চাদের জন্য কিছু রেখে দিন।'

ফাতিমা (রা) বললেন, 'সালমান! যা আল্লাহ্‌র রাস্তায় দিয়েছি, তা আমার বাচ্চাদের জন্য জায়েজ নয়।'

সালমান (রা) রসূল (স)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে রুটিগুলো দিলেন। তিনি রুটিগুলো লোকটিকে প্রদান করলেন। এরপর সালমান (রা) আনুপূর্বিক সব কথা খুলে বললেন। সব শুনে রসূল (স) হযরত ফাতিমা (রা)-র গৃহে এলেন এবং তাঁর মাথায় স্নেহের হাত রেখে দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ! ফাতিমা তোমার দাসী! তার প্রতি সন্তুষ্ট থেকো।'

হযরত হাসান (রা) বর্ণনা করেছেন, 'একবার একবেলা উপবাসের পর আমাদের ভাগ্যে কিছু খাবার জুটলো। আব্বাজান ও আমাদের দু'ভাইয়ের খাওয়া শেষে মা খেতে বসবেন এমন সময় একজন ভিখারী এসে দরজায় দাঁড়িয়ে হাঁক দিলো, 'হে নবী দুলালী! আমি দু'বেলা থেকে অনাহারে আছি- আমার পেট ভরিয়ে দিন।'

যে গ্রাসটি মা মুখে তুলেছিলেন, তা পুনরায় পাতের ওপর নামিয়ে রাখলেন এবং আমাকে আদেশ দিলেন তা ফকিরকে দিয়ে দিতে। এরপর তিনি বললেন, আমি শুধু একবেলা খাইনি, কিন্তু ঐ লোকটা দু'বেলা থেকে উপোস আছে

আমি খাবারগুলো ভিখারীর হাতে তুলে দিলাম।'

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, 'একবার হযরত আলী (রা) সারারাত ধরে একটি বাগানে সেচ দিলেন এবং মজুরী হিসেবে সামান্য পরিমাণ যব পেলেন। হযরত ফাতিমা (রা) তা থেকে এক অংশ নিয়ে আটা পিষলেন এবং খাবার তৈরি করলেন। ঠিক খাবার সময় এক মিসকিন দরজায় কড়া নাড়লো এবং বললো, 'আমি ভুখা আছি।' ফাতিমা (রা) সম্পূর্ণ খাবার তাকে দিয়ে দিলেন। অতঃপর অবশিষ্ট আনাজের কিছু অংশ নিয়ে পিষলেন এবং খাবার তৈরি করলেন। খানা তৈরি শেষ হতেই একজন দরজায় এসে হাত পেতে দাঁড়ালো, তিনি সব খাবার তাকে দিয়ে দিলেন। এরপর অবশিষ্ট আনাজ পিষলেন এবং খাবার তৈরি করলেন। ঠিক এ সময়ে একজন মুশরিক কয়েদী আল্লাহ্‌র

www.pathagar.com

রাস্তায় খাবার চাইলো। তখন বাদবাকী সব-খাবার তাকে দিয়ে দেয়া হলো। সেদিন বাড়ির কারো খাবার জোটেনি, সবাইকে অভুক্ত থাকতে হয়েছে।'

মহান রাব্বুল আলামীন হযরত ফাতিমা (রা)-র এ দানকে এতো পছন্দ করলেন যে, এ সম্পর্কে আয়াত নাযিল করলেন, 'এবং সে আল্লাহ্‌র রাস্তায় মিসকিন, এতিম এবং কয়েদীকে খাবার খাওয়ায়।'

অন্য এক ফাতিমা

এবার তোমাদেরকে একটা গল্পের মত ঘটনা শোনাবো। তৎকালীন শাম দেশের এক আমীরের কন্যার নাম ছিলো ফাতিমা। দান-খয়রাত আর বদান্যতায় তিনি সারা শাম দেশে মশহুর ছিলেন। সবাই তাকে চিনতো। একবার তার কানে নবী দুলালী হযরত ফাতিমা (রা)-র কথা পৌঁছালো। তিনি জানতে পারলেন মুসলমানদের নবী (স)-র কন্যা ফাতিমা আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল কিন্তু খুবই উদার। যখন যা হাতে আসে তা গরীব দুঃখীকে দান করে দেয়, এমনকি নিজে ভোগ না করেও।

হযরত ফাতিমা (রা)-র সুনাম-সুখ্যাতির খবর শুনে শামদেশীনি ফাতিমা প্রতিহিংসায় জ্বলে উঠলো। এমনকি নবী দুলালীকে স্বচক্ষে দেখার খায়েস হলো তার। যেই ভাবা সেই কাজ– পিতার নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে প্রচুর উপঢৌকন আর দাস-দাসীসহ মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা হলো শামদেশী ফাতিমা। তার মনে মনে ইচ্ছে ছিলো বহু মূল্যবান উপঢৌকন আর দাশ-দাসী সমভিব্যাহারে উপস্থিত হয়ে সে হযরত ফাতিমা (রা)-কে ঘাবড়ে দিবে-বিমোহিত করবে।

কিন্তু শামদেশী ফাতিমা দেখলো নবী দুলালী তাকে অত্যন্ত মর্যাদার সাথে গ্রহণ করলেও উপঢৌনগুলো খুবই স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করলেন। এমন কি মূল্যবান উপঢৌকন এক পাশে সরিয়ে রেখে নিজ হাতে মেহমানদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করলেন। এরপর তিনি লোক মরফত প্রতিবেশী সব গরীব-দুঃখীদের খবর দিলেন এবং প্রাপ্ত উপঢৌকন থেকে খাদ্যদ্রব্য ও বস্ত্র ইত্যাদি জিনিসগুলো তাদের মধ্যে নিজ হাতে বিলিয়ে দিলেন। পরে বাকী মূল্যবান হীরা জহরৎ, মনি মুক্তা বায়তুল মালে (সরকারী কোষাগার) জমা দিয়ে দিলেন।

এ সব দৃশ্য দেখে শামদেশীনি ফাতিমা যখন অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে তখন হযরত ফাতিমা (রা) তার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে বললেন, 'এতে দুঃখ কোরোনা বোন। তুমি যে অর্থ আমাকে দিলে, তা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথেই-

www.pathagar.com

আমি গ্রহণ করেছি। তবু, ওগুলো দিয়ে দিলাম কেন, জানো? কারণ, মানুষের হক সে পরিমাণ অর্থের- বা সম্পদের ওপরই থাকে; যেটুকু প্রয়োজন তার নিছক বেঁচে থাকার তাকিদে। এর অধিক সঞ্চয় আল্লাহ্ আর তাঁর রসূল (স)-এর দৃষ্টিতে অবৈধ। এবং সে সঞ্চিত সম্পদের মালিক সঞ্চয়কারী নয় বরং দেশের রিক্ত, নিঃস্ব মানুষেরাই। আর এ হচ্ছে সত্যিকারের ইসলামের বিধান ও আইন। তাই যাদের হক, তাদেরকেই বিলিয়ে দিয়ে নিজ বোঝাকে হালকা করে নিলাম আমি।'

হযরত ফাতিমা (রা)-র কথা শুনে শামদেশের আমীর কন্যা ফাতিমা নিজের ভুল বুঝতে পেরে বললো, 'আয় সাইয়েদা! দোয়া করুন! যেন আমরণ আপনাকে অনুসরণ করতে পারি আমি।' এরপর আপন দাস দাসীসহ্ বিদায় নিলো সে।

অসুস্থ ফাতিমা (রা)

ফাতিমা (রা) একবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এ খবর পাওয়ায় রসূল (স) ইমরান বিন হাসিন (রা)-কে ডেকে বললেন, 'হাসিন, তুমিই আমার ঘনিষ্ট ও প্রিয় সহচর। চল ফাতিমা (রা)-কে দেখে আসি।'

তাঁরা হযরত ফাতিমা (রা)-র গৃহে পৌঁছে দরজায় হাত রাখলেন এবং রসূল (স) বললেন, 'আস্সালামু আলায়কুম! ফাতিমা, তোমার অনুমতি পেলে আমরা ভেতরে আসতে পারি।'

উত্তরে নবী দুলালী বললেন, 'তাশরীফ নিয়ে আসুন।' রসূল (স) বললেন, 'আমার সঙ্গে ইমরান বিন হাসিন (রা) আছে।'

এবার দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে ফাতিমা (রা) বললেন, 'আব্বা! আমার পরনে একটা চাদর ছাড়া দেহ ঢাকার মত অন্য কিছুই নেই।'

ইশারা করে রসূল (স) বললেন, 'ও তেই শরীর ঢেকে নাও।' পিতার ইশারা পেয়ে ফাতিমা (রা) আপ্রাণ চেষ্টা করলেন সেটা দিয়ে নিজের পুরো শরীর ঢাকবার কিন্তু পারলেন না। তখন বাধ্য হয়েই পিতাকে বিনয়ের সাথে বললেন, 'আব্বা! এতে যে কিছুতেই মাথা পর্যন্ত ঢাকা যাচ্ছে না।'

এবার রসূল (স) নিজের পবিত্র চাদরখানা মেয়ের দিকে ছুড়ে দিয়ে বললেন, 'এতেই মাথা ঢেকে নাও।' এরপর ভেতর যাওয়ার অনুমতি এলে তাঁরা ভেতরে ঢুকলেন এবং ফাতিমা (রা)-র শারীরিক অবস্থার কথা জিজ্ঞেস করলেন।

উত্তরে ফাতিমা (রা) বললেন, 'আব্বাজান! কঠিন ব্যথায় খুব কষ্ট পাচ্ছি এবং ক্ষুধায় কাতর করে রেখেছে। কেননা ঘরে খাবার কিছুই নেই।'

www.pathagar.com

রসূল (স) মৃদু হেসে বললেন, 'এতে ঘাবড়াবার কিছু নেই মা। আমিও তিনদিন ধরে না খেয়ে আছি। অথচ, আমার মর্যাদা আল্লাহ্‌র কাছে তোমার তুলনায় অনেক বেশি। আমি তাঁর কাছে যা' চাইব, অবশ্যই তিনি তা আমাকে দেবেন, তবু চাই না। কারণ, আমি পরকালকে ইহকালের চাইতে অধিক প্রাধান্য দিয়ে থাকি।'

এবার রসূল (স) কন্যার পিঠে স্নেহের হাত রেখে বললেন, 'মা ফাতিমা! তুমি জান্নাতে রমণীকুলের নেত্রী। অতএব, দুনিয়ার এই সাময়িক অভাবে তোমার হতাশ হওয়া উচিত নয়। বরং ধৈর্যধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।'

হাদীসের এক বর্ণনা থেকে জানা যায়, একদিন হযরত ফাতিমা (রা) নামায শেষ করে উদাসভাবে জায়নামাযের ওপর বসেছিলেন। তাঁর চোখ থেকে পানি গড়িয়ে পড়ছিলো। এমন সময় রসূল (স) সেখানে উপস্থিত হলেন এবং এ অবস্থার কারণ জানতে চাইলেন। উত্তরে নবী দুলালী বললেন, 'হঠাৎ আমার মনে আমাদের অভাব ও কষ্টের কথা উদয় হয়েছিলো, তাই একটু উদাসীন হয়ে পড়েছিলাম।'

এ কথা শুনে রসূল (স) ব্যথাতুর কণ্ঠে বললেন, ফাতিমা, তোমার জায়নামাযের একটা কোন্ উল্টিয় দেখ।'

ফাতিমা (রা) জায়নামাযের কোন্ উলটিয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলেন। তিনি দেখতে পেলেন সোনা ও চাদির দু'টি ঝরণা ধারা প্রবাহিত হচ্ছে। পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্চর্য যেনো তার জায়নামাযের নীচে এনে দিয়েছেন। বিস্মিত হযরত ফাতিমা (রা) যখন পিতার দিকে চোখ ফেরালেন তখন রসূল (স) বললেন, 'যতো খুশি নিতে পারো। যতো খুশি কাজে লাগাতে পারো। ভোগ-বিলাস আর ঐশ্বর্যে গা ভাসিয়ে দিয়ে জীবনকে কাটিয়ে দিতে পারো। সবই এখন তোমার এখতিয়ারভুক্ত। তবে মনে রাখবে, দুনিয়ার আরাম-আয়েশ ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু, পরকালের প্রাপ্তি বা পাওনা বলতে মাটিও মিলবে না। এবার তোমার ইচ্ছে, দুনিয়ায় নেবে না আখিরাতে নেবে।'

পিতার কথা শুনে কান্নায় ভেঙে পড়লেন ফাতিমা (রা)। তিনি কান্নাজড়িত কণ্ঠে আরজ করলেন, 'আব্বাজান! আমি আমার সাময়িক ভাবাবেগের ভুলের জন্য অনুতপ্ত এবং তার জন্য তওবা করছি। ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে এমনি ওয়াসওয়াসাকে মনে ঠাঁই দেব না। দুনিয়ার ঐশ্বর্যে আমার কাজ নেই।' এরপর তিনি জায়নামাযের কোন্টা ছেড়ে দিলেন।

www.pathagar.com

ফাতিমা (রা)-র ইবাদত

ফাতিমার (রা)-র পুরো জীবনটাই অভাব-অনটনের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু তবু তিনি ইবাদত-বন্দেগীর ব্যাপারে ছিলেন অনড়-অটল। হযরত ইমাম হোসাইন (রা) বর্ণনা করেছেন, 'আমার মাতা সৈয়দা ফাতিমা (রা)-কে সন্ধ্যা থেকে ভোর পর্যন্ত সমস্ত রাত আল্লাহ্‌র কাছে রোদন করতে দেখেছি। তাঁকে খুব বিনয়ের সাথে কাকুতি-মিনতি করে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করতেও শুনেছি। কিন্তু এ প্রার্থনায় একবারও তিনি আল্লাহ্‌র কাছে নিজের জন্য কিছু চাননি।'

ফাতিমা (রা) একবার অসুস্থ অবস্থায়ও সারারাত ইবাদতে কাটালেন। সকালে হযরত আলী যখন ফজরের নামায পড়তে মসজিদে রওনা হলেন তখন তিনিও ফজর পড়তে দাঁড়িয়ে গেলেন। নামায শেষ করে যাঁতা পিষতে শুরু করলেন। হযরত আলী (রা) নামায শেষে ফিরে এসে ফাতিমা (রা)-কে যাতা পিষতে দেখে বললেন, 'হে আল্লাহ্‌র রসূলের কন্যা! এতো পরিশ্রম করো না। কিছুক্ষণ আরাম করো। তা নাহলে অসুখ বেড়ে যেতে পারে।'

উত্তরে ফাতিমা (রা) বললেন, 'আল্লাহ্‌র ইবাদত এবং আপনার-ই তায়াত বা আনুগত্য অসুখের সর্বোত্তম চিকিৎসা। এর মধ্যে যদি কোনটি মৃত্যুর কারণ হয় তাহলে তারচেয়ে বেশি আমার জন্য আর সৌভাগ্যের কি হতে পারে?'

হযরত হাসান বসরী (রা) বর্ণনা করেছেন, 'নবী দুলালী ইবাদতের দিকে এমনই মজবুত ছিলেন যে, সারারাত নামাযে দাঁড়িয়ে থাকতেন।'

হযরত সালমান ফারসী (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, 'নবীজীর হুকুম মতো আমি একবার মা খাতুনে জান্নাতের বাড়িতে গেলাম। ছেলে ঘুমাচ্ছিলো, তিনি হাত পাখা দিয়ে তাকে বাতাস করছিলেন এবং মুখে কোরআন আবৃত্তি করছিলেন।'

এক বর্ণনা মতে জানা যায়, দোযখের আযাব সম্বন্ধে আয়াত নাজিল হওয়ার পর রসূল (স) কাঁদছিলেন। তা দেখে সাহাবাগণও কাঁদতে লাগলেন কিন্তু কেউই কাঁদার কারণ কি তা জানতে পারছিলেন না। সাহাবারা জানতো যে ফাতিমা (রা)-কে দেখলে রসূল (স) শত কষ্টের মধ্যেও শান্ত হন, তাই তাঁকে খবর পাঠানো হলো। খবর পেয়ে ফাতিমা (রা) মসজিদে ছুটে এলেন। তখন ফাতিমা (রা)-র পরনে ১০/১২ জায়গায় তালি দেয়া একটা কম্বল ছিল। সাহাবারা এ দৃশ্য দেখে আরো জোরে কাঁদতে লাগলেন।

www.pathagar.com

হযরত ফাতিমা (রা) এসেই রসূল (স)-কে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আব্বাজান! আপনার কান্নার কারণ কি?'

রসূল (স) দোযখের আযাব সংক্রান্ত নাযিলপ্রাপ্ত আয়াত তাঁকে পড়ে শোনালেন। নবী দুলালী হযরত ফাতিমাতুজ্জোহরা (রা) দোযখের ভয়াবহ আজাবের কোরানিক বর্ণনা শুনে জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। জ্ঞান ফিরলে তিনি বার বার ঐ আয়াত পড়ে কাঁদতে লাগলেন।

এ সময় মহান রাব্বুল আলামীন তার করুণা সম্পর্কিত আয়াত নাযিল করলেন। তখন রসূল (স) আল্লাহ্‌র করুণার কথা স্মরণ করে সিজদা করলেন।

একবার রসূল (স) ফাতিমা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রিয় কন্যা! মহিলাদের কি কি থাকা উচিত?'

ফাতিমা (রা) বললেন, 'আব্বাজান! মহিলাদের উচিত আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রসূল (স)-এর আনুগত্য করা, সন্তানদের প্রতি স্নেহবৎসল হওয়া, নিজের দৃষ্টি অবনত রাখা, নিজের রূপ গোপন রাখা, নিজে অপরকে না দেখা এবং অন্যেও যাতে দেখতে না পায় সে ব্যবস্থা করা।'

ফাতিমা (রা) প্রতি রসূল (স)-র ভালবাসা

ফাতিমা (রা)-কে রসূল (স) এতো ভালবাসতেন যে চোখের আড় হতে দিতে চাইতেন না। সে কারণেই তিনি ফাতিমা (রা)-কে নিজের গৃহের কাছে এনে রেখেছিলেন। ফাতিমা (রা) তখন ছোট– একদিন রসূল (স) মজলিসে সাহাবাদেরকে নিয়ে বসেছিলেন। এমন সময় ফাতিমা (রা)-কে যেতে দেখে তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁকে নিজের কাছে নিয়ে এলেন। এরপর নিজ চাদরটা বিছিয়ে দিয়ে তাতে কন্যাকে বসতে দিলেন এবং আদর করতে লাগলেন।

ফাতিমা (রা)-র প্রতি রসূল (স)-এর ভালবাসা এতো গভীর ছিলো যে, যে কোন বৈরী পরিবেশেও যদি ফাতিমা (রা) তাঁর-সামনে উপস্থিত হতেন তা হলে মিষ্টি হাসিতে তাঁর মোবারক মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠতো।

মেয়ের উত্তর শুনে রসূল (স) খুশি হলেন। রসূল (স) নিজে বলেছেন, 'ফাতিমা আমার পরিবার-পরিজনের মধ্যে আমার নিকট সর্বাধিক পিয়তমা।'

সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, একবার হযরত আলী (রা) আবূ জেহেলের কন্যা গোরাকে বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এ কথা শুনে ফাতিমা (রা) খুব দুঃখ পেলেন। রসূল (স) তাঁর নিকট তাশরীফ আনলে তিনি আরজ করলেন, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল (স)! আলী (রা) আমার ওপর সতীন আনতে চায়।'

www.pathagar.com

এ সংবাদে রসূল (স) মনে খুব আঘাত পেলেন। ওদিকে আবূ জেহেলও রসূল (স)-র নিকট বিয়ের অনুমতি চাইতে এলো। তখন রসূল (স) মসজিদে উপস্থিত হলেন এবং মিম্বরের ওপর দাঁড়িয়ে বললেন, 'হিশামের বংশধররা আলী (রা) সঙ্গে নিজের কন্যা বিয়ে দেয়ার জন্য আমার নিকট অনুমতি চায়। কিন্তু আমি অনুমতি দিবো না। অবশ্য আলী (রা) আমার মেয়েকে তালাক দিয়ে অন্য মেয়েকে বিয়ে করতে পারে। ফাতিমা (রা) আমার শরীরের একটি অংশ। যে তাকে কষ্ট দেয়, সে আমাকে কষ্ট দেয়। যে তাকে দুঃখ দেয়, সে আমাকে দুঃখ দেয়। আমি হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করতে চাই না। কিন্তু আল্লাহ্‌র কসম! তার রসূলের কন্যা এবং তাঁর দুশমনের কন্যা উভয়ে একস্থানে একত্রিত হতে পারে না।'

এরপর হযরত আলী (রা) বিয়ের পরিকল্পনা ত্যাগ করেন। এমন কি ফাতিমা (রা) বেঁচে থাকতে তিনি আর দ্বিতীয় বিয়ে করেন নি।

মান-অভিমান

হযরত রসূল (স) একবার ফাতিমা (রা)-র গৃহে তশরিফ নিলেন। হযরত আলী (রা) কোথায় জানতে চাইলে ফাতিমা (রা) বললেন, 'আমার সাথে রাগ করে তিনি ঘর হতে বেরিয়ে গেছেন।'

রসূল (স) দেরী না করে একজন সাহাবাকে পাঠালেন আলী (রা)-কে খুঁজে বের করার জন্য। কিছুক্ষণপর সাহাবী ফিরে এসে জানালেন মসজিদের মেঝেই শুয়ে আছেন আলী (রা)।

সাহাবাকে সংগে নিয়ে রসূল (স) তখনই বের হয়ে পড়লেন মসজিদের উদ্দেশ্যে। মসজিদে গিয়ে দেখলেন, আলী (রা) মাটিতে শুয়ে আছেন, আর পাশেই ধুলায় পড়ে আছে তাঁর-চাদর। রসূল (স) চাদরটা তুলে নিয়ে ঝাড়তে ঝাড়তে ডাকতে লাগলেন, 'হে আবূ তোরাব, উঠো! অর্থাৎ হে ধুলোর আব্বা, উঠ।'

রসূল (স)-এর আওয়াজ কানে যেতেই ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন হযরত আলী (রা)। তখনই তাঁকে সাথে নিয়ে ফাতিমা (রা)-র কাছে ফিরে এলেন আল্লাহ্‌র নবী (স) এবং তাদের উভয়ের মধ্যে আপস-রফা করে দিলেন।

www.pathagar.com

রসূল (স)-এর সাথে সাদৃশ্য

রসূল (স) দৈহিক গঠন, চলাফেরা, কথা-বার্তা ইত্যাদি অনেক বিষয়েই ফাতিমা (রা)-র মিল ছিলো। এ প্রসংগে হযরত আনাস (রা) বলেন, 'হযরত ফাতিমা (রা) এবং হাসান ইবনে আলী (রা)-র তুলনায় অধিক রসূলে পাকের সাদৃশ্য অনুরূপ আছ কেউ ছিলো না।'

আয়েশা (রা) বলেন, 'আদর্শ, পঠন-পাঠন, চলাফেরা এবং ওঠাবসায় হযরত ফাতিমা (রা)-র তুলনায় অধিক কাউকে আমি রসূলে পাক (স)-এর সদৃশ্য দেখি নি।'

বিভিন্ন বর্ণনা থেকে আরো জানা যায়, হযরত ফাতিমা (রা) যখন রসূল (স)-এর দরবারে আসতেন তখন খুশিতে রসূল (স) দাঁড়িয়ে যেতেন এবং চুম্বন করে নিজের স্থানে বসাতেন। আর রসূল (স) ফাতিমা (রা)-র গৃহে তাশরীফ নিলে ফাতিমা (রা)-ও অনুরূপ করতেন।

ফাতিমা (রা)-র মর্যাদা

ফাতিমা (রা)-র মর্যাদা ছিল অনেক অনেক বেশী। রসূল (স) বলেছেন, 'ফাতিমা আমার-শরীরের অংশ, যে তাকে অসন্তুষ্ট করে সে যেনো আমাকে অসন্তুষ্ট করলো।'

হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, 'ফাতিমা (রা)-র চেয়ে সত্যবাদী তার পিতা ব্যতীত আমি আর কাউকে দেখিনি। হযরত আয়েশা আরও বলেন, তাদের দু'জনের মধ্যে একটি বিষয় অস্পষ্ট ছিল। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি তাকে (ফাতিমাকে) জিজ্ঞেস করুন সে মিথ্যা বলবে না।'

রসূল (সঃ)-ইরশাদ করেন, 'জান্নাতে নারীদের সর্দার হবেন মরিয়ম, তারপর ফাতিমা বিনতু মোহাম্মদ, এরপর খাদিজা, তারপর ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া।'

যায়েদ ইবনে আরকাম বর্ণিত হাদীস, রসূল (স) বলেছেন, 'আলী, ফাতিমা, হাসান এবং হুসাইনের সাথে যাদের যুদ্ধ, তাদের সাথে আমারও যুদ্ধ।' একবার রসূল (স) মাটির ওপর চারটি দাগ দিয়ে লোকদেরকে বলেন, 'তোমরা বলতে পার এটা কি?' উপস্থিত লোকেরা বললো, 'আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই ভাল জানেন।' তখন তিনি বললেন, 'ফাতিমা বিনতু মোহাম্মদ, খাদিজা বিনতু খুওয়াইলিদ, মরিয়ম বিনতু ইমরান এবং আছিয়া বিনতু মুযাহেম, জান্নাতবাসী নারীদের মধ্যে এদের মর্যাদা সর্বাধিক।'

www.pathagar.com

উপরিউক্ত চার জন মহিলার শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে হাদীসে আরো বর্ণিত আছে, 'তোমাদের অনুসরণের জন্য দুনিয়ার স্ত্রীদের মধ্যে মরিয়ম বিনতু ইমরান, খাদিজা বিনতু খুওয়াইলিদ, ফাতিমা বিনতু মোহাম্মদ এবং ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া যথেষ্ট।'

হযরত ফাতিমা (রা)-কে রসূল (স) বলতেন, 'তোমার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হন, আর তোমার রাগ-উষ্মায় আল্লাহ্ ক্রুদ্ধ হন।'

জানা যায় রসূল (স) সফর, যুদ্ধ প্রভৃতি স্থান থেকে ফিরে প্রথমে মসজিদে গিয়ে দু'রাকাত নামায আদায় করতেন। পরে হযরত ফাতিমা (রা)-র গৃহে যেতেন। এরপর যেতেন নিজ গৃহে।

সত্যিকার অর্থে রসূল (স) তাঁর সন্তানদের মধ্যে ফাতিমা (রা)-কেই অধিক ভালবাসতেন। এ ব্যাপারে কোন একজন তাবেয়ী ফাতিমা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, রসূল (স) সবচেয়ে বেশি ভালবাসতেন কাকে? উত্তরে তিনি বলেন, মহিলাদের মধ্যে ফাতিমাকে, আর পুরুষদের মধ্যে হযরত আলীকে।'

এরপরও বড় কথা হলো, ফাতিমা (রা) হযরত খাদিজা (রা) ও বিশ্বনবী (স)-র সর্বাধিক প্রিয়তমা দুলালী, শেরে খোদা হযরত আলী (রা)-র স্ত্রী, জান্নাতী যুবকদের সরদার হাসান-হোসাইনের মা এবং বেহেশ্‌তী নারীদের নেত্রী। আরও একটা বিষয় তাঁর মর্যাদাকে সমুন্নত করেছে, তা'হল– তাঁর মাধ্যমেই নবী বংশের ধারাবাহিকতা অব্যাহত আছে।

রসূল (স)-এর দৃষ্টিতে ফাতিমা (রা)

রসূল (স) ফাতিমা (রা), তাঁর স্বামী আলী (রা), সন্তান হাসান (রা) ও হোসাইন (রা)-কে অত্যধিক ভালবাসতেন। হাসান-হোসাইনকে তো নিজের কলিজার টুকরা মনে করতেন। তাদেরকে তিনি পিঠে নিয়ে ঘোড়া ঘোড়া খেলতেন।

আয়েশা (রা) বলেন, 'একদিন সকালে রসূল (স) পশমী একটি কালো চাদর পরেছিলেন। এমন সময় পরপর হাসান, হোসাইন, ফাতিমা এবং আলী আসলেন। রসূল (স) তাদের সকলকেই চাদরের ভেতর টেনে নিলেন এরপর বললেন, 'আল্লাহ্ পাক তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূরীভূত-করণ এবং তোমাদেরকে পবিত্রকরণের ইচ্ছা পোষণ করেছেন।'

অন্যত্র হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন, 'আমরা রসূল পত্নী সকলেই রসূল (স)-এর কাছে বসা ছিলাম, এমন সময় হযরত ফাতিমা রসূল (স)-এর মতো কদম রেখে তাঁর মতো হেঁটে হেঁটে উপস্থিত হলেন। রসূল (স) ফাতিমাকে

www.pathagar.com

দেখে 'মারহাবা' বলে নিজের ডান অথবা বাম দিকে বসিয়ে কানে কানে কিছু কথা বললেন, যে কারণে হযরত ফাতিমা অত্যধিক ক্রন্দন শুরু করলেন। রসূল (স) ফাতিমা (রা)-র অস্থিরতা দেখে পুনরায় কানে কানে কিছু কথা বললেন। এবার ফাতিমা (রা) আনন্দে হাসতে লাগলেন। আমি ফাতিমাকে বললাম, 'সমস্ত স্ত্রীগণের উপস্থিতিতে কেবল তোমার সাথে কানে কানে কথা বলে তিনি তোমাকে সম্মান প্রদর্শন করলেন, আর তুমি কাঁদছ?' এরপর রসূল (স) যখন উঠে গেলেন, তখন আমি ফাতিমাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমাকে রসূল (স) কানে কানে কি কথা বললেন?' ফাতিমা উত্তরে বললেন, 'আমি রসূল (স) ভেদের কথা ফাঁস করবো না।'

রসূল (স)-এর ইন্তেকালের পর আমি ফাতিমা (রা)-কে বললাম, 'তোমার ওপর আমার যে হক এবং অধিকার আছে, সেই হক এবং অধিকারের দাবিতে বলছি যে, তোমাকে রসূল (স) কানে কানে যা বলেছিলেন, তা আমাকে শুনাতেই হবে।' ফাতিমা বললেন, 'হ্যাঁ এখন বলা যেতে পারে।' এই বলে ফাতিমা (রা) বললেন, 'প্রথমবার কানে কানে রসূল (স) আমাকে বললেন যে, হযরত জিব্রাঈল ফেরেশতা প্রতি বছর-সারা বছর নাযিলকৃত কুরআনের অংশটুকু একবার পাঠ করেন, আর এবার দুইবার পাঠ করেছে, তাই আমার মনে হয় যে, আমার মৃত্যুর সময় অতি নিকটে। সুতরাং হে ফাতিমা! তুমি সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ পাককে ভয় করবে এবং ধৈর্য ধারণ করবে। আমি তোমার জন্য উত্তম আদর্শ অতএব তুমি আমাকেই জীবন পথে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করবে।

প্রথমবার-এই শ্রবণ করে আমি কাঁদতে শুরু করি। আমার অস্থিরতা এবং ক্রন্দন দেখে রসূল (স) আমাকে পুনরায় কানে কানে বললেন, হে ফাতিমা! তুমি আহলে বাইতের মধ্যে সর্বপ্রথম আমার সঙ্গে মিলিত হবে এবং তুমি জান্নাতে মহিলাদের সর্দার হবে। এ কথায় আমি খুশি হলাম এবং হাসতে থাকলাম যা, আপনি দেখেছেন।'

হযরত আলী (রা)-র দৃষ্টিতে ফাতিমা (রা)

আলী (রা) ফাতিমা (রা)-কে এত বেশি পছন্দ করতেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর আলী (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল 'আপনার সাথে ফাতিমা (রা)-র আচরণ কেমন ছিল?' উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'ফাতিমা ছিলেন জান্নাতের একটি সুগন্ধী ফুল। ফুল শুকিয়ে বা ঝরে যাওয়ার পরও আজ পর্যন্ত তার স্নিগ্ধ শীতল সুষমা আমোদিত ও ভরপুর করে রেখেছে আমার অন্তরকে।'

www.pathagar.com

ফাতিমা (রা) ইন্তেকাল করলে দাফনের সময় আলী (রা) বলেছিলেন, 'ইয়া রসূলুল্লাহ্ (স)! ফাতিমার মৃত্যু আমার ধৈর্য শক্তিকে ক্ষীণবল করে দিয়েছে। আমার বাহুবল আর সৌর্য-বীর্য লোপ পেতে বসেছে। শুধু-একটি মাত্র কথাকে মনে করেই আজ ধৈর্য ধারণের চেষ্টা করছি। তা'হলো আপনার বিরহ্। আমি ধৈর্যের সাথে মেনে নিয়েছিলাম আপনার বিরহকেও। সেদিন আমি নিজ হাতেই কবরে নামিয়েছিলাম আপনাকে। আমার হাত আর কোলের মাঝখানেই তো আপনার প্রাণবায়ু দেহ ত্যাগ করেছিল।

ফাতিমা (রা) ছিলেন আমাদের প্রতি আল্লাহ্র দানস্বরূপ। তিনিই আবার উঠিয়ে নিলেন তাঁকে। এবার আমার দুঃখ ও শোক– সেতো আমরণের জন্যই। এ কথা না হয় মেনে নিলাম কিন্তু আপনার কাছে পৌঁছা পর্যন্ত আমারই বা আর অন্তরে শান্তি কোথায়? চোখের ঘুম কই? আমি যে আজ সর্বহারা।

আপনার প্রাণ-প্রতিম ফাতিমা (রা)-ই আপনাকে সব বলবেন। আপনি তাঁর কাছ হতে জেনে নিন আমার অবস্থা। তাঁকে ভালভাবে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিন আপনার আলী (রা) আজ কতো অসহায়, কতো একা অথচ, আপনার স্মৃতি তো আজও সামান্যতম ম্লান হয়নি আমার অন্তর হতে! এই তো সেদিন মাত্র পরলোকে গমন করলেন আপনি। তবু, আপনার স্মৃতি অন্তরময় থাকতেও আজ নিজেকে এতো অসহায় কেন মনে হয় আমার কাছে। এর উত্তর কে আজ বলে দেবে আমাকে।'

একটু থেমে, কাঁদতে কাঁদতে আবার বললেন, 'মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দু'বন্ধু যেমনি হাস্যোজ্জ্বল মুখে সালাম জানায় পরস্পরকে-আপনি আর আপনার দুলালীর প্রতি আমার সালাম তেমনি পৌঁছুক। এ সালাম হোক হতাশা আর বেদনা বিবর্জিত।

যদি আজ আমি এখান হতে জীবিতাবস্থায় ঘরে ফিরি, এর অর্থ এ নয় যে, আপনাদের প্রতি আমার অন্তরের টান ছিলো না। আর যদি ফাতিমাকে ভুলে আপনার জেয়ারতের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে থাকি, এর অর্থ সবরকারীদের প্রতি আল্লাহ্র প্রতিশ্রুত ফল লাভ হতে নিরাশ হওয়া নয় নিশ্চয়ই।'

তোমাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি হযরত ফাতিমা (রা)-র নামাযে জানাযা হযরত আলী (রা)-র পড়িয়েছিলেন। তিনি ফাতিমা (রা)-র মৃত্যুতে বেদনা বিধুর মন নিয়ে একটি কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। কবিতাটির অর্থ এমন–'আমি দেখছি দুনিয়ার সব দুঃখ চারিদিক হতে আমাকে ঘিরে ফেলেছে। আর যে ব্যক্তি পরিণত হয় এ অবস্থার শিকার তা' রোগতুল্য হয়ে আমরণের সঙ্গী হয় তার। দুই বন্ধুর

www.pathagar.com

অদেখাকালের মধুর কল্পনা সময়কে করে দীর্ঘায়িত। আর মিলনানন্দ– মুহূর্ত সে যে কত সাময়িক।

আহমদ (স)-এর পর ফাতিমা (রা) হতে আমার বঞ্চিত হওয়ার অর্থতো এই দাঁড়ায় যে, কোন বন্ধুই চিরস্থায়ী সংগ দেয় না কাকেও।'

আল্লাহ্‌র চোখে ফাতিমা (রা)

হাদীসে বর্ণিত আছে রসূল (স) ইরশাদ করেছেন, 'কিয়ামতের দিন আমিই সর্বপ্রথম পুলসিরাত পার হবো। অতঃপর ঘোষিত হবে, হে পুনরুত্থিত আদম সন্তানগণ! তোমরা চোখ বন্ধ কর,-নবী নন্দিনী ফাতিমা (রা) পুলসিরাত পার হবেন। যখন তিনি ঐ সেতু পার হতে থাকবেন, তখন তাঁর শরীর সবুজ রংয়ের দু'খানা চাদরে ঢাকা থাকবে।'

হযরত আবূ হোরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন, 'মহানবী (স)-র পরেই হযরত ফাতিমা (রা) সর্বোচ্চ বেহেশতে প্রবেশ করবেন।'

হযরত হুজাইফা (রা) ইসলাম কবুল করার কারণে তাঁর মা তাকে গালি-গালাজ করতো। যে জন্য তিনি বাধ্য হয়ে রসূল (স)-এর সাথে পর্যন্ত দেখা সাক্ষাৎ করা বন্ধ করে দেন। এরপর তার মায়ের মন একটু নরম হলে তিনি নিজেই হুজাইফা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, 'নবীর সাথে তোমার কখন সাক্ষাতের কথা?' হুজাইফা (রা) উত্তরে বললেন, 'আপনার গালি গালাজের পর থেকে তাঁর সাথে আমার কোন কথা-বার্তাও নেই দেখাও নেই। যদি আপনি অনুমতি দেন, তাহলে তাঁর সাথে মাগরিবের নামায আদায় করবো এবং আপনার ও আমার জন্য নবীর মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ পাকের দরবারে গোনাহ্ মাফের প্রার্থনা করবো।' এরপর হুজাইফা (রা) বলেন, আম্মাজান অনুমতি দিলেন, আর আমি রসূল (স)-এর দরবারে হাযির হয়ে এক সাথে মাগরিব এবং এশার নামায আদায় করি। নামাযের পর তিনি রওয়ানা হলেন। আমিও পেছনে পেছনে রওয়ানা হলাম। আমার পদশব্দ শুনে প্রশ্ন করলেন, 'কে তুমি! হুজাইফা নাকি, কি ব্যাপার?' আমি আমার ঘটনা শুনালাম। রসূল (স)-ইরশাদ করলেন, 'আল্লাহ্ পাক তোমাকে এবং তোমার আম্মাজানকে ক্ষমা করুন। অতঃপর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি আমার সাথে একজনকে কথা বলতে শুনেছ?' আমি বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রসূলাল্লাহ!' রসূল (স) বললেন, 'তিনি একজন ফেরেশ্‌তা, আল্লাহ্‌র অনুমতি নিয়ে আমাকে সালাম করার জন্য এবং হাসান ও হোসাইন জান্নাতী যুবকদের সরদার আর হযরত ফাতিমা বিশ্ব মহিলাদের প্রধান এই

www.pathagar.com

সুসংবাদ দেয়ার জন্য তিনি এই প্রথম পৃথিবীতে অবতরণ করেন। এর পূর্বে এই ফেরেশ্‌তা কখনো এই পৃথিবীর বুকে অবতরণ করেন নি।'

এই বর্ণনা থেকে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো আল্লাহ্‌র কাছে হযরত ফাতিমা (রা)-র মর্যাদা কতো অধিক ছিল।

অনুকরণীয় আদর্শ

হযরত ফাতিমা (রা) শিশুকাল থেকেই দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মানব-মানবীর সংস্পর্শে বেড়ে উঠেছেন। খারাপ কোন কিছুই ঘুণাক্ষরেও তাকে স্পর্শ করার সুযোগ পাইনি। যে কারণে তিনি হয়ে উঠেছেন বিশ্ব নারী সমাজের আরাধ্য। আমরা তার সমগ্র জীবনটার দিকে তাকালে দেখতে পাই শত দারিদ্র্যের মধ্যেও তিনি গভীর অভিনিভেষ সহকারে ধর্মীয় বিধিবিধান মেনে চলেছেন। সাংসারিক সমস্ত কাজ-কর্ম নিজে হাতে করেছেন কিন্তু কখনো এ নিয়ে স্বামীর কাছে কোন অনুযোগ করেন নি। ভদ্রতা, নম্রতা ও মধুর আচরণের জন্য সবার কাছে তিনি প্রশংসিত ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন ধৈর্যশীলা ও সংযমশীলা নারীর মূর্ত প্রতীক। গরীব-দুঃখীর জন্য তিনি ছিলেন সত্যিকার অর্থেই এক আশ্রয়স্থল। তিনি নিজে না খেয়ে নির্দ্বিধায় ক্ষুধার্তকে খাবার দিতেন।

তদানীন্তন সময়ের আরবের মহিলারা যখন ফাতিমা (রা)-র নিকট নানা বিষয়ে উপদেশ নিতে আসতেন তখন তিনি তাঁদের উদ্দেশ্যে যে সব কথা রাখতেন তার কিছু এখানে তুলে ধরা হল–

প্রিয় বোনেরা!

১. তোমরা মনে রাখবে-নামায, রোযা, যিকির ও আল্লাহ্‌র ইবাদতে একনিষ্ঠ হওয়ার জন্যই এ পৃথিবীতে মানুষের জন্ম। তাই সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখবে।

২. আপনজন ও প্রতিবেশীদের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখবে। কারণ-অসৎ আচরণ আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূল (স)-এর নিকট সবচেয়ে অপছন্দের।

৩. দুঃখী ও অসহায়দের প্রতি ভালো ব্যবহার করবে। কারণ, কেয়ামতের দিনে যখন তুমি হবে সব থেকে অসহায় তখন এ ব্যবহার তোমায় সহায় হয়ে দাঁড়াবে।

৪. আমার পিতা বলেন, আল্লাহ্‌র পরে যদি কাকেও সিজদা করার নির্দেশ হতো-তবে নারীদের প্রতি নির্দেশ হতো নিজ নিজ স্বামীকে সিজদা করার। অতএব. বুঝে দেখ-প্রতিটি নারীর ওপর তার স্বামীর প্রভাব কত বেশি।

www.pathagar.com

৫. স্বামী ও তাঁর গুরুজনদের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করো। আল্লাহ্ আর তার রসূল (স)-র সন্তুষ্টি লাভ করা সম্ভব হবে তোমাদের পক্ষে।

৬. বিপদে ধৈর্য ধারণ করবে। আর, তার পথ হলো– যে সব লোক তোমার অপেক্ষা সুখী– তাদেরকে না দেখে যে সব লোক তোমার অপেক্ষা বিপদগ্রস্ত তাদের প্রতি নজর দিয়ে নিজ অবস্থার জন্য আল্লাহ্র শোকর গুজারী করবে। প্রতিটি কাজ বিসমিল্লাহ্' বলে শুরু করবে, আর আল হামদুলিল্লাহ্ বলে শেষ করবে। তবে জীবনের সব ক্ষেত্রে আল্লাহ্র রহমতের আশা করা যেতে পারে।

৭. নিজের প্রতিটি ভুল ও পাপের জন্য অনুতপ্ত হবে। আর কখনো পর্দার খেলাপ করবে না। আপন সতীত্বের প্রতি সজাগ থাকবে। কারণ, নারী জীবনের সবচাইতে বড় সম্পদ তার সতীত্ব। আর তাকে টিকিয়ে রাখার উত্তম পথ (আত্মিক ও বাহ্যিক) পর্দা।

৮. উচ্চস্বরে কথা বলবে না। স্বামীর অনুগত হবে। তাঁর সেবায় আত্মনিয়োগ করবে। কারণ, তাঁর চরণতলেই রয়েছে তোমার জান্নাত।

৯. স্বামীর সব সম্পদই তোমার। তবু তাঁর অনুমতি ছাড়া কারো কোন কিছু দিও না। নিজ প্রয়োজন যত বড়ই হোক না কেন স্বামীর অনুমতি ছাড়া কোথাও যেও না। এমন কি স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে কোন নফল ইবাদত পর্যন্ত স্ত্রীর জন্য ঠিক নয়।

১০. শ্বশুর-শাশুড়ির প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন কর। কারণ, তাঁদের দোয়ার মাঝেই নিহিত তোমার স্বামীর জীবনের সব মঙ্গল আর অমঙ্গল। এসব কথাকে মেনে চলতে চেষ্টা করবে। এতেই স্বার্থক হবে তোমার এ নারী-জন্ম। আর পরকালেও এসব উপদেশ পালনকারিনীর মুক্তির জিম্মাদার হবেন স্বয়ং আল্লাহ্ আর তাঁর রসূল (স)।

রসূল (স)-এর মৃত্যু ও ফাতিমা (রা)

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, 'রসূল (স) মৃত্যুর অসুস্থতায় চরম অবস্থায় উপনীত হলে হযরত ফাতিমা (রা) অস্থির হয়ে পড়েন। ফাতিমা (রা)-র অস্থিরতা দেখে রসূল (স) ইরশাদ করেন, 'হে ফাতিমা! আজকের পর থেকে তোমার পিতার আর দুঃখ কষ্ট থাকবে না।' অতঃপর রসূল (স) ওফাত হওয়ার পর হযরত ফাতিমা (রা) 'হে পিতা! তোমাকে জিব্রাইলের হাওয়ালা করলাম'

www.pathagar.com

বলে দুঃখ প্রকাশ করেন। এরপর দাফন কাজ সম্পন্ন হলে হযরত ফাতিমা (রা) তাঁর অস্থিরতা এই বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশ করেন, 'আল্লাহ্‌র রসূল (স)-এর ওপর মাটি ফেলে তোমরা আনন্দিত হচ্ছ?'

অন্য এক বর্ণনায় আছে, দুঃখে কাতর ফাতিমা (রা) বলতে থাকেন, 'প্রিয় পিতা (স) হকের দাওয়াত কবুল করেছিলেন এবং জান্নাতুল ফেরদৌসে দাখিল হয়েছেন! আহ! জিব্রাইল (আ)-কে তাঁর ইন্তেকালের খবর কে পৌঁছাতে পারে।'

এরপর তিনি এ বলে দোয়া করেন, 'ইলাহী আমার। ফাতিমার অন্তরকে মুহাম্মদ (স) অন্তরের নিকট পৌঁছে দিন। হে আমার আল্লাহ্। আমাকে রসূল (স) দীদার লাভ করিয়ে খুশি করে দিন। ইলাহী! হাশরের দিন মুহাম্মদ (স) শাফায়াত থেকে মাহরুম করো না।' হাদীসে বর্ণিত আছে রসূল (স)-এর মৃত্যুতে হযরত ফাতিমা (রা) নিম্নোক্ত কবিতাটি রচনা করেন ও আবৃত্তি করেন–

আকাশ-গর্ভ ধূলিকা পূর্ণ
সূর্য হইল কিরণ শূন্য
জ্যোতিষ্ক সকল হইল মলিন
ভূতল শোকেতে হইল পূর্ণ।
হইল যে তাহা শতধা চূর্ণ।
পূরব-পশ্চিমে শোকার্ত আমীন
মিসরে আর ইয়ামনে সবে
পুরাইল দিক ক্রন্দন রবে;
পর্বতে পর্বতে প্রান্তরে প্রান্তরে,
উঠিল ভয়ে কাঁদিয়া সবে
প্রলয় যেন এখনি হবে,
বিচ্ছেদ-আঘাত অন্তরে অন্তরে॥
ধরাতে আর হবে না পুনঃ
রাসূল নব আগত কোন,
ওহি যে নিঃশেষ তোমাতে হইল।
সালাম হউক তোমার উপর
সহস্র বার ওহে নবীবর।
আমীন-আমীন ফেরেশতা বলিল॥'

–দুররুল মনসূর

www.pathagar.com

আসলে হযরত ফাতিমা (রা)-র ভিতর উৎকৃষ্টমানের কবি প্রতিভা ছিল। রসূল (স)-এর মৃত্যুর পর তিনি আরও কবিতা রচনা করেছিলেন। আমাদের দেশের প্রখ্যাত কবি, কবি আবদুস সাত্তার-এর অনুবাদ করা এমন প্রসিদ্ধ দু'টি কবিতা এখানে উদ্ধৃত করছি–

নাত

যে কেউ সুঘ্রাণ নেয় নবীর মাযারে একবার
লাগবে না ভালো তার পৃথিবীর কোন ঘ্রাণ আর
দারুণ আহত আমি, হৃদয়ে এমন অন্ধকার–
দিবসে পড়তো যদি সে আঁধার কণা পরিমাণ
তাহলে দিবস হতো চিরতরে রাত্রির সমান।

মর্সিয়া

তোমার বিহনে আমি বৃষ্টিহীন বিশুষ্ক মৃত্তিকা,
তোমারই অন্তর্ধানে বন্ধ আজ ঐশীবাণী সব।

তোমার মৃত্যুর আগে মৃত্যু হতো যদি এ আমার
তুমিই করতে শোক। আমার তোমার মাঝখানে
তখন মাটির স্তূপ ছাড়া কিছুই থাকতো না আর।

আমার হৃদয়ে আজ অন্ধকার, কণামাত্র তার–
পড়তো এ বিশ্বে যদি, আলো বলে কিছু থাকতো না আর।

জানা যায় রসূল (স)-এর মৃত্যুর পর ফাতিমা (রা) যতদিন জীবিত ছিলেন তিনি আর স্বাভাবিক হতে পারেন নি। এ ব্যাপারে আল্লামা ইবনুল আসীর বলেন, 'যতদিন তিনি এরপর জীবিত ছিলেন কখনও হাসেন নি।'

হাদীস শাস্ত্রে ফাতিমা (রা)-র অবদান

ফাতিমা (রা) সর্বমোট মাত্র ১৮টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, হযরত আয়েশা (রা), হযরত আলী (রা) হযরত হাসান (রা), হযরত হোসাইন (রা), উম্মে কুলসুম (রা), উম্মে সালমা (রা), উম্মে রাফে (রা), আনাস বিন মালেক (রা) প্রমুখ সাহাবাগণ।

www.pathagar.com

সন্তান-সন্ততি

ফাতিমা (রা)-র গর্ভে পাঁচটি সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। এর তিনজন পুত্র– হযরত হাসান (রা), হযরত হোসাইন (রা) ও হযরত মোহসেন (রা) এবং দু'জন কন্যা সন্তান– হযরত জয়নব (রা) ও হযরত উম্মে কুলসুম (রা)।

ইমাম হাসান (রা)

ইমাম হাসান (রা) হিজরী দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় সনে মদীনায়– জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর উপনাম ছিল আবূ মুহাম্মদ। বংশ লতিকা– আবূ মুহাম্মদ হাসান ইবনে আলী ইবনে আবূ তালিব ইবনে আবদুল মুত্তালিব। চেহারা-সুরতের দিক দিয়ে তিনি অনেকটা রসূল (স)-এর মতই ছিলেন। হযরত আনাস (রা) বলেন, 'হযরত হাসান ব্যতীত রসূল (সঃ)-এর সাথে আকৃতিতে এতো অধিক সাদৃশ্য আর কারো ছিলো না।' রসূলই (স)-তাঁর নাম রেখেছিলেন।

একদিন শিশু হাসান (রা)-কে রসূল (স) কাধে নিয়ে হাটছিলেন। এ দৃশ্য দেখে হযরত ওমর (রা) বললেন, 'হাসান। তুমি উত্তম সোয়ারী পেয়েছ।' উত্তরে রসূল (স) বললেন, 'সোয়ারও যে উৎকৃষ্টতম।'

হাসান (রা) খোলাফায়ে রাশেদার ৫ম খলীফা নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি সর্বমোট ১৩টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত হাসান (রা) হিজরী ৫০ সালে ইন্তেকাল করেন।

ইমাম হোসাইন (রা)

হোসাইন (রা) হিজরী ৪ সনের ৫ই শাবান জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের সংবাদ শুনে রসূল (স) ছুটে আসেন এবং তাঁর- কানে আজান ফুঁকে দেন। হযরত আলী (রা) ছেলের নাম রেখেছিলেন, 'হরব'। কিন্তু রসূল (স) সে নাম পাল্টে নাম রাখেন, 'হোসাইন'। তাঁর উপাধি ছিল রাশীদ, তাইয়্যেব, সাইয়্যেদ, মুবারক ইত্যাদি।

তাঁর গঠন প্রকৃতি সম্বন্ধে হযরত আলী (রা) বলেছেন, 'হাসান (রা)-এর বক্ষস্থল হতে মাথা পর্যন্ত আকৃতি ও গঠন প্রকৃতি অন্যান্যদের তুলনায় রসূল (স)-এর অধিক সাদৃশ্য ছিল। আর ইমাম হোসাইন (রা)-এর দেহের নিম্ন অংশের গঠন প্রকৃতি নবী (স)-র মতো ছিলো।'

হোসাইন (রা) সম্বন্ধে রসূল (স) বলেছেন, 'যে হোসাইনকে ভালবাসে সে

www.pathagar.com

যেন আমাকে ভালবাসে। যে হোসাইনের সাথে শত্রুতা করে সে যেন আল্লাহ্‌র সাথে শত্রুতা করে।'

তিনি আরও বলেছেন, 'হোসাইনের উৎপত্তি আমা' হতে। যে হোসাইনকে বন্ধুভাবে-আল্লাহ্ তাকে গ্রহণ করেন বন্ধু হিসাবে।'

হযরত হোসাইন (রা) মোট ১৮টি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তিনি ৬১ হিজরী সনের ১০ই মহররম তারিখে ইরাকের কারবালা প্রান্তরে ইয়াজিদের সৈন্যবাহিনী কতৃক অবরুদ্ধ হন। ইসলামের দুষমন ইয়াজিদ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ না করে মর্দে মুজাহিদ হোসাইন (রা) সঙ্গী-সাথীসহ যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাত বরণ করেন।

হযরত আলী (রাঃ)-র অপর পুত্র হযরত মোহসেন (রা) শিশু বয়সেই ইন্তেকাল করেন।

হযরত উম্মে কুলসুম (রা)

উম্মে কুলসুম যখন একান্তই শিশু তখন তাঁর প্রিয় নানা রসূল (স) ইন্তেকাল করেন। এর কিছুদিন পরই–মাতা ফাতিমা (রা)-ও ইন্তেকাল করেন। এরপর-একে একে পিতা হযরত আলী (রা), ভাই হযরত হাসান (রা)-এর মৃত্যু তাকে দেখতে হয়েছে। এমন কি কারবালা প্রান্তরে যে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে তা-ও স্বচক্ষে তিনি দেখেছেন অর্থাৎ ভাই হোসাইন (রা) শাহাদাত।

হযরত জয়নব (রা)

রসূল (স) যখন ইন্তেকাল করেন তখন জয়নব (রা)-এর বয়স ৬ বছর। তিনি পঞ্চম হিজরীর জমাদিউল আউয়াল মাসে জন্মগ্রহণ করেন। রসূল (স) তাঁর নাম রাখেন যয়নব। তিনি নিজের মুখের পবিত্র লালা তাঁর মুখে দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, 'খাদিজা (রা)-র সঙ্গে তার সাদৃশ্য রয়েছে।' তাঁর বহু উপনাম ছিল, এর মধ্যে বেশি প্রসিদ্ধ হল– উম্মুল মাছায়েব অর্থাৎ মুসিবতের মা। এ নামে তাকে ডাকা হতো এ কারণে যে, তিনি কারবালার সেই দুঃখজনক ঘটনা নিজে অবলোকন করেছিলেন।

হযরত যয়নব (রা) কারবালার ঘটনা মদীনার লোকদের শোনাতো– এ অজুহাতে ইয়াজিদ তাঁকে মদীনা থেকে মিসর পাঠিয়ে দেন। সেখানেই তিনি ৬৩ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন।

www.pathagar.com

পরপারের পথে ফাতিমা (রা)

রসূল (স) ইন্তেকালের মাত্র ৬ মাস পরে ১১ হিজরী সনের ৩রা রমযান তারিখে মাত্র ২৯ বছর বয়সে হযরত ফাতিমাতুজ জোহরা ইন্তেকাল করেন। ঐ যে রসূল (স) বলেছিলেন, 'আহলে বইয়াতের মধ্যে তুমিই সর্বপ্রথম আমার সাথে মিলিত হবে।' সেই ভবিষ্যত বাণীই বাস্তবায়িত হলো। আসলে রসূল (স) মৃত্যুতে ফাতিমা (রা) একেবারে ভেঙে পড়েছিলেন। তিনি সর্বদা তাঁর মহান পিতার কথা স্মরণ করতেন এবং নিরবে কাঁদতেন।

ফাতিমা (রা) কিন্তু তেমন কোন রোগে ইন্তেকাল করেন নি। এ ব্যাপারে উম্মে সালমা (রা) বলেন, 'হযরত ফাতিমা (রা)-র ওফাতের সময় হযরত আলী (রা) ঘরে ছিলেন না। হযরত ফাতিমা (রা) আমাকে ডেকে পানির ব্যবস্থা করার জন্য বলেন। তিনি বলেন, আমি গোসল করবো। আমি পানির ব্যবস্থা করে কাপড় বের করে তাঁকে দেই। তিনি ভালোরূপে গোসল করে কাপড় পরলেন। এরপর বললেন, বিছানা পেতে দিন, আমি শোবো। আমি বিছানা পেতে দিলাম। তিনি কেবলামুখী হয়ে শুলেন। আমাকে বললেন, বিদায়ের সময় ঘনিয়ে এসেছে। আমি গোসল করেছি, তাই পুনরায় গোসল করার দরকার নেই। আমার দেহ খোলারও আর কোন প্রয়োজন নেই। এরপরই তিনি ইন্তেকাল করেন। হযরত আলী (রা) ঘরে ফিরে এলে আমি তাঁকে এ ঘটনা জানালাম। তিনি তাঁকে পুনরায় গোসল না করিয়ে দাফন করেন।'

আবদুল্লাহ্ ইবনে বুরায়দাহ্ বর্ণনা করেছেন, 'ফাতিমা (রা) আসমাকে বলেন, আমাকে কফিনের ভেতর মানুষ দেখবে, এভাবে আমাকে নিলে আমার বড় লজ্জা হবে।'

এ ব্যাপারে উম্মে জাফর বর্ণনা করেছেন, ফাতিমা (রা) বলেছেন, 'মহিলাকে কাফনের কাপড়ে আচ্ছাদিত করে তার প্রশংসা করা, তার সম্পর্কে কোন কিছু বলাকে আমি অত্যন্ত অপছন্দ করি। আসমা হযরত ফাতিমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, না অবশ্যই না, হে নবী কন্যা। তোমাকে হাবশার প্রচলিত প্রথার মত তাঁবুতে উঠাবো না।' ফাতিমা বললেন, আমার লাশের সাথে তোমরা কি অবস্থা ঘটাবে তা আমাকে দেখাও? আসমা খেজুরের ডাল এনে খাটের মাঝে লাশের মতো রেখে হযরত ফাতিমাকে দেখালেন, হযরত ফাতিমা স্বচক্ষে পরিদর্শন করে মুচকি হাসলেন, রসূল (স)-এর মৃত্যুর পর আর কোন দিন হযরত ফাতিমা (রা)-কে হাসতে দেখা যায় নি। এরপর আসমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'কতো

www.pathagar.com

সুন্দর, কতো ভালো? আল্লাহ্ পাক তোমাকে পর্দায় রাখুন– যেমন তুমি আমাকে পর্দায় রেখেছ। হে আসমা। মৃত্যুর পর কেবল তুমি আমাকে গোসল দিবে, আর কেউ যেন আমার লাশের কাছে না আসে।'

ফাতিমা (রা) রাতেরবেলা ইন্তেকাল করেন। তাঁর ওসিয়ত মতো ঐ রাতেই পর্দায় ঢাকা অবস্থায় দারে আকীল– হযরত আকীলের গৃহের এক কোণে দাফন করা হয়। ইসলামের ইতিহাসে তিনিই হচ্ছেন প্রথম মহিলা যাকে এভাবে পর্দায় ঢেকে জানাযা ও কবর দেয়া হয়। এরপর হযরত যয়নব বিনতু জাহাশ– এর লাশও এভাবে সম্মানের সাথে দাফন করা হয়।

হযরত আলী (রা) অথবা হযরত আব্বাস (রা) এ দু'জনের মধ্যে কেউ জানাযা পড়ান। আর আব্বাস (রাঃ), আলী (রা) ও ফজল বিন আব্বাস তাঁর লাশ কবরে নামান।

হযরত আলী (রা) তো ছিলেন তৎকালীন সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্ডিত এবং একজন কবিও। ফাতিমা (রা)-র মৃত্যু তার ওপর প্রচন্ড প্রভাব ফেলেছিলো। এ জন্য তিনি প্রতিদিন তাঁর কবরে ছুটে যেতেন, যেয়ারত করতেন, মাগফেরাতের দোয়া করতেন আর নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করতেন–

কেমন দুর্ভাগ্য হায়, হয়েছে আমার,
গোর হতে নাহি আসে উত্তর তাহার।
নিত্য আসি, নিত্য বলি সালাম তোমায়,
কেন নাহি দাও তুমি উত্তর আমায়?
পূর্ব কথা হাসি তুমি গিয়াছ ভুলিয়া?
না কর উত্তর তুমি সালাম শুনিয়া!

আমরা এতক্ষণ নবী দুলালী, খোলাফায়ে রাশেদার চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রা)-র স্ত্রী, হাসান, হোসাইনের মাতা হযরত ফাতিমাতুজ জোহরার জীবন এবং মৃত্যু সম্বন্ধে আলোচনা করলাম এবং জানলাম। এবার আমরা ফাতিমা (রা)-র কবরের গায়ে যে শিলালিপি রয়েছে তাতে কি লেখা আছে তা দেখবো। তাতে লেখা আছে–

'এ নবী দুলালী হযরত ফাতিমা জোহরা (রা)-র সমাধি। তিনি বেহেশ্তের সমগ্র রমণীকুলের নেত্রী ও শ্রদ্ধাভাজন। সম্মানিতা রমণীকুলের মধ্যে তাঁরই গর্ভধারিণী উম্মেহাতুল মু'মিনীন হযরত খাদিজা বিনতু খুয়াইলিদ প্রথম দীন ইসলাম কবুল করেন। মহানবী (স) হযরত ফাতিমা (রা)-র পিতা, আলী (রা)

www.pathagar.com

তাঁর স্বামী, তরুণ দলের মধ্যে ইনিই প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী। ইনি রসূল (স)-এর প্রধানতম সাহাবাও ছিলেন। হযরত হাসান এবং হোসাইন (রা)-এর মাতা তিনি। যাঁরা শহীদগণের মধ্যে সর্বোচ্চ আসনে আসীন এবং বেহেশতী যুবকদের সর্দার। নবী দুলালী ফাতিমা (রা) স্বেচ্ছায় দুনিয়ার সব সুখকে পরিত্যাগ করেছিলেন। তিনি যাঁতা পেষা, পানি তোলা থেকে শুরু করে গৃহের সমস্ত পরিশ্রমলব্ধ কাজই নিজ হাতে করতেন। অনাহার, অর্ধাহার ছিলো তাঁর জীবনের নিত্য সঙ্গী। কিন্তু তাই বলে তিনি কখনো আল্লাহ্‌র দরবারে অভিযোগ উত্থাপন করেন নি। এই ফাতিমা (রা)-র চেয়ে আল্লাহ্‌র রসূল (সঃ)-দুনিয়ার আর কাউকে অধিক ভালবাসতেন না। ফাতিমা (রা) যেমন রসূল (স)-এর প্রিয় ছিলেন তেমনি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কাছেও প্রিয় ছিলেন। আহলে বাইয়াতের মধ্যে রসূল (স)-এর মৃত্যুর পর তিনিই সর্বপ্রথম আল্লাহ্‌র সাথে মিলিত হন। এ কবরই ফাতিমা বংশীয়গণের তাঁর সাথে মিলিত হওয়ার আশা কিয়ামত পর্যন্ত সঞ্জীবিত রাখবে। এ সমাধিই দুনিয়ার পাপ-তাপ দগ্ধ তৃষ্ণার্ত হৃদয়কে কিয়ামত পর্যন্ত সান্ত্বনা দিতে থাকবে। সর্বগুণে গুণান্বিতা খাতুনে জান্নাত যা দেখিয়েছেন, এরকম সহিষ্ণুতা ও ধৈর্যের আদর্শ আর কেউ দেখাতে পারেন নি। সংসারের কষ্ট-দুঃখ প্রশান্ত মনে এ নিষ্পাপ মহিলা বহন করে গেছেন, সেইরকম কষ্ট আর কেউ সহ্য করতে পারবে না। কিয়ামতের দিন পর্যন্ত এ সমাধির ওপর আল্লাহ্‌র রহমত অবতীর্ণ হোক।'

www.pathagar.com

হযরত আলী (রা.)

রাসূল (সা.)-এর যুগে কোন একদিন তিনজন লোক পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এদের একজনের কাছে পাঁচটি রুটি ও সেই পরিমাণ তরকারি, দ্বিতীয় জনের কাছে তিনটি রুটি ও সমপরিমাণ তরকারি ছিল কিন্তু তৃতীয় জনের কাছে কিছুই ছিল না। পথ চলতে চলতে খাবার সময় উপস্থিত হলে তিনজন একসঙ্গে বসে খেল। তৃতীয় জন খাবার পর এদের নিকট থেকে বিদায় হয়ে গেল। কিন্তু যাবার সময় আট আনা পয়সা দিয়ে গেল। কিন্তু গোল বাঁধলো ঐ পয়সা নিয়ে। প্রথম ব্যক্তি অর্থাৎ পাঁচ রুটির মালিক বললো, যেহেতু রুটি ছিল আমার পাঁচটি আর তোমার তিনটি সেহেতু পয়সা আমি পাব পাঁচ আনা আর তুমি পাবে তিন আনা। দ্বিতীয় জনের দাবী আমার রুটি তিনটি আর তোমার পাঁচটি একথা সত্য, তবে যেহেতু রুটি সবাই সমান খেয়েছি সেজন্য পয়সাও সমান সমান ভাগ হবে। অর্থাৎ তুমি চার আনা, আমি চার আনা। এভাবে অনেকক্ষণ তর্কাতর্কির পর যখন কেউ কারো দাবী ছাড়লো না- তখন তারা হযরত আলী (রা.)-এর নিকট এসে বিচার প্রার্থনা করলো। হযরত আলী সব শুনে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে প্রথম ব্যক্তির প্রস্তাবানুযায়ী তিন আনা নিয়ে খুশী হতে বললো। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি বললো, না জনাব! আমি আপনার পক্ষ থেকেই বিচার আশা করি। হযরত আলী তখন বললেন, 'আমার বিচার অনুযায়ী তুমি পাবে এক আনা আর প্রথম ব্যক্তি পাবে সাতআনা।'

হযরত আলীর কথা শুনে দ্বিতীয় ব্যক্তির চক্ষু তো ছানাবড়া। তার অবাক হবার ভাব দেখে হযরত আলী (রা.) বললেন, 'বুঝলে না! তোমাদের কথানুযায়ী তোমাদের মোট রুটি ছিল আটটি। কিন্তু তিনজন মানুষ তো আর আটটি রুটি সমান ভাগ করে খেতে পারে না। তাই প্রত্যেকটি রুটিকে যদি সমান তিনভাগে ভাগ করা হয় তাহলে আটটিতে হয় মোট চব্বিশটি টুকরা, আর প্রত্যেকের ভাগের ভাগ পড়ে আট টুকরা করে। এখানে তোমার রুটি ছিল তিনটি-তাতে হয় নয়টি টুকরা। এই নয়টির মধ্যে তুমি খেয়েছ আটটি আর থাকে মাত্র একটি।

www.pathagar.com

অপরদিকে প্রথম ব্যক্তির পাঁচটি রুটিতে হয় পনেরটি টুকরা, সে খেয়েছে আটটি টুকরা। তাহলে বাকী থাকে সাতটি টুকরা। তাই প্রথম ব্যক্তি তার সাত টুকরার জন্য পাবে সাত আনা আর তুমি তোমার এক টুকরার জন্য পাবে এক আনা।' কেমন সূক্ষ বিচার আর এ বিচার ক্ষমতার কারণেই রাসূল (সা.) হযরত আলীকে ইয়েমেনের বিচারপতি নিযুক্ত করেছিলেন।

নাম আলী! পুরো নাম আলী ইবন আবূ তালিব। ডাক নাম ছিল আবুল হাসান ও আবূ তুরাব। তাঁর উপাধি ছিল হায়দার, মুরতাজা ও আসাদুল্লাহ্। আব্বার নাম আবু তালিব আবদু মান্নাফ, মায়ের নাম ফাতিমা বিনতে আসাদ। ঘটনাক্রমে আব্বা আম্মা উভয়েই কুরাইশ বংশের হাশিমী শাখার লোক। সব থেকে আনন্দের কথা হল তিনি স্বয়ং নবী করীম (সা.)-এর আপন চাচাত ভাই।

রাসূল (সা.)-এর চাচা আবূ তালিব ছিলেন দরিদ্র মানুষ। তাছাড়া তাঁর পরিবারের লোকসংখ্যাও ছিল বেশী। হযরত আলী (রা.)-এর বয়স যখন পাঁচ বছর তখন আরব দেশে খাদ্যাভাব দেখা দেয়–তাই চাচার উপর থেকে চাপ কমানোর জন্য মহানবী আলী (রা.) কে নিজ দায়িত্বে নিয়ে নেন। এরপর আলী (রা.) আর পিতার সংসারে ফিরে যাননি। রাসূল (রা.) যখন নবুওয়াতপ্রাপ্ত হন তখন আলী (রা.)-এর বয়স দশ এগার বছর হবে। আলী একদিন অবাক হয়ে দেখলেন–ঘরের ভেতর রাসূল (সা.) ও হযরত খাদীজা (রা.) মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে আছেন অর্থাৎ সিজদা করছেন। আলী (রা.) এ কি হচ্ছে জানতে চাইলে রাসূল (সা.) বললেন, 'এক আল্লাহর ইবাদত করছি। তোমাকেও এ পথে আসার দাওয়াত দিচ্ছি।' হযরত আলী নির্দ্বিধায় দাওয়াত কবুল করলেন।

পুরুষদের মধ্যে কে প্রথম ইসলাম কবুল করেন, এ নিয়ে মতভেদ আছে! সালমান ফারসী ও ইবনে আবাস (রা.)-এর বর্ণনা মতে হযরত খাদীজা (রা.)-এর পর হযরত আলী প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, মহিলাদের মধ্যে উম্মুল মুমেনীন হযরত খাদাজাতুল কুবরা, বয়স্কদের মধ্যে প্রথম খলীফা হযরত আবুবকর, দাসদের মধ্যে যায়িদ বিন হারিসা ও কিশোরদরের মধ্যে হযরত আলী (রা.)-ই প্রথম ইসলাম কবুল করেন। নবুওয়াতের চতুর্থ বছরে আত্মীয় স্বজনের নিকট দাওয়াত পৌছানোর নির্দেশ আসলে রাসূল (সা.) সাফা পর্বতের ওপর দাঁড়িয়ে 'হে আহলে গালেব!' বলে হাঁক

www.pathagar.com

ছাড়লেন। এ ডাকে কুরাইশগণ পর্বতের পাদদেশে একত্রিত হল কিন্তু রাসূল (সা.)-এর কথা শুনে তারা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো এবং আজেবাজে কথা বলে চলে গেল। এরপর হযরত আলীর সহযোগিতায় রাসূল (সা.) নিজ বাড়িতে কিছু লোককে আপ্যায়নের জন্য দাওয়াত দিলেন। এতে আবূ লাহাব, আবূ তালিব, হযরত হামযা, হযরত আব্বাসসহ প্রায় চল্লিশ জন লোক উপস্থিত ছিলেন। খাওয়া দাওয়া শেষ হলে রাসূল (সা.) বললেন, 'হে আবদুল মুত্তালিবের সন্তানগণ! আমি তোমাদের জন্য সেই বস্তু নিয়ে এসেছি, যা তোমাদেরকে ইহ-পরকালের উত্তম নেয়ামতসমূহ দিয়ে ভূষিত করবে। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছো কি যে আমাকে এ কাজে সাহায্য করবে?'

এহেন আহবানের পরও কুরাইশ নেতৃবৃন্দ চুপ থাকলো, কেউ কোন কথা বললো না। হঠাৎ কিশোর আলী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি আপনাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কম বয়সী আর রুগ্ন। তবুও আমি আপনার সাহায্য করব।' একথা তিনি রাসূল (সা.)-এর আহবানের প্রেক্ষিতে তিনবার বললেন। তৃতীয়বার বলার পর রাসূল (সা.) বললেন, 'তুমিই আমার ভাই এবং ওয়ারিশ হবে।' সত্যি কথা হলো এরপর সর্বাবস্থায় আলী (রা.) মহানবী (সা.)-এর সাহায্যকারী ছিলেন।

যতই দিন যেতে লাগলো মুসলমানদের ওপর কাফির মুশরিকদের অত্যাচার, নির্যাতন বেড়ে চললো। এক পর্যায়ে নবী (সা.)-এর নির্দেশে কিছু লোক হাবশায় হিজরত করলেন, পরবর্তীতে মদীনায়। নবুওয়াত প্রাপ্তির তের বছরে আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল (সা.)-এর হিজরত করার হুকুম হল। এদিকে কুরাইশগণ ইসলামের অগ্রযাত্রা রুখতে না পেরে খোদ রাসূল (সা.)-কেই হত্যার ষড়যন্ত্র করলো। ঠিক হিজরতের দিন তারা রাসূল (সা.)-এর বাড়ি ঘেরাও করলো। কাফিররা যাতে সন্দেহ না করে এ জন্য নবী (সা.) হযরত আলীকে নিজের বিছানায় শুইয়ে দিলেন এবং গোপনে বাড়ি থেকে সিদ্দিকে আকবরের হাত ধরে বের হয়ে গেলেন। এদিকে রাসূল (সা.)-কে নিরাপদে বাড়ি থেকে বের হওয়ার সুযোগ দিতে পেরে শেরে খোদা নিশ্চিন্তে ঘুমালেন। তিনি জানতেন, যে কোন মুহূর্তে কাফেররা ঘরে ঢুকে তাঁকে মুহাম্মদ (সা.) মনে করে এক কোপে দু'খন্ড করে ফেলতে পারে, নির্মমভাবে তাঁকে হত্যা করতে পারে। কিন্তু যাঁর মনে রয়েছে আল্লাহর ভয় সে কি কখনো মানুষের ভয়ে-ভীত হয়? রাসূল (সা.)-এর জন্য জীবন দেয়া তো পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার।

www.pathagar.com

সকাল হতে না হতেই কাফেররা ঘরে ঢুকে দেখলো মুহম্মদ (সা.)-এর জায়গায় শুয়ে আছেন তারই ভক্ত, আপন চাচাত ভাই আলী ইবনে আবূ তালিব। নিশ্চিত শিকার হাত ছাড়া হওয়ায় কাফেরগণ ফুঁসতে ফুঁসতে বেরিয়ে গেল।

রাসূল (সা.) যখন আলীকে নিয়ে বিছানায় রেখে যান তখন তাকে বলেন, "আমি চললাম। তুমি এ সমস্ত আমানত তাদের মালিকের নিকট পৌছে দিয়ে মদীনায় চলে এসো।"

হযরত আলী নিজেই এ ব্যাপারে বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ (সা.) মদীনা রওয়ানার পূর্বে আমাকে নির্দেশ দিলেন, আমি মক্কায় থেকে যাব এবং লোকদের যেসব আমানত রয়েছে তাঁর কাছে আছে তা ফেরত দেব। এ জন্যই তো তাঁকে 'আলআমীন' বলা হতো। আমি তিনদিন মক্কায় থাকলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা.) পথ ধরে মদীনার দিকে বেরিয়ে পড়লাম। অবশেষে বনী 'আমর' ইবন আওফ যেখানে রাসূল (সা.) অবস্থান করছিলেন, আমি উপস্থিত হলাম। কুলসুম ইবন হিদামের বাড়িতে আমার আশ্রয় হল।'

রাসূল (সা.) হযরত আলীকে অত্যাধিক স্নেহ করতেন। কিন্তু এ ঘটনায় তিনি এত খুশী হয়েছিলেন যে, আলী যখন মদীনায় তাঁর কাছে পৌছালেন তখন তিনি তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, কপালে চুমো দিলেন, এমনকি নিজ হাতে আলীর পোশাকের ধূলাবলি ঝেড়ে দিলেন।

মাদানী জীবনে রাসূল (সা.) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন করেন। এক পর্যায়ে হযরত আলী রাসূল (সা.) কে বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.) আপনি আমাকে তো কারো ভাই বানিয়ে দিলেন না।' একথা শুনে রাসূল (সা.) আলীর কাঁধে একটি হাত রেখে বললেন 'হে আলী! দুনিয়া এবং আখেরাতে তুমিই আমার ভাই।' অবশ্য পরে রাসূল (সা.) হযরত আলী ও সাহুল বিন হুনাইয়ের মধ্যে ভ্রাতৃ সম্পর্ক কায়েম করে দিয়েছিলেন।

হিজরী দ্বিতীয় সনে নবী নন্দিনী খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতিমা (সা.)-এর সাথে হযরত আলী (রা.)-এর শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়। স্বয়ং নবী (সা.) এ বিয়ে পড়ান এবং নিজের অজুর পানি দুলহা ও দুলহীনের ওপর ছিটিয়ে দিয়ে দোয়া করেন। নবী (সা.)-এর দৃষ্টিতে ফাতিমার জন্য হযরত আলীই ছিলেন উপযুক্ত পাত্র। তিনি নিজেই বলেছেন, 'যদি আলী না হত, তাহলে ফাতিমার জন্য স্বামী পাওয়া যেত না।'

www.pathagar.com

শেরে খোদা হযরত আলী একমাত্র তাবুক অভিযান ছাড়া অন্য সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। বদরের যুদ্ধে যে দুটি কালো রংয়ের পতাকা মুসলমানদের ছিল-তার একটি ছিল মহানবী (সা.)-এর হাতে অপরটি হযরত আলী (রা.)-এর হাতে। বদরের যুদ্ধে মুসলমান সৈন্যদের জন্য উপযুক্ত স্থানও আলী নির্বাচন করেন। এ যুদ্ধের প্রথমেই উভয়পক্ষের তিনজন করে যোদ্ধা মুখোমুখি হয়-রাসূল (সা.)-এর ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র আলী স্বীয় প্রতিপক্ষ ওলীদকে আক্রমণ করে দ্বিখন্ডিত করে ফেলেন। এরপর সাইবাকে হযরত ওবাইদা (রা.)-এর ওপর আক্রমণ করতে দেখে আলী মুহূর্তের মধ্যে সাইবাকে আক্রমণ করে ধরাশায়ী করেন। এর ফলে পুরো যুদ্ধের মোড় পাল্টে যায় এবং মুসলমানদের জয় হয়। এমনিভাবে সকল যুদ্ধে তিনি বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় দেন। যার কারণেই রাসূল (সা.) তাঁকে হায়দার উপাধিতে ভূষিত করেন এবং 'জুলফিকার' নামক তরবারিটি উপহার দেন। রাসূল (সা.)-এর যুগের সকল যুদ্ধেই তিনি ছিলেন মুসলমানদের নিশান বর্দার বা পতাকাবাহী। বদর যুদ্ধের কথা তো আগেই বলেছি। ওহুদের যুদ্ধে যে ক'জন মুজাহিদ রাসূল (সা.)-কে রক্ষা করার জন্য জানবাজি রেখে বুহ্য রচনা করেছিলেন, হযরত আলী তাদের অন্যতম।

খন্দকের যুদ্ধে'র প্রথমে, 'আমর ইবনে আবদে উর্দ বর্ম পরে বের হল। সে হুংকার ছেড়ে বললো, 'কে আমার সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে? আলী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর নবী, আমি প্রস্তুত। 'রাসূল (সা.) বললেন, এ' হচ্ছে 'আমর' তুমি বস।' এভাবে আমর তিনবার আহবান করলো, হযরত আলীও তিনবার রাসূল (সা.)-এর কাছে অনুমতি চাইলেন। শেষবারও রাসূল (সা.) বললেন, 'সে তো আমর!' উত্তরে আলী (রা.) বললেন, 'তা হোক।' এরপর উভয়ে মুখোমুখি হল– এ সময়ে আলী একটি কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। আমর খাপ থেকে তরবারি বের করেই আলীর ঢাল এক আঘাতে ফেড়ে ফেললো। আলীও পাল্টা আঘাতে আমরকে ধরাশায়ী করে ফেললেন। এ দৃশ্য দেখে খোদ রাসূল (সা.) আনন্দে তাকবীর ধ্বনি দিয়ে উঠেন। আমরকে নির্দেশ করে আলী নিজের একটি কবিতা আবৃত্তি করতে করতে রাসূলের কাছে ফিরে আসেন।

খাইবার অভিযানের কথা তো সবারই জানা থাকার কথা। যখন হযরত আবু বকর হযরত ওমর কেল্লাগুলি দখল করতে ব্যর্থ হলেন তখন রাসূল (সা.) বললেন, 'কাল আমি এমন এক বীরের হাতে ঝান্ডা তুলে দেব যে আল্লাহ তাঁর

www.pathagar.com

রাসূলের প্রিয় পাত্র। তারই হাতে কিল্লাগুলির পতন হবে।'

'পরদিন সকালে সবাই জানলো এ দায়িত্বের ভার পড়েছে আলী হায়দারের ওপরে।'

হযরত আলী (রা.) নিকটবর্তী হলে দেওয়ালের ওপর হতে জনৈক ইহুদী জিজ্ঞেস করলো, নাম কি? হযরত আলী বললেন, 'আলী ইবনে আবূ তালিব।' অতঃপর ইহুদী বললেন, 'আমি তওরাত কিতাবে পাঠ করেছি, এই ব্যক্তি যবরদস্ত বাহাদুর এবং দুঃসাহসী বীর। জয় করা ছাড়া এই ব্যক্তি এই স্থান ছাড়বে না। সুতরাং তাকে বিনা রক্তপাতে কেল্লা ছেড়ে দিলেই ভাল হয়।" কিন্তু কে শোনে কার কথা, ইহুদীর এই সুপরামর্শ কেউ গ্রহণ করেনি। খাইবার জয় করে ফিরলে রাসূল (সা.) আলীর কপোলে চুম্বন এঁকে দিয়ে বললেন, 'তোমার এ কাজে আল্লাহ্ এবং তাঁর ফেরেশতাগণ খুশী হয়েছেন।'

পূর্বেই বলেছি তাবুক যুদ্ধে আলী (রা.) অংশগ্রহণ করতে পারেননি। এর কারণ ছিল তাবুক অভিযানকালে স্বয়ং রাসূল (সা.) তাঁকে মদীনায় স্থলাভিষিক্ত করে যান। অবশ্য আলী (রা.) যুদ্ধেই যেতে চেয়েছিলেন। এ সময় তিনি মহানবী (সা.)-এর কাছে আরজ করেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ্ আপনি যাচ্ছেন, আর আমাকে নারী ও শিশুদের কাছে ছেড়ে যাচ্ছে? উত্তরে রাসূল (সা.) বললেন, 'হারুন যেমন ছিলেন মূসার তেমনি তুমি হচ্ছো আমার প্রতিনিধি। তবে আমার পরে কোন নবী নেই।'

অষ্টম হিজরী সনে মক্কা বিজয় সংঘটিত হয়। এ সময়ে হযরত আলী মুহাজিরদের পতাকাবাহী ছিলেন। কা'বা ঘরে প্রবেশ করে রাসূল (সা.) হজরো আসওয়াদে চুমা খেলেন, এরপর মূর্তিগুলো বাইরে ফেলে দিলেন।

একটি মূর্তি অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গায় থাকায় রাসূল (সা.) হযরত আলীকে নিজ কাঁধে উঠিয়ে সেটি নামিয়ে ফেলেন।

নবম হিজরী সনে সিদ্দিকে আকবরকে আমীরুল হজ্ব নিযুক্ত করা হয়। পরে সূরা বারাআত নাযিল হলে কাফিরদের সাথে সম্পাদিত সকল চুক্তি বাতিলের জন্য নবী (সা.) আলী (রা.) কে প্রতিনিধি করে পাঠান। হযরত আলী জনসাধারণকে জানালেন, এই বছরের পর হতে কোন মুশরিক হজ্ব করতে পারবে না এবং কোন ব্যক্তিই উলঙ্গ অবস্থায় কা'বা ঘরের তওয়াফ করতে পারবে না।

www.pathagar.com

আর যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে কোন প্রকারের ওয়াদা করেছে, সে যেন তা পূর্ণ করে।

দশম হিজরীতে রাসূল (সা.) ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে আলী (রা.)কে ইয়েমেন পাঠান। আলী ইয়েমেন রওয়ানা হওয়ার সময় স্বয়ং রাসূলে খোদা তাঁর মাথায় পাগড়ি পরিয়ে দেন এবং দোয়া করেন। অল্পদিনের মধ্যেই ইয়েমেনবাসী ইসলাম কবুল করে। আলী (রা.) যখন ইয়েমেন ছিলেন তখন তাকে দেখার জন্য রাসূল (সা.) ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তিনি দোয়া করেন, আল্লাহ! আলীকে না দেখে যেন আমার মৃত্যু না হয়।' বিদায় হজ্বের দিন আলী ইয়েমেন থেকে এসে হাজির হন।

রাসূল (সা.)-এর ওফাতের পর গোসল দেওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন যিনি, তিনি হলেন আলী (রা.)।

হযরত আলী তাঁর পূর্ববর্তী তিনজন খলীফাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করেছিলেন। তিনি কখনই পদলোভী ছিলেন না। সে জন্যই হযরত ওসমানের শাহাদাতের পর তিনি খলীফার দায়ভার নিতে চাননি। পরে মদীনাবাসীদের চাপাচাপির কারণে তিনি খেলাফতের দায়িত্ব নিতে রাজী হন। তবে তিনি শর্ত দেন যে, তাঁর বাইয়াত প্রকাশ্যে হতে হবে। পরে মসজিদে নব্বীতে সর্বসম্মতিক্রমে তিনি খলিফা নির্বাচিত হন। মাত্র ১৫/১৬ জন বাদে সবাই তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন।

হযরত ওমর (রা.) মৃত্যুর পূর্বে খলীফা মনোনয়নের জন্য ছয়জন সাহাবীর নাম বলে যান হযরত আলী তাঁদের অন্যতম। তিনি এ সময় আলী সম্বন্ধে মন্তব্য করেন, 'লোকেরা যদি আলীকে খলীফা বানায়, তবে সে তাদেরকে সঠিক রাস্তায় পরিচালিত করতে পারবে।' খলীফা থাকাকালে হযরত ওমর একবার বায়তুল মোকাদ্দাস সফর করেন। এ সফরকালীন সময়ের জন্য তিনি আলী (রা.)কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে যান। অর্থাৎহযরত আলী (রা.) খলীফা হওয়ার পূর্বেই দু'দুবার এ পদে স্থলভিষিক্ত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পূর্বেই বলেছি তাবুক অভিযান কালে খোদ নবী (সা.) তাঁকে এ দায়িত্ব দেন।

একটা জিনিস আমাদের পরিষ্কারভাবে জানা দরকার যে, ইসলাম প্রচারের প্রথম থেকেই মুসলমানদের ঘরে বাইরে ছিল শত্রু। রাসূল (সা.)-এর যুগেই যেমন প্রকাশ্যে কাফেররা শত্রুতা করতো তেমনি ভেতরে ভেতরে মোনাফিকরাও

www.pathagar.com

শত্রুতা করতো। হযরত উসমান (রা.)-এর সময় এসে মোনাফিকরা খুবই সুকৌশলে কাজ শুরু করে এবং হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের ফলে তা আরো বিস্তৃতি লাভ করে। হযরত আলী (রা.) এমনি এক দুঃখজন পরিস্থিতিতে মুসলিম বিশ্বের খলীফা হন। খেলাফত প্রাপ্তির পর পরই তার ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয় হযরত উসমান হত্যার বিচার করার জন্য। কিন্তু ঘটনা এমন ছিল যে, হত্যাকারী কারা তা সঠিক করে কেউ জানতো না। উসমান (রা.)-এর স্ত্রী নাইলা ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও কাউকে চিনতে পারেননি। ফলে কাউকে সাজা দেয়া যাচ্ছিল না। চক্রান্তকারীরা এ সুযোগটিই গ্রহণ করলো, তাদের প্ররোচনায় কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবাও উসমান হত্যার বিচার দাবী করলো। এদের মধ্যে হযরত আয়েশা, হযরত তালহা ও হযরত যুবাইয়ের (রা.)-এর মত লোকও ছিলেন। তারা হযরত আয়েশার নেতৃত্বে মক্কা থেকে বসরার দিকে যাত্রা করেন, সেখানে উসমান হত্যার বিচার দাবীকারীদের সংখ্যা ছিল বেশী। এহেন সংবাদে হযরত আলী (রা.) সেনাদলসহ সেখানে পৌছান এবং দু'বাহিনী মুখোমুখি অবস্থান নেয়। যেহেতু উভয় পক্ষ সততার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তাই আলাপ-আলোচনা পরিস্থিতির পক্ষে ছিল না-তাই তারা অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে রাতের আঁধারে আক্রমণ চালায়, আর প্রচার করতে থাকে যে অপর পক্ষ সন্ধির সুযোগ নিয়ে অন্যায়ভাবে আক্রমণ করেছে। এতে যুদ্ধ ভয়াবহ রূপ নেয়। উভয় পক্ষে প্রচুর শহীদ হন। শেষমেষ আয়েশা (রা.)কে হযরত আলী বুঝাতে সক্ষম হন। তিনি মদিনায় ফিরে আসেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলেও সত্য যে, এই ভয়াবহ যুদ্ধে হযরত (রা.)তালহা ও যুবাইর (রা.) শহীদ হন। এ যুদ্ধ হিজরী ৩৬ সনের জমাদিউসসানী মাসে সংঘটিত হয়। মুসলমানদের মধ্যে এটাই প্রথম আত্মঘাতী যুদ্ধ। এটাকে জংগে জামাল বা উটের যুদ্ধ বলা হয়।

হযরত আলী (রা.)-এর শাসনামলে আরেকটি ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয় সিরিয়ার শাসন কর্তা হযরত মোয়াবিয়ার (রা.) সাথে। এ যুদ্ধকে সিফ্‌ফিনের যুদ্ধ বলা হয়। আলী (রা.) মিমাংসার জন্য অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। হযরত মোয়াবিয়ার (রা.) মূল কথা ছিল, হযরত উসমানের (রা.) হত্যার বিচার না হওয়া পর্যন্ত তিনি আলীকে খলীফা হিসেবে মানবেন না। আসলে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল নিজে খলীফা হওয়া-তাই তিনি উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবেই হযরত উসমানের রক্তমাখা জামা ও উসমানের স্ত্রী নাইলার কর্তৃত আঙ্গুল হযরত আলীর (রা.)

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে জনসাধারণকে উত্তেজিত করার মানসে সিরিয়ায় প্রদর্শন করলেন। তাঁর লোকেরা এও বলে বেড়াতে লাগলো যে, 'হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাতে হযরত আলী (রা.)-এর সক্রিয় অংশ রয়েছে। সুতরাং হযরত উসমানের (রা.) হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য হযরত আমীর মো'য়াবিয়া (রা.)-কে সাহায্য করা এবং তাঁর ডাকে সাড়া দেয়া প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয।' ফলে হিজরী ৩৭ সনের সফর মাসে হযরত আলী (রা.) ও হযরত মোয়াবিয়ার (রা.) সৈন্যগণ সিফফীন নামক স্থানে পরস্পর মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। মুনাফিকগণ এটাই চাচ্ছিল-তারা অতি উৎসাহের সাথে উভয় পক্ষকে নানা রকমভাবে যুদ্ধে উৎসাহিত করে। কারণ উভয় পক্ষে ছিল ঘাপটি মেরে থাকা প্রচুর মুনাফিক। এই যুদ্ধে বিশিষ্ট সাহাবী আম্মার বিন ইয়াসীর (রা.), খুযাইমা ইবন সাবিত (রা.), আবু আম্মার আল মাযিনী (রা.) প্রমুখ সাহাবীসহ হাজার হাজার মুসলমান শহীদ হন। প্রকাশ থাকে যে, আম্মার বিন ইয়াসির সম্বন্ধে রাসূল (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, 'আফসোস একটি বিদ্রোহী দল আম্মারকে হত্যা করবে।'

যুদ্ধে অবশ্য হযরত আলীর জিত হতে যাচ্ছিল কিন্তু মোয়াবিয়া (রা.) নিশ্চিত পরাজয় বুঝতে পেরে সন্ধির প্রস্তাব দিলেন। তাঁর সৈন্যরা বর্শার মাথায় কুরআন ঝুলিয়ে বলতে লাগলেন 'এই কুরআন আমাদের দ্বন্দ্বের ফয়সালা করবে।' অতএব, যুদ্ধ বিরতি ঘোষিত হল। আসলে হযরত আলী (রা.) তো সব সময় চাচ্ছিলেন শান্তি কিন্তু যুদ্ধবাজ মুনাফিকরা তো তাঁকে ঘরে থাকতে দেয়নি। আবূ মুসা আশয়ারী হযরত আলীর পক্ষে এবং আমর ইবনুল আস হযরত মোয়াবিয়ার পক্ষে সালিশ নিযুক্ত হলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমর ইবনুল আসের ধূর্তামীর জন্য সালিশী বোর্ড শান্তি স্থাপনে ব্যর্থ হয়। মুসলমানরা 'দুমাতুল জান্দাল' থেকে ফিরে আসেন। তখন থেকে মুসলিম খিলাফত দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়।

সিফ্ফীনের যুদ্ধের পর হযরত আলীর দল থেকে বার হাজার লোক বের হয়ে হারুরায় চলে যায়। এরা 'খারেজী' নামে পরিচিত। অত্যন্ত চরমপন্থী এ দলটিকে বোঝানোর জন্য হযরত আলীর পক্ষ থেকে যথেষ্ট চেষ্টা চালানো হয় কিন্তু সবই পন্ডশ্রম হয়।

তারা প্রচার করতে থাকে দ্বীনের ব্যাপারে কাউকে হাকাম বা সালিশ মানা কুফরী কাজ। সেই অনুযায়ী হযরত আলী (রা.) আবূ মূসা আশয়ারীকে সালিশ মেনে কুরআনের খেলাপ করেছেন। অতএব হযরত আলী আনুগত্য দাবী করার

www.pathagar.com

বৈধতা হারিয়ে ফেলেছেন। এদের সাথেও হযরত আলীর নাহরাওয়ান নামক স্থানে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বলা যায় এ যুদ্ধে খারেজীদের শক্তি প্রায় খতম হয়ে যায়।

নাহরাওয়ানের যুদ্ধের পর খারেজী সম্প্রদায়ের আবদুর রহমান ইবনে মুলজিম, আল বারাফ ইবন আবদুল্লাহ্ ও আমর ইবন বকর আত তামীমী নামক তিন ব্যক্তি গোপন বৈঠক করে। এ বৈঠকে তারা সিদ্ধান্ত নিল যে, আলী, মোয়াবিয়া ও আমর ইবনুল আস (রা.) এই তিন জনের কারণেই মুসলমানদের এত অশান্তি। তাই এদেরকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে হবে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক হযরত আলীকে ইবন মুলজিম, মোয়াবিয়াকে আল বারাফ এবং আমর ইবনুল আসকে আমর হত্যার দায়িত্ব নিল। তারা প্রতিজ্ঞা করলো মারবে না হয় মরবে। কাজটির জন্য সময় বেছে নেয়া হল ৪০ হিজরী সনের ১৭ রমযান ফজরের ওয়াক্ত। এরপর যে যার গন্তব্যে চলে গেল।

অভ্যাস মত হযরত আলী (রা.) নামাজ পড়ার জন্য মানুষজনকে ডাকতে ডাকতে মসজিদের দিকে যাচ্ছিলেন। এ সময়ে ওৎপেতে থাকা পাপিষ্ঠ ইবনে মুলজিম তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তিনি আহত হন। আহতাবস্থায় ঐ দিনই তিনি শাহাদাত বরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর।

একই দিনে হযরত মোয়াবিয়াও একই সময়ে আহত হন কিন্তু তিনি ভাগ্যক্রমে বেঁচে যান। আর আমর ইবনুল আস ঐ দিন অসুস্থ ছিলেন তাই মসজিদে যাওয়া হয়নি। কিন্তু তাঁর পরিবর্তে ইমামতির জন্য মসজিদে যাচ্ছিলেন পুলিশ প্রধান খারেজা ইবনে হুজাযা, তাঁকেই আমর ইবনুল আস মনে করে হত্যা করা হয়।

হযরত আলী (রা.) মোট চার বছর নয় মাস খিলাফতের দায়িত্বে ছিলেন। নানা জটিলতার মধ্যেও তিনি জনগণের কল্যাণের জন্য কাজ করেছেন। তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ পন্ডিত ব্যক্তি। তিনি ছিলেন ঐ সময়ের একজন উচ্চ শিক্ষিত মানুষ। বিচারের ক্ষেত্রে আলীর তুলনা আলী নিজেই। হযরত ওমর (রা.) বলেছেন, 'আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ফয়সালাকারী আলী।' তাঁর সঠিক সিদ্ধান্তের জন্য হযরত ওমর প্রায়ই বলতেন, 'আলী না থাকলে ওমর হালাক হয়ে যেত।'

www.pathagar.com

আলী (রা.) নিজেকে সব সময় অন্য দশজন সাধারণ মানুষের মতই মনে করতেন। তিনি নিজে দরিদ্র ছিলেন কিন্তু কোন অভাবী মানুষ তাঁর দরজা থেকে ফিরতো না। এ জন্য তাঁকে প্রায়ই সপরিবারে উপোষ থাকতে হতো। তিনি অত্যন্ত সাদা-সিধে মানুষ ছিলেন-সর্বদা মোটা কাপড়ের পোশাক পরতেন, তাও আবার তালি দেয়া। তিনি অনেক সময় মাটিতেই শুয়ে কাটাতেন। একবার রাসূল (সা.) তাকে মাটিতে শোয়া অবস্থায় দেখে ঠাট্টা করে বললেন, 'ইয়া আবা তুরাব'। এখান থেকে তিনি 'আবূ তুরাব' নামে পরিচিত হন। হযরত আলী ছিলেন কুরআনে হাফিজ। রাসূল (সা.)-এর তত্ত্বধানেই তাঁর শিক্ষা জীবন কাটে। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ মুফাস্‌সির ছিলেন। তিনি খুব বড় পন্ডিত ছিলেন। রাসূল (সা.) নিজেই বলেছেন, 'আমি জ্ঞানের নগরী আর আলী সেই নগরীর প্রবেশদ্বার।' তিনি বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন। পূর্ববর্তী খলীফাদের যুগে যারা ফতোয়া দিতেন তিনি তাদের মধ্যে ছিলেন অন্যতম।

হযরত আলী (রা.) ছিলেন একজন বড় কবি ও সুবক্তা। তাঁর একটি 'দীওয়ান' পাওয়া গেছে। যাতে অনেকগুলো কবিতার মোট ১৪০০ শ্লোক বর্তমান আছে। নাহজুল বালাগ নামে তাঁর বক্তৃতার একটি সংকলন আছে। হযরত আলী তাঁর নিজের সম্বন্ধে বলেছেন, 'আমি যা বলছি, তা কুরআনের কাছে জিজ্ঞেস কর। আমি ঠিক বলছি কিনা।

আল্লাহর কসম! এমন কোন আয়াত নেই যা আমি জানি না। তা রাতে নাযিল হয়েছে বা দিনে যুদ্ধের ময়দানে নাযিল হয়েছে বা পর্বতের গুহায়। অর্থাৎ যেখানেই নাযিল হয়ে থাকুক না কেন সমস্তই আমার জানা আছে।' তাঁর ব্যাপারে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'খোদার কসম! রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পর সমস্ত এলেমকে দশ ভাগ করে আলীকে একাই নয় ভাগ দেয়া হয়েছে। আর মাত্র এক দশমাংশ অবশিষ্ট সমস্তের মধ্যে বন্টন করা হয়েছে।'

আলী (রা.)-এর জীবন অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। ইমাম আহমদ (র.) বলেন, আলীর (রা.) মর্যাদা ও ফযীলত সম্পর্কে রাসূল (সা.) থেকে যত কথা বর্ণিত হয়েছে, অন্য কোন সাহাবী সম্পর্কে তা হয়নি।'

হযরত মোয়াবিয়া (রা.) হযরত আলীর পুরাতন বন্ধু যেরার ইবন যামরার

www.pathagar.com

কাছে আলী (রা.) চরিত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, 'অত্যন্ত দূরদর্শী, দুঃসাহসী, শক্তিশালী, ন্যায়বিচারক, প্রতিটি কথা এলেম ও হেকমতে পরিপূর্ণ, দুনিয়া ও দুনিয়ার নেয়ামতের প্রতি আন্তরিক ঘৃণা পোষণকারী, রাত্রি জাগরণে আনন্দিত, পরকালের চিন্তায় মগ্ন, ঋতু এবং যুগ পরিবর্তনে আশ্চর্যান্বিত, সাদা-সিধা পোশাক পরিধানকারী, সাধারণ আহার্যে অভ্যস্ত, মানবতার দিশারী। দানবীর গরীবদের প্রতি আন্তরিক এবং স্নেহবান, ন্যায়ের সমর্থন ও অন্যায়ের ঘোর বিরোধিতা ছিল হযরত আলী (রা.)-এর চরিত বৈশিষ্ট্য।' অতপর মোয়াবিয়া বলেন, 'আল্লাহর কসম, আবুল হাসান এমনই ছিলেন।

আসলে হযরত আলী ছিলেন মুসলমানদের জন্য অহংকার। এ জন্যই রাসূল (সা.) বলেছেন, 'একমাত্র মুমিনরা ছাড়া তোমাকে কেউ ভালবাসবে না এবং একমাত্র মুনাফিকরা ছাড়া কেউ তোমাকে হিংসা করবে না।'

www.pathagar.com

ইমাম হাসান (রা.) ঃ

তৃতীয় হিজরী সনের ১৫ রমজান মোতাবেক ১ এপ্রিল ৬২৫ খ্রীষ্টাব্দে হযরত হাসান জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর উপ নামছিল আবূ মুহাম্মদ। তাঁর পিতা হলেন শেরে খোদা হযরত আলী (রা.), মাতা হলেন খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতিমা (রা.), নানা হলেন মহানবী (সা.)। তিনি আলী ও ফাতিমার (রা.) জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন।

তাঁর বংশ লতিকা হল-আবূ মুহম্মদ, হাসান ইবনে আলী ইবনে আবি তালিব ইবনে আবদুল মুত্তালিব। চেহারা সুরতের দিক দিয়ে তিনি অনেকটা রাসূলের (সা.) মতই ছিলেন। এ প্রসংগে হযরত আনাস (রা.) বলেন, 'হযরত হাসান ব্যতীত রাসূল (সা.)-এর সাথে আকৃতিতে এতো অধিক সাদৃশ্য আর কারো ছিল না।' তার নাম এবং উপনাম রাসূল (সা.) রেখেছিলেন।

হযরত আবুবকর আছ-ছাকাফী (রা.) বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে শুনেছি, তিনি তখন মিম্বরের ওপরে ছিলেন এবং হযরত হাসান (রা.) ছিলেন তাঁর পাশে বসা, একবার তিনি লোকজনের দিকে তাকাচ্ছিলেন আর একবার হাসান (রা.)-এর দিকে, এমতাবস্থায় তিনি বলেন, আমার এই পুত্র সৈয়দ এবং আমার আশা যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর মাধ্যমে মুসলমানদের (বিবদমান) দুটি দলের মধ্যে সন্ধি ও সমঝোতা স্থাপন করবেন।'

একদিন শিশু হাসানকে (রা.) রাসূল (সা.) কাধে নিয়ে হাটছিলেন। এ দৃশ্য দেখে হযরত ওমর (রা.) বললেন, 'হাসান! তুমি উত্তম সোয়ারী পেয়েছ।' উত্তরে রাসূল (সা.) বললেন, 'সোয়ারও- যে উৎকৃষ্টতম।'

হযরত আবুবকর (রাঃ) এবং হযরত ওমর (রাঃ), হাসান (রা.) ও হুসাইন (রা.) কে অত্যন্ত মর্যাদার চোখে দেখতেন। হযরত ওমর (রা.) তো বায়তুল মাল থেকে বদরী সাহাবীদের সমপরিমাণ ভাতা (পাঁচ হাজার দিরহাম) উভয়কেই প্রদান করতেন। জানা যায় এই তালিকার প্রথম নামটি ছিল হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর। দ্বিতীয় নামছিল হযরত আলী (রা.)-এর এবং তৃতীয় নাম ছিল

www.pathagar.com

হযরত হাসান (রা.)-এর অথচ বদর যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার সময় তাঁর জন্মই হয়নি।

বিদ্রোহীরা যখন হযরত উসমান (রা.)-এর বাড়ি ঘিরে ফেলে তখন হাসান (রা.) ও হোসাইন (রা.) পিতার নির্দেশ মত সে বাড়িতে পাহারায় ছিলেন। এমনকি এ সময় হযরত হাসান (রা.) আহত হন এবং তাঁর শরীর রক্তাক্ত হয়েছিল। মূল দরজায় তাঁরা পাহারারত থাকার কারণে বিদ্রোহীরা প্রাচীর ডিঙিয়ে ঘরে প্রবেশ করে এবং উসমান (রা.) কে শহীদ করে।

হযরত উসমান (রা.) শহীদ হলে হযরত আলী (রা.) কে খিলাফতের দায়িত্ব নেয়ার জন্য অনেকেই যখন চাপ দিচ্ছিলেন তখন হাসান (রা.) তাঁর পিতাকে পরামর্শ দেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলিম রাজ্য সমূহের সাধারণ জনগণের পক্ষ হতে খলীফার পদ গ্রহণের আবেদন না করা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি তা কবুল করবেন না।'

খোলাফায়ে রাশেদার চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রা.) গুপ্তঘাতক ইবনে মুলজিম কর্তৃক আহত হওয়ার পর শাহাদাত বরণ করলে হযরত হাসান (রা.) উপস্থিত জনতাকে লক্ষ্য করে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। তিনি বলেন, 'হে লোক সকল! তোমাদের মধ্য হতে আজ সেই মহাপুরুষ বিদায় গ্রহণ করেছেন, যাঁর দৃষ্টান্ত পূর্বেও পরিলক্ষিত হয়নি, পরেও হবে না। বিখ্যাত নবী হযরত মূসা (আ.)ও এই রাতেই এজগৎ থেকে চির বিদায় গ্রহণ করেছেন, আর হযরত ঈসা (আ.)ও এই রাতেই আসমানে গমন করেছেন। আমার পিতা হযরত আলী (রা.) বিশ্ববাসীকে আল্লাহর দীনের দিকে আহবান জানাতেন, আমিও তোমাদেরকে সে দিকেই আহবান জানাচ্ছি।'

এরপর ৪০ হাজারের বেশী লোক তাঁর হাতে বায়াত হন এবং কূফাসাবিগণ কর্তৃক মুসলিম জাহানের খলীফা নির্বাচিত হন। পরে মক্কা ও মদীনার জনগণও তাঁর হাতে বায়াত হন। খলীফা হওয়ার পর চার মাস পর আমর মোয়াবিয়া ৬০ হাজার সৈন্য নিয়ে কুফার উদ্দেশ্যে রওনা হন। এ সংবাদ শোনার সাথে সাথে ৪০ হাজার সৈন্য নিয়ে হযরত হাসান (রা.)ও বের হয়ে পড়েন। মাসকান নামক স্থানে দুই দল মুখোমুখি অবস্থান নেয়।

কিন্তু শান্তিকামী হযরত হাসান (রা.)-এর মনে ভাবান্তর দেখা দেয়। তিনি এ যুদ্ধের পরিণাম মুসলমানদের ভয়াবহ ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই নয় ভেবে সন্ধির

www.pathagar.com

প্রস্তাব দেন। উভয় পক্ষ নিম্নোক্ত শর্তে সন্ধি করতে রাজি হন। শর্তসমূহ–

১। কেবল হিংসা ও বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে কোন ইরাকীকে পাকড়াও করা যাবে না।

২। কোনরূপ পূর্বশর্ত ছাড়াই সকলকে নিরাপত্তা প্রদান করা হবে।

৩। আহ্ওয়ায প্রদেশের যাবতীয় রাজস্ব হযরত হাসান (রা.)-এর জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে।

৪। হযরত হোসাইন (রা.) কে বার্ষিক দুই'লক্ষ দিরহাম পৃথকভাবে প্রদান করা হবে।

৫। উপহার-উপঢোকন বিতরণের ক্ষেত্রে বানূ হাশিমকে বানূ উমায়্যার ওপর অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

অবশ্য আরও একটি শর্তের কথা কোথাও কোথাও উল্লেখ পাওয়া যায় যে, মোয়াবিয়া (রা.)-এর ইন্তেকালের পর হযরত হাসান (রা.) অথবা তাঁর ভ্রাতা হযরত হোসাইন (রা.) মুসলিম জাহানের খলীফা হবেন।

এরপর জনসাধারণের ভেতরে যাতে কোন ভুল বুঝাবুঝির কোন অবকাশ না থাকে সেজন্য হযরত মোয়াবিয়া (রা.)-এর আবেদন অনুযায়ী হাসান (রা.) তাৎক্ষণিকভাবে ঘোষণা দেন, 'হে লোক সকল! আল্লাহ্ পাক আমাদের পূর্ববর্তীদের মাধ্যমে তোমাদিগকে হেদায়েত দান করেছেন এবং পরবর্তী লোকদের মাধ্যমে তোমাদের রক্তপাত বন্ধ করেছেন। হ্যাঁ, সর্বোত্তম বুদ্ধিমত্তা হলো তাকওয়া। আর অসহায়ত্ব ও দুর্বলতাসমূহের মধ্যে সর্বাধিক নিকৃষ্ট দুর্বলতা ও অসহায়ত্ব হলো বদ আমল বা মন্দ কর্ম। খিলাফত নিয়ে আমার এবং মোয়াবিয়া (রা.)-এর মধ্যে যে মতভেদ ছিলো, তা ছিলো এই বিষয়ে যে, খিলাফতের তিনি আমার তুলনায় বেশী হকদার অথবা এতে আমার হক বেশী ছিলো তা আমি আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি, উম্মতে মুহাম্মাদির কল্যাণ এবং তোমাদের মধ্যে রক্তপাত বন্ধ করবার খাতিরে পরিত্যাগ করেছি (উসদু'লগাবা)।

এছাড়া কুফার জামে মসজিদে তিনি আরও একটি বক্তৃতা দেন। সেখানে বলেন, 'তোমরা আমার হাতে এই বিষয়ে বায়আত করেছিলে যে, আমি যার সাথে সন্ধি করবো তোমরাও তাঁর সাথে সন্ধি করবে, আর আমি যার সাথে যুদ্ধ করবো তোমরাও তার সাথে যুদ্ধ করবে। এক্ষণে আমি মোয়াবিয়া (রা.)-এর

www.pathagar.com

(হাতে) বায়আত করেছি, অতএব তোমরা তাঁর অনুসরণ ও আনুগত্য কর।' (আল ইসাবা, প্র. ৩৩০)।

বিষয়টি নিয়ে তিনি বানূহাশিমের নেতৃবৃন্দের সাথেও প্রয়োজনীয় আলাপ করেছিলেন। তৎকালীন সময়ে তাদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জাফর (রা.) ইবনে আবূ তালিব সবচেয়ে বেশী প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁকে হাসান (রা.) বলেন, 'আমি মদীনায় চলে যাব এবং সেখানেই অবস্থান করবো বলে ঠিক করেছি। আর খিলাফত মোয়াবিয়া (রা.)-এর হাতে সোপর্দ করবো এজন্য যে, বিশৃংখলা ও নৈরাজ্য অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং রক্তপাতের ফলে সমঝোতার রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে।' উত্তরে আবদুল্লাহ্ (রা.) বলেন, 'উম্মতে মুহাম্মাদির পক্ষ হতে আল্লাহ্ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন।'

এরপর হাসান (রা.) তাঁর মত হোসাইন (রা.)-র কাছে পেশ করলে তিনি বলেন, 'আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি অর্থাৎ এমনটি করা ঠিক হবে না।' কিন্তু হাসান (রা.) শেষ পর্যন্ত তাঁকেও নিজের মতে আনেন।

সহীহ্ মতানুযায়ী হাসান (রা.) ২০ রমাজন ৪০ হিজরী সন থেকে ১৫ জমাদুল উলা ৪১ হিজরী সন পর্যন্ত মোট সাত মাস ছাব্বিশ দিন খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন।

খিলাফতের দায়িত্ব পরিত্যাগের পর তিনি মদীনা মনোয়ারায় চলে যান এবং সেখানে বাকী জীবন অতিবাহিত করেন। তাঁর সম্বন্ধে জনৈক ব্যক্তির কাছে হযরত মোয়াবিয়া (রা.) জানতে চাইলে লোকটি উত্তরে বলেন, 'ফজরের নামাযের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত তিনি জায়নামাযের ওপর থাকেন, অতপর হেলান দিয়ে বসেন এবং আগমন ও নির্গমনকারী লোকদের সাথে মিলিত হন। সূর্য কিছুটা উপরে উঠলে চাশতের নামায আদায় করে উম্মেহাতুল মু'মিনীনের খেদমতে সালামের জন্য হাযির হন '(ইবন আসাকির)। মক্কায় থাকাকালে অভ্যাস ছিল পবিত্র হারাম শরীফে আসরের নামায আদায়ের পর তাওয়াফ করা। দান খয়রাতের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন খুবই উদার হস্ত। তিনবার তিনি তাঁর যাবতীয় সম্পদের অর্ধাংশ আল্লাহর পথে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। এমনকি দুই জোড়া জুতা থাকলে এক জোড়া রেখে অপর জোড়া বিলিয়ে দিয়েছেন (উসদুল গাবা)। দুইবার সমস্ত বিত্ত সামগ্রী বিলি-বন্টন করে দেন (ঐ)। অপরের প্রয়োজন পূরণ ছিল তার নিকট ইবাদত। একবার তিনি ইতিকাফরত ছিলেন। সে সময় একজন প্রার্থী এসে উপস্থিত হয়।

www.pathagar.com

তিনি ইতেকাফের গন্ডী হতে বের হয়ে তার প্রয়োজন পূরণ করেন এবং পুনরায় এতেফাকে রত হন (ইবন আসাকির)। একবার তাওয়াফরত ছিলেন। কোন একজন তার প্রয়োজন পূরণের জন্য তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চাইলে তিনি তাওয়াফ ছেড়ে তার সঙ্গী হন এবং ফিরে এসে তাওয়াব পূরণ করেন। হযরত হাসান (রা.) নানা রাসূলুল্লাহ্ (স.) এবং পিতা হযরত আলী (রা.) থেকে মোট ১৩টি হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে পুত্র হাসান (রা.), হযরত আবূ হুরায়রা (রা.), আবূ জুয়ামা রবীআ (রা.), আবূ ওয়ায়েল (রা.) ও তাবেয়ী মুহাম্মদ বিন সিরীন (র.) হাদীস বর্ণনা করেন।

তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর বক্তা ছিলেন। তিনি বেশ কিছু কবিতা রচনা করেছিলেন বলেও জানা যায়। তার তিনজন স্ত্রীর নাম জানা যায় আবূ মাসউদ আনসারী (রা.)- এর কন্যা উম্মুবাশীর, খাওলা ও জা'দা (জায়েদা) বিনতে আল-আস। এ ছাড়া আরো দু'জন স্ত্রীর কথা শোনা গেলেও তাদের নাম জানা যায়নি। তবে এতটুকু জানা যায় যে, এদের একজন ফিযার গোত্রের এবং অন্যজন আসাদ গোত্রের মহিলা ছিলেন। আল হাসান যায়দ, আল কাসিম, আবুবকর, আবদুর রাহমান, তালহা ও উবায়দুল্লাহ্ নামে তাঁর পুত্রদের নাম জানা যায়। হিজরী ৫০ সনে হযরত হাসান (রা.) ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে মতভেদ আছে। তবে অনেকেই মনে করেন যে, তাঁর সুন্দরী স্ত্রী জা'দা ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে বিষ প্রয়োগে তাঁকে হত্যা করেন। প্রকৃত ঘটনা আল্লাহই ভাল জানেন। তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে সমাহিত করা হয়।

www.pathagar.com

ইমাম হোসাইন (রা.)

হোসাইন (রা.) হিজরী ৪ সনের ৫ই শাবান জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের সংবাদ শুনে রাসূল (সা.) ছুটে আসেন এবং তাঁর কানে আজান দেন। হযরত আলী (রা.) ছেলের নাম রেখেছিলেন 'হরব'। কিন্তু রাসূল (সা.) সে নাম পাল্টে নাম রাখেন 'হোসাইন'। তাঁর উপাধি ছিল রাশীদ, তাইয়্যেব, সাইয়েদ, মুবারক ইত্যাদি। তাঁর গঠন প্রকৃতি সম্বন্ধে হযরত আলী (রা.) বলেছেন, 'হাসান (রা.)-এর বক্ষস্থল হতে মাথা পর্যন্ত আকৃতি ও গঠন প্রকৃতি অন্যান্যদের তুলনায় রাসূলের (সা.) অধিক সদৃশ্য ছিল। আর ইমাম হোসাইনের (রা.) দেহের নিম্ন অংশের গঠন প্রকৃতি নবীর (স.) মত ছিল।' হোসানই (রা.) সম্বন্ধে রাসূল (সা.) বলেছেন, 'যে হোসাইনকে ভালবাসে সে যেন আমাকে ভালবাসে। যে হোসাইনের সাথে শত্রুতা করে সে যেন আল্লাহ্‌র সাথে শত্রুতা করে।'

তিনি আরও বলেছেন, 'হোসাইনের উৎপত্তি আমা হতে। যে হোসাইনকে বন্ধু ভাবে– আল্লাহ্ তাকে গ্রহণ করেন বন্ধু হিসাবে।'

হযরত হোসাইন (রা.) মোট ১৮টি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

মরুময় কারবালা প্রান্তরে যে হৃদয় বিদারক ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল তা মুসলমান তথা সারা দুনিয়ার মানুষ চিরদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী আন্দোলনের মহান নেতা সাইয়েদুল মুরসালীন, রহমাতুল্লিল আলামীন, খাতেমীন নাবীঈন, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কলিজার টুকরা শেরে খোদা হযরত আলীর প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতেমার (রা.) নয়নের পুণ্ডলি হযরত হোসাইন (রা.) কারবালায় রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে জ্বলন্ত স্বাক্ষর রেখে গেছেন তা ইতিহাসে চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

হিজরী ৪ সনের শাবান মাসে ইসলামের সিংহ্ সাবক হযরত হোসাইন (রা.) দুনিয়ার বুকে আগমন করেন এবং ৬৮০ ঈসায়ীর ১১-ই অক্টোবর তথা

www.pathagar.com

হিজরী ৬১ সনের ১০-ই মুহরম পবিত্র আশুরার দিন, কারবালা প্রান্তরে পাপাত্মা শীমারের হাতে নির্মমভাবে শহীদ হন।

ঐতিহাসিকগণের মতে ইমাম হাসানের সহিত মোয়াবিয়ার সম্পাদিত চুক্তির শর্তানুসারে তিনি ছিলেন খিলাফতের ন্যায় সংগত দাবীদার। ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি পিতা হযরত আলীর (রা.) মতই সৎ, ন্যায়-নিষ্ঠ, ধর্মপ্রাণ ও উদার স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। এর পরেও কথা হচ্ছে, মক্কা ও মদীনার অধিবাসীরা তাকেই সমর্থন দান করেন। ফলে হযরত আলী (রা.) ও মোয়াবিয়ার (রা.) ভেতর খিলাফত নিয়ে যে দ্বন্দ্ব চলে আসছিল সে দ্বন্দ্ব তাদের সন্তানদের সময় আরও ভয়াবহ রূপ নেয়। ঐতিহাসিক হিট্টি বলেন– "জীবিত আলী অপেক্ষা মৃত আলী অধিকতর কার্যকরী হল।" আর এই জন্যই দু'দলের ভেতর সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ে।

"ইসলামের ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। হযরত মুহাম্মদ (সা.) মৃত্যুর পর তাঁহার চারিজন প্রধান শিষ্য আবুবকর (রা.) তাহার মৃত্যুর পর হযরত ওমর (রা.) তাঁর মৃত্যুর পর হযরত উসমান (রা.) এবং তাঁহার মৃত্যুর পর হযরত আলী (রা.) খলীফা পদ অলংকৃত করেন।" (একের ভিতর পাঁচ, মহররম)

মহানবীর (সা.) মৃত্যুর পর উপরিউক্ত চারিজন খলীফা সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পন্থায় জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হন। কিন্তু হযরত আলী (রা.) জনগণের দ্বারা নির্বাচিত খলিফা হওয়া সত্ত্বেও সিরিয়ার শাসনকর্তা মোয়াবিয়া তাঁকে মুসলিম বিশ্বের খলীফা রূপে মেনে নিতে অস্বীকার করেন। উচ্চাকাঙ্খা মোয়াবিয়া মুসলিম বিশ্বের খলীফা হওয়ার আশায় হযরত ওসমানের (রা.) রক্তামাখা কাপড়-চোপড় জনগণের সামনে প্রদর্শন করে বক্তৃতার মাধ্যমে মানুষকে পরোক্ষাভাবে বুঝাতে চেষ্টা করেন যে, হযরত আলী (রা.)-ই আসলে হযরত উসমানের মৃত্যুর জন্য দায়ী। এমনকি হযরত আলী ও মোয়াবিয়ার মধ্যে যুদ্ধ ও সন্ধির প্রস্তাব দিলেন ও দূর্নীতির আশ্রয় নিলেন। সন্ধির শর্তমুতাবেক হযরত আলীর মৃত্যুর পর মু'য়াবিয়া মুসলিম বিশ্বের খলীফা হবেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হলেও সত্য যে, ইবনে মুলজিম নামক জনৈক খারিজী গুপ্ত ঘাতকের হাতে কুফার মসজিদে নামাজরত অবস্থায় হযরত আলী (রা.) নিহত হন।

www.pathagar.com

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানগণ হযরত হাসানকে নিজেদের খলীফা হিসেবে ঘোষণা দিলেন। হযরত হাসান খিলাফতের দায়িত্ব পাওয়ার পর পরই মোয়াবিয়া কর্তৃক বাঁধা প্রাপ্ত হলেন। অর্থাৎ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লেন। শান্তিপ্রিয় হাসান (রা.) রক্তের হোলি খেলায় মাততে চাইলেন না, তাই সন্ধি স্থাপন করলেন। সন্ধির শর্ত হলো মোয়াবিয়া (রা.)-র মৃত্যুর পর হযরত আলীর কনিষ্টপুত্র হযরত হোসাইন (রা.) মুসলিম বিশ্বের খলীফা হবেন।

কিন্তু মোয়াবিয়া (রা.) হযরত হাসানের সাথে করা সন্ধির কথা গেলেন ভুলে। নিজের মনের ভেতর লালন করা এতদিনকার ইচ্ছা রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, সেটা স্বীয় পাপাসক্ত, অত্যাচারী, ইন্দ্রীয় পরায়ণ, নীতি জ্ঞানহীন, মদ্যপায়ী ও হৃদয়হীন পুত্র ইয়াজিদকে ৬৭৯ ঈসায়ী সালে উত্তারাধিকারী নিযুক্ত করে পূরণ করেন।

খিলাফতের অযোগ্য ইয়াজিদ উত্তরাধিকার সূত্রে মুসলিম বিশ্বের খলীফা হয়ে বসলে, হযরত আবুবকর (রা.), ওমর (রা.)-র পুত্র এঁরা তার বায়াত গ্রহণ করলেও সত্যের সেনানী মর্দে মুজাহিদ হযরত হোসাইন (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জোবাইর (রা.) এবং আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) মুখ সাহাবাগণ ইয়াজিদের হাতে বায়াত গ্রহণ করতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। তাঁরা খিলাফতের সঠিক দাবীদার হযরত হোসাইন (রা.)-কেই তাঁদের যোগ্য খলীফা হিসেবে মনে করলেন। এমনকি তারা মদীনা ছেড়ে পবিত্র মাক্কায় গেলেন।

'পথিমধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে মতেয়'র সাথে ইমাম হোসাইন (রা.)-এর সাক্ষাত হয়। তিনি হযরত হোসাইনের (রা.) খেদমতে আরজ করলেন-হুজুর আপনি মক্কা শরীফেই অবস্থান করবেন। কখনও কুফার দিকে যাবেন না। কেননা কুফা একটি অমঙ্গল জনক এলাকা। সেখানে আপনার পিতাকে হত্যা করা হয়েছিল এবং আপনার ভাই হাসানকে (রা.) অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।' (মাহে মুহররম- পৃঃ ১৩)।

মক্কা বাসীরা পরম সমাদরে হোসাইনকে (রা.) গ্রহণ করলো। এদিকে ইয়াজিদের শাসনে অতীষ্ট হয়ে কুফাবাসীগণ ইমাম হোসাইন (রা.)-এর নিকট বার বার চিঠি এবং দূত পাঠিয়ে তাঁকে কুফার খিলাফত গ্রহণের আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু কুফাবাসীদের গাদ্দারীর কথা স্মরণ করে আত্মীয়-স্বজন ইমাম হোসাইনকে সেখানে যেতে নিষেধ করলেন।

www.pathagar.com

ইমাম হোসাইন (রা.) অনেক কিছু চিন্তা করে চাচাত ভাই মোসলেম ইবনে আকীলকে কুফায় পাঠালেন কুফাবাসীর মনোভাব ভালরূপে জানার জন্যে।

মোসলেম ইবনে আকীল কুফায় পৌঁছে জনমত যাচাই করে হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ)-কে জানালেন যে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ অনুকূলে এখন আপনি নির্দিধায় সেখানে যেতে পারেন। হোসাইন (রা.) এমন সংবাদ শুনে আত্মীয়-স্বজনের নিষেধ সত্বেও কুফা অভিমুখে ৭২ জন সঙ্গীসহ রওনা হলেন।

পথিমধ্যে আরবের বিখ্যাত কবি ফারজদক-এর সঙ্গে দেখা হয়। তিনি সফরের উদ্দেশ্য জানতে পেরে আরজ করলেন, "হুজুর কুফাবাসীর অন্তর আপনার সঙ্গে কিন্তু তরবারী বনি উমাইয়ার স্বপক্ষে, এখন ফয়সালা আল্লাহর হাতে।"

একথা শুনে হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) বললেন, "যদি ফয়সালা আমাদের স্বপক্ষে হয়, তাহলে আল্লাহর শোকর। আর যদি মৃত্যু আমার এরাদার মাঝে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় তাতেও কোন আপত্তি নেই। কেননা আমাদের নিয়ত ও উদ্দেশ্য সৎ।" (মাহে মহররম- পৃঃ-১৭)।

মোকামে জিয়াদ পর্যন্ত পৌঁছে তিনি মুসলিম ইবনে আকীলের হত্যা ও কুফাবাসীদের ইয়াজিদের পক্ষে যোগদান করার সংবাদ পেলেন। এ সংবাদে সত্যের সাধক বিচলিত না হয়ে সামনে অগ্রসর হলেন এবং রাজধানীর নিকটবর্তী হয়ে তামীম গোত্র কর্তৃক বাঁধাপ্রাপ্ত হয়ে ফোরাত নদীর তীরে কারবালায় তাবু ফেল্‌লেন। এর পূর্বে ওকবার নামক স্থানে পৌঁছলে তিনি হোর ইবনে জিয়াদ কর্তৃক বাঁধা প্রাপ্ত হন।

এখানে যোহরের নামাজ পড়ার জন্য আযান দিলে হোর ইবনে যিয়াদ এর সেনা বাহিনী নামাজে অংশ গ্রহণ করেন। নামাজে দাঁড়িয়ে ইমাম হোসাইন (রা.) সবার উদ্দেশ্যে এক মর্মস্পর্শী ভাষণ দেন। প্রথমে তিনি আল্লাহ্ পাকের শানে হামদ ও ছানা পেশ করে বললেন, "হে লোক সকল, আমি আল্লাহ্ ও তোমাদের কাছে এই বলে ওজর পেশ করছি যে, আমি তোমাদের কাছে স্বেচ্ছায় আসিনি, বরং তোমাদের অসংখ্য পত্র এবং প্রতিনিধির মাধ্যমে তোমরা আমাকে অনুরোধ জানিয়ে ছিলে যে, আমাদের কোন ইমাম নেই, আপনি মেহেরবানি পূর্বক তাশরীফ আনেন, হয়তো আপনার মাধ্যমে আল্লাহ্ আমাদিগকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন, তাই আমি তোমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছি। এখন যদি

www.pathagar.com

তোমরা আমার সাথে পাক্কা ওয়াদা বা অঙ্গিকার করে আমাকে অভয়-দাও তা-হলে আমি কুফায় যাব।

আর যদি তোমরা এভাবে করতে রাজি না হও এবং আমার আসা তোমাদের কাছে ভাল না লাগে তবে আমি যেখান থেকে এসেছি সেখানেই চলে যাব।

এই ভাষণ শুনে সকলেই খামুশ রইল। হযরত ইমাম (রা.) একামতের আদেশ দিলেন এবং হোরকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি আমার সাথে নামাজ পড়বে না পৃথকভাবে?" সে সম্মতি জানালো, আপনার পিছনে নামাজ আদায় করবো। 'সেদিনের হোরের একতেদা তার জন্য শুভ লক্ষণ ছিল। নামাজ অন্তে হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) চলে গেলেন নিজ তাবুতে এবং হোর তার শিবিরে। (শহীদে কারবালা–মুফতী শফী, আছাহুছ ছিয়ার)।

এরপরও যখন হোর পথ রোধ করলো তখন তিনি সোজা আজিব ও কাদেছিয়া হতে বাম দিকে চলতে আরম্ভ করলেন এবং অনুসরণকারী এজিদের সৈন্যদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করলেন–

"হে লোক সকল, রাসূলে পাক (সা.) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোন এমন বাদশাকে দেখে, যে আল্লাহর নির্ধারিত হারামকে হালাল মনে করে এবং আল্লাহ্ পাকের ওয়াদাকে ভঙ্গ করে আর রাসূলে পাকের পায়রবি অনুকরণ না করে আল্লাহর বান্দাদের সাথে গুনাহ্, জুলুম, অত্যাচার, ব্যভিচার করে সেই ব্যক্তি এই বাদশাহের সমস্ত জঘন্য কার্যকলাপ দেখা সত্যেও কথা ও কাজের মাধ্যমে কোন রকম বিরোধিতা না করে তা'হলে আল্লাহ্তালা তাকেও সেই জালেম শাহীর সাথে গণ্য করবেন। আর তোমরা একথা ভালভাবে জেনে রাখ ইয়াজিদ ও তার আমীর ওমরাহ্গণ আল্লাহ্ পাকের তাবেদারী ও আনুগত্য ছেড়ে শয়তানের পায়রবী করছে। তারা আল্লাহর জমিনে ফেৎনা ফাসাদ বিস্তার করছে। শরীয়তের সীমা লঙঘন করে গণিমতের মালকে নিজস্ব সম্পত্তি মনে করছে। হালালকে হারাম আর হারামকে হালাল মনে করছে। তাই আমি ন্যায় সংগতভাবে তাদের থেকে সর্বাপেক্ষা খেলাফতের যোগ্য ব্যক্তি। তোমাদের প্রতিনিধিগণ আমার সমীপে উপস্থিত হয়েছে। তোমরা আমার হাতে বায়াত গ্রহণ করবে এই অঙ্গীকার ও আশ্বাসে তোমরা আমাকে ডেকে এনেছো, তাই তোমরা আমাকে হেয় করনা। তোমরা যদি নিজেদের স্বীকৃত বায়াতের উপর কায়েম থাক, তাহলে সঠিক পথ

www.pathagar.com

পাবে। আমি শেরে খোদা হযরত আলী (রা.) এবং রাসূলে পাকের (স.) কলিজার টুকরা হযরত ফাতেমার (রা.) অতি আদরের ছেলে হোসাইন (রা.)। আমার জীবন তোমাদের জীবনের সঙ্গে, আমার পরিবার পরিজন তোমাদের পরিবার পরিজনের সাথে জড়িত। তোমাদের কর্তব্য আমার সাথে সদ্ব্যবহার করা। তোমরা যদি তা না করে আমার সাথে ওয়াদা ভঙ্গ কর তা'হলে তাতে আমার আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কেননা তোমরা আমার পিতা হযরত আলী (রা.) আমার সহোদর ভাই হযরত হাসান (রা.), আমার চাচাতো ভাই মোসলেম ইবনে আকিলের সাথে ওয়াদা ভঙ্গ করে বিশ্বাস ঘাতকতা করেছো। শুধু দুঃখের বিষয় যে, তোমরা আমাকে ধোকা দিয়ে নিজের হক এবং দ্বীনদারী ও আখেরাতের ভাগ বিনষ্ট করছো। তাই যে ব্যক্তি ওয়াদা ভঙ্গ করবে সে প্রকৃতপক্ষে নিজের সঙ্গেই করবে। আল্লাহতালা আমাকে অচিরেই তোমাদের থেকে মুক্ত করবেন।(তারিখে ইবনে খালদুন)

এরপর ইমাম হোসাইন (রা.) সমস্ত বাধাকে উপেক্ষা করে সামনের দিকে এগুতে থাকেন তখন তাঁর মুখে ছিল কবিতার কিছু পংক্তিমালা। শোনা যায় তাঁর পিতাও মাঝে মাঝে এসব কবিতা আবৃত্তি করতেন, কবিতার পংক্তিগুলি।

"পার্থিব বস্তুনিচয় নয়নাভিরাম ও চিত্তাকর্ষক যদিও
পরকালের প্রতিদান এর চেয়ে শ্রেয়তর নিঃসন্দেহে
তোমার যা কিছু আছে, আছে যতো সম্পদ বৈভব
সবই যদি থেকে যায় পশ্চাতে,
তাহলে এতে ব্যয় কুণ্ঠ হয়ে লাভ কি বলো?
দেহের নিয়তি যদি হয় ক্ষয় আর মৃত্যুতে বিলীন,
আল্লাহর রাহে খন্ড বিখন্ডিত হোক তোমার দেহ
তা কি নহে প্রিয়তর? [শহীদ-অধ্যাপক মুর্তাজা মোতাহারী]

যখন তিনি তামীম গোত্রের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হন তখন কারবালায় তাবু ফেললে প্রথম ওমর ইবনে সাদ বাঁধা দেন এবং পরে ওবায়দুল্লাহ্ তাবু অবরুদ্ধ করেন। রক্তপাত বন্ধের জন্য হোসাইন (রা.) তিনটি প্রস্তাব করেন–

(১) ইমাম হোসাইনকে (রা.) নিরাপদে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করতে দেয়া

www.pathagar.com

হোক। অথবা,

(২) তুর্কী সীমান্তের দূর্গে অবস্থান করতে দেয়া হোক। অথবা

(৩) ইয়াজিদের সাথে সরাসরি আলোচনার জন্য তাকে দামেস্কে প্রেরণ করা হোক।

উইলিয়াম মুর বলেন–'এই অনুরোধ রক্ষা করা হলে ওদের জন্য মঙ্গল হতো কিন্তু ওবায়দুল্লাহ এই শান্তি প্রস্তাব প্রত্যাখান করলো। এবং বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করলে ইমাম হোসাইনকে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় কুফায় প্রেরণ করার জন্য সেনাপতি সীমারকে আদেশ দিলো। তাই যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়লো।" (ইসলামের ইতিহাস–গোলাম রাসূল পৃঃ ২৪৯)।

হযরত হোসাইন (রা.) যখন দেখলেন কোন কিছুতেই কিছু হবে না, তখন তিনি ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়েই অবৈধ্য রাজতান্ত্রিক সরকার ইয়াজিদ বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে লড়তে প্রয়োজনে জীবন দিতে মনস্ত করলেন। মহররমের ৯ তারিখে তিনি তাঁর পরিবারবর্গ ও সঙ্গী সাথীকে মদিনায় ফিরে যাবার জন্য নির্দেশ দেন। কিন্তু এ প্রস্তাব কেহই মেনে নিলো না উপরন্ত তার সঙ্গী সাথীরা একে একে তাকে বললেন "হযরত আপনি কি আমাদের অনুমতি দিচ্ছেন আপনাকে একলা ফেলে চলে যেতে? তা কখনো হতে পারে না। আপনাকে ছাড়া আমাদের জীবনের কোনই মূল্য নেই।"

একজন বললেন, "আমার সাধ জাগে, আহা আমি যদি নিহত হতাম আমার দেহ যদি পুড়িয়ে ফেলা হতো এবং দেহের ছাইগুলো এদিক সেদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়া হতো। আহা যদি ৭০ বার আমার সাথে এমন ব্যবহার করা হতো। শুধু একবার নিহত হওয়া এটা তেমন কোন গুরুত্ব পূর্ন বিষয়ই নয়।"

আরেকজন বললেন, 'আমার সাধ হয়, আহা! আমি যদি ক্রমাগত একহাজার বার নিহত হতাম। আহা! আমার যদি এক হাজারটি কান থাকত তাহলে তা সবই আপনার জন্যে কুরবানী করে দিতাম।"

(শহীদ–অধ্যাপক মুর্তজা মোতাহারী পৃঃ ৪৫)

১০-ই মুহাররম এগিয়ে এলো কারবালার মর্মান্তিক ঘটনাকে বুকে ধরে রাখার জন্য। সেদিন ভোরে পাখি ডেকেছিল কিনা জানিনা। সত্যের সৈনিক ক্ষুদ্র একটি দল জালিম শাহীর বিষদাঁত ভেঙ্গে দেয়ার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়লেন হাজার

www.pathagar.com

হাজার সুশিক্ষিত সৈন্যের বিরুদ্ধে। আরও ৩০ জন মর্দে মুজাহিদ যোগদান করলো এ দলে। এর মধ্যে অন্যতম ছিল, 'হোর বিন ইয়াজিদ।' তুমুল যুদ্ধ শুরু হলো। হোসাইনকে (রা.) ভ্রাতুষ্পুত্র কাসিম সর্বপ্রথম দুশমনদের হাতে শাহাদত বরণ করলেন। একে একে পরিবারের সবাই শাহাদতের অমিয় ধারা পান করলেন। শিশু পুত্র আসগরকে পানি পান করাতে যাচ্ছিলেন হোসাইন (রা.) কিন্তু সেও শত্রুর তীরের আঘাতে শাহাদাত বরণ করলেন। নিজে পানি পান করতে গিয়ে তীর বিদ্ধ হলেন, অতিরিক্ত রক্ত ক্ষরণের কারণে অবসন্ন দেহ শীতল মাটিতে এলিয়ে দিলেন। সাহস করে এই সিংহ শাবকের নিকট কেও আসতে চাইলো না। তা'ছাড়া মুহাম্মদ (সা.)-এর দৌহিত্রকে নিজের হাতে হত্যা করে জগতে অভিশপ্ত হয়ে থাকতে কেউ রাজি ছিলো না। তাই কেউ আর এগুলো না। কিন্তু পাষন্ড সীমার এই অবস্থা দেখে হুঙ্কার দিয়ে শায়িত ইমাম হোসাইন (রা.)-এর উপর আক্রমণ করলো এবং নানা অত্যাচারের মাধ্যমে তাঁর মস্তক ছেদন করলো। কারবালার আকাশ বাতাস রোনাজারি করে উঠলো। ঐতিহাসিক গীবন বলেন "সেই সুদূর যুগেও আবহাওয়ায় হোসাইনের মৃত্যুর বিয়োগন্ত দৃশ্য কঠিনতম পাঠকের অন্তরে সমবেদনার সঞ্চার করবে।"

হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) শাহাদাতের পর তাঁর শরীর মোবারকে নেজার তেত্রিশটি, তরবারীর ত্রিশটি এবং তীরের পয়তাল্লিশিটি ক্ষত চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। (মাহে মুহররম পৃঃ ৪২)।

এরপরও পাপাত্মা সীমার বাহিনী হোসাইন (রা.) পবিত্র দেহের ওপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে তাঁর শরীরকে টুকরো টুকরো করে ফেলে।

এই ঘটনা এত হৃদয়বিদারক ছিল যে, স্বয়ং ইয়াজিদও সহ্য করতে পারিনি। ইয়াজিদের দরবারে হোসাইন (রা.) মস্তক মোবারক পেশ করা হলে সে বলে উঠে, 'খোদার লানত ইবনে মারয়ানা (ইবনে যিয়াদ) এর ওপর। আমি যদি তার স্থানে হতাম তাহলে ইমাম হোসাইনকে মাফ করে দিতাম।'

(তারিখে ইসলাম, মুফতী-আমিনুল এহছান)

সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য কারবালার প্রান্তরে হযরত হোসাইন (রা.) যে আত্মত্যাগের নজীর রেখে গেছেন তা মানব ইতিহাসে চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এখানে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, হযরত ইমাম হোসাইন

www.pathagar.com

(রা.) স্বার্থান্ধ চক্রান্তের শিকার হয়েছিলেন একথা বললে সম্পূর্ণ ঘটনা প্রকাশ হয় না। এটি নিঃসন্দেহে সেই বিয়োগান্তক ঘটনার নায়কেরা তাদের স্বার্থপরতার কারণেই মারাত্মক অপরাধ করেছিলো কিন্তু ইমাম (রা.) তো সচেতন ভাবেই সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে জীবনোৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধবাদীরা চেয়েছিল তিনি যেন আনুগত্য স্বীকার করেন। কিন্তু তিনি এর পরিণতি ভাল করেই জানতেন। সে জন্যে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এ সংকট সন্ধিক্ষণে নীরবতা অবলম্বন করাকে তিনি মস্ত বড় পাপ বলে মনে করেছিলেন। তাঁর শাহাদাতের কাহিনী, বিশেষত তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতা তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

(শহীদ – মুর্তাজা মোতাহারী পৃঃ –১৮)

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা এই শিক্ষাই গ্রহণ করতে পারি যে,–

(১) কোরআন সূন্নাহ মোতাবেক চলা অর্থাৎ কোরআন সূন্নাহর আইন জারী করা।

(২) ইসলামের হক ও ইনসাফকে প্রকৃত অর্থে কায়েম করা।

(৩) ইসলামের খিলাফত গণতন্ত্রের ওপর প্রতিষ্ঠা করা।

(৪) সকল প্রকার অন্যায় অশ্লীলতার বিরুদ্ধে আমরণ জেহাদ করা।

(৫) ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য কোন প্রকার ভয় ভীতি অর্থাৎ শত্রুর শক্তি সামর্থ দেখে মনের মধ্যে স্থান না দেয়া। এবং মর্দে মুজাহিদের মত সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করা।

(৬) সত্যকে বুলন্দ করার জন্য প্রয়োজনে ধনদৌলত আওলাদ ও বুকের তাজা খুন উৎসর্গ করা।

(৭) সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহকে ইয়াদ রাখা।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, আমরা এ সমস্ত শিক্ষার কিছুই গ্রহণ করছি না। উপরন্ত কতগুলো বেদাত বা কু প্রথাকে পালন করে চলেছি। যেমন– মাতমজারী করা, তাজিয়া বের করা, মহররম মাসের প্রথম থেকে গান বাজনা ও ঢোল বাজানো। মহররমের নামে চাঁদা আদায় করা, সর্বোপরি আশুরার দিনে আমাদের মন গড়া কল্পিত কারবালায় গমন করে তাজিয়া বিসর্জ্জন ও উদ্ভট মিছিল করা। এ যেন শারদীয় দূর্গাপূজার একটি আনন্দঘন উৎসব।

www.pathagar.com

উপসংহারে আমাদের আশাবাদ হচ্ছে, আমরা যদি ইমাম হোসাইনের (রা.) আদর্শকে গ্রহণ করতে পারি যে কারণে তিনি কারবালা প্রান্তরে সঙ্গী সাথীসহ জীবন দিয়েছিলেন সেই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি অর্থাৎ গণতন্ত্রের ভিত্তিতে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা তথা রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারি, প্রয়োজনে হযরত হোসাইনের (রা.) মত অন্যায়ের প্রতিবাদের জন্য প্রকাশ্যে রাজপথে বুকের তাজা খুন ঢেলে দিতে পারি, তবেই আশা করা যায়, সেদিন আর বেশী দূরে নয় যেদিন ইসলামের সুমহান আদর্শ এদেশের মানুষকে সত্যিকার মানুষ করে তুলবে, আনন্দে কানায় কানায় ভরে উঠবে তাদের মন মানসিকতা জীবন ও কাজ কর্ম, প্রতিষ্ঠিত হবে, সত্যিকার আল ইসলাম।

www.pathagar.com

ইমাম যয়নুল আবেদীন (রঃ)

নাম তাঁর আলী। পুরো নাম আলী আসগর ইবনে হোসাইন। তাঁর পিতা হলেন জান্নাতী যুবকদের সর্দার শেরে খোদা হযরত আলী ও খাতুনে জান্নাত মা ফাতিমার পুত্র হযরত হোসাইন (রা.)। মাতার নাম শহরবানু। তিনি ছিলেন পারস্যের সর্বশেষ রাজা ইয়াজদজরদের কনিষ্ঠা কন্যা। তাঁর কুনিয়াত ছিল আবুল হোসাইন, আর উপাধি ছিল যয়নুল আবেদীন। কোরআন হাদীস ও ইসলামী বিষয়ে তাঁর পান্ডিত্য, আমল-আখলাক এবং ইলমে মারফাতের বিশেষত্বের কারণে লোকেরা তাঁকে উক্ত উপাধিতে ভূষিত করেন।

তাঁর বংশলতিকা হল, আলী আসগর (রঃ) ইবনে হোসাইন (রা.) ইবনে আলী (রা.) ইবনে আবী তালিব ইবনে আবদুল মুত্তালিব।

খেলাফতে রাশেদার চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রাঃ)-র শাসন আমলে ৩৬ হিজরী সনে ইমাম যয়নুল আবেদীন জন্মগ্রহণ করেন। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে তাঁর জন্মের সময়ই তাঁর মাতা শহরবানু ইন্তেকাল করেন। তিনি ছিলেন হোসাইন (রা.)-র পঞ্চম পুত্র।

মাতা শহরবানুর মৃত্যুর কারণে হোসাইন (রা.)-র এক নিঃসন্তান স্ত্রীর ওপর তাঁর লালন পালনের ভার পড়ে। যয়নুল আবেদীন (র.)-এর এই সৎমা আপন স্নেহ মমতা দিয়ে তাঁকে বড় করে তোলেন। এ ব্যাপারে ইমাম নিজেই বলেছেন, 'আমি আমার লালন-পালন কারিনী এই মাতার নিকট থেকে এমন অফুরন্ত স্নেহ ও আদর লাভ করেছিলাম যে, কিছুটা বয়স হওয়ার পর যেদিন প্রথম শুনতে পেলাম যে, ইনি আমার গর্ভধারীনি জননী নন। সত্যিই তখন আমার একথাটি বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়েছিল।'

সম্পূর্ণ দীনি পরিবেশে বেড়ে উঠেছিলেন যয়নুল আবেদীন (র.)। অতি অল্প বয়সেই তিনি কোরআনের হাফেজ হয়েছিলেন। শিশুকাল থেকেই তিনি মসজিদে নববীতে যাতায়াত শুরু করেন। অন্যান্য শিক্ষার্থীর সাথে তাঁর শিক্ষাও এগিয়ে চলে। এ সময়ে মসজিদে নববীতে মুসলিম জাহানের শ্রেষ্ঠ কোরআন ব্যাখ্যাকার

www.pathagar.com

আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) ছিলেন কোরআন ও তাফসীর শিক্ষা দাতা, জগতের অন্যতম মনীষী সাহাবী আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.) শিক্ষা প্রদান করতেন ফিকাহ্ শাস্ত্র এবং প্রখ্যাত সাহাবী আবূ হোরায়রা (রাঃ)-র মত ব্যক্তিগণ ছিলেন ইলমে হাদীসের শিক্ষাদাতা। আর তিনি এ সমস্ত জগদ্বিখ্যাত শিক্ষকদের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেকে উপযুক্ত করে গড়ে তুলেছিলেন। তিনি কোরআন, হাসীস, ফিকাহ্, তাফসীর ইত্যাদি বিষয়ে অভূতপূর্ব ক্ষমতা অর্জন করেন। শুধু শরীয়তেই যে তিনি পান্ডিত্য অর্জন করেন তা নয়, তিনি ইলমে মারেফাত সম্বন্ধেও প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হন।

কারবালায় যে, হৃদয় বিদায়ক ঘটনা সংঘটিত হয়, তা তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন। পরিবারের সদস্য হিসাবে ইমাম যয়নুল আবেদীনও পিতার সহযোগী ছিলেন। কিন্তু তিনি পীড়িত থাকার কারণে যুদ্ধে অংশ নিতে পারেন নি। অন্য তিন ভাই, আবুবকর, আবদুল্লাহ্ ও আলী আকবর পিতা হোসাইন (র.)-র সাথে যুদ্ধ করতে করতে সাহাদাত বরণ করেন। উমর ছিল সবার ছোট, কারবালা থেকে ফেরার পরে তিনি শিশু বয়সেই ইন্তেকাল করেন।

কারবালার ঘটনার পর পরিবার পরিজনদের সাথে তিনিও মদীনায় ফিরে আসেন এবং এখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পর পরিবারে কিছুটা স্থিতিশীল অবস্থা ফিরে আসলে হযরত জয়নব বিনতে আলী (রা.) ফাতিমা বিনতে হাসান (রা.)-এর সাথে যয়নুল আবেদীন (রঃ) ইবনে হোসাইন (রাঃ)-র বিয়ে দিয়ে দেন। ক্রমে বয়স বাড়ার সাথে সাথে নবী বংশের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে তিনি মুসলিম বিশ্বের মানুষের ভক্তি শ্রদ্ধার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন। ফলে বিভিন্ন সময়ে মুসলমানগণ তাঁকে খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য চাপ সৃষ্টি করেন, কিন্তু তিনি তাতে কোন সময়েই রাজি হননি। কারণ তিনি ভ্রাতৃঘাতি সংঘর্ষের ভয় পাচ্ছিলেন। কার্যতও তাই ঘটে।

তিনি যখন খেলাফতের দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেন তখন মদীনা বাসীরা কায়েস ইবনে আব্বাস (রা.)-র নেতৃত্বে সমবেত হয়ে মদীনায় ইয়াজীদের নিযুক্ত কর্মকর্তাগণকে সেখান থেকে বের করে দেয় এবং আবদুল্লাহ্ ইবনে জোবায়ের (রা.)-এর প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করে। এ সংবাদ শোনার সাথে সাথে আবদুল্লাহ্ ইবনে জোবায়ের (রা.) কে উৎখাত করার জন্য মাসরাফ বিন উকবার নেতৃত্বে বার হাজার দুর্ধর্ষ আজমী সৈন্য প্রেরণ করে।

www.pathagar.com

বাবে তাইয়্যেবার নিকটবর্তী হাররা নামক স্থানে মদীনাবাসী তাদেরকে বাধা প্রধান করলো। ফলে যুদ্ধ শুরু হলো। একাধারে তিনদিন প্রচণ্ড যুদ্ধ চললো, মদীনাবাসী অভূতপূর্ব বীরত্ব দেখিয়েও শেষ পর্যন্ত পরাজিত হলো। উভয় পক্ষে প্রচুর নিহত হলো। মাসরাফ বাহিনী মদীনা বাসীদের ওপর নিষ্ঠুর নির্যাতন চালালো, এমনকি, ইমাম যয়নুল আবেদীনকে বন্দী করে মাসরাফের সামনে হাজির করলো।

অবশ্য মাসরাফ ইমাম কে সসম্মানে মুক্তি দেন। যাহোক ইমাম যয়নুল আবেদীন একপ্রকার ফকীরী জীবন যাপন করেন। তিনি ইবাদত গোজার একজন মানুষ ছিলেন। ঐতিহাসিক আবূ নায়ীম উতাবীর সূত্রে হিলিয়া গ্রন্থে লিখেছেন, 'হযরত যয়নুল আবেদীন ওযু করে ফারেগ হলে অধিক প্রকম্পিত হতেন এবং শরীর মুবারক থেকে ঘাম টপকাতে শুরু হতো।' কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, 'আমি কার সাথে কথোপথন করেছি তা কি তোমরা অনুভব করতে পার না?'

মুহাদ্দেস তাউস বলেন, 'আমি মসজিদে হারামে মীযাবে রহমতের নীচে এক লোককে নামাযান্তে মুনাজাতে কান্নাকাটি করতে দেখলাম। মুনাজাত শেষ হতে দেখে আমি তার নিকটে এসে দেখি তিনি হচ্ছেন হযরত যয়নুল আবেদীন (র.)। আমি আরজ করলাম, হে নবী কন্যার মহামানব! আমার বিশ্বাস আপনি তিনটি কারণে সম্পূর্ণ নিরাপদের অধিকারী। আপনি নবী কন্যার সন্তানের সন্তান। আপনার দাদাজান আপনার জন্য শাফায়াত করবেন এবং আপনার প্রতি রয়েছে আল্লাহ্‌র অশেষ রহমত। এমতাবস্থায় এতো ভয়ভীতির কি কারণ? জবাবে তিনি বললেন, হে তাউস! আমি রাসূলের সন্তান বটে কিন্তু নিরাপদ নই, কারণ আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন–

'সেদিন পরস্পরের আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না এবং একে অপরের খোঁজ খবরও নিবে না।'

আর তুমি দাদার সুপারিশের কথা বলছ? এ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন– 'তারা সুপারিশ করে না তবে যাদের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট।'

আর তুমি আল্লাহ্ পাকের রহমতের কথা বলছ, এ ব্যাপারে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন–

www.pathagar.com

'আল্লাহর রহমত নেককারদের অতি নিকটে।' আমি নিজেকে মুহসিনদের অন্তর্ভুক্ত মনে করি না।

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব বলেন, 'এবাদত রিয়াজত, তাকওয়া উদারতা এবং মধুর চরিত্র শিষ্টাচারিতার কারণে হযরত যয়নুল আবেদীন ইসলামের প্রশান্তি এবং সৌন্দর্য ও নিদর্শন হিসাবে সুখ্যাতি অর্জন করেন। অতি সুগন্ধময় আতর ব্যবহার করে উত্তম পোশাক পরিধান করে নামাযে দাঁড়াতেন। সফর হজ্জের কোন অবস্থাতেই তিনি রাতের নামায তরক করতেন না। অধিক পরিমাণে মুনাজাতে, জিকির আজকার এবং আল্লাহ্ পাকের ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন। কাকুতি মিনতি এবং একাগ্রতার সাথে সিজদাবস্থায় দীর্ঘ মুনাজাতে ব্যাকুল হয়ে কান্না কাটি করতেন।'

তাঁর সম্বন্ধে ইবনে শিহাব যুহরী (রঃ) বলেন, 'কোরাইশ বংশে আলী ইবনে হোসাইন-এর মত উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন লোক সমকালীন যুগে আমার দৃষ্টি গোচর হয়নি।'

তিনি যদিও খেলাফতের দায় দায়িত্ব নিতে চান নি, যুদ্ধ বিগ্রহ এড়িয়ে চলেছেন তবুও নিঃসন্দেহে বলা যায় তিনি ভীরু বা কাপুরুষ ছিলেন না। তাঁর শৈশবে কারবালার বিয়োগান্তক ঘটনার পর স্বপরিবারে ইয়াজিদের দরবারে নীত হলে ইয়াজিদ যয়নুল আবেদীনের বশ্যতা আদায়ের জন্য এক কৌশল অবলম্বন করে। ইয়াজিদ অসুস্থ যয়নুল আবেদীনকে প্রস্তাব দেন যে, 'তোমরাই সমবয়সী আমার পুত্রের সাথে একবার মল্ল লড়াই করে শক্তির বাহাদুরী প্রমাণ কর। যদি তুমি জয়লাভে সমর্থ হও, মনে করব তোমাদের দাম্ভিকতার সত্যতা রয়েছে। আর যদি পরাজিত হও তাহলে পরাজিত ব্যক্তির বিজয়ী প্রতিদ্বন্দ্বীর পিতার সম্মুখে মস্তক অবনত করে তার আনুগত্য স্বীকার করতে আশা করি অবশ্যই বাধ্য থাকবে।'

ইয়াজিদ পুত্র ছিল স্বাস্থ্যবান ও বলশালী সেজন্য তিনি এ প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু অসুস্থ যয়নুল আবেদীন সিংহশাবকের মত ফুসে উঠে যে জবাব দিলেন তাতে স্বয়ং ইয়াজিদ ভড়কে গেলেন। কিশোর ইমাম উত্তর দিলেন, 'শুধু দৈহিক শক্তির পরীক্ষা কেন, অস্ত্র চালাবার পরীক্ষাও হয়ে যাক। একখানা তরবারী তোমার পুত্রের হাতে দাও আর একখানা আমাকে দাও। সত্যের অনুসারী নির্ভীক

www.pathagar.com

ন্যায়বাদীর সাথে মিথ্যা ও অন্যায় আশ্রয়ী ভীরু কাপুরুষদের তাহলে চূড়ান্ত শক্তির পরীক্ষা হয়ে যাক।'

কেঁপে উঠলেন ইয়াজিদ, কথা ঘুরিয়ে বললেন, "হোসাইন তনয়! বুঝেছি তুমি সত্যিই বীরপুরুষের বীর সন্তান বটে। তাই বীরের ধর্ম রক্ষা করতে পরাঙ্মুখ নও। কিন্তু এ সময় এ পরিস্থিতিতে তোমার দ্বারা মল্ল যুদ্ধ করানো আমার ইচ্ছে নয়। তোমাকে শুধু পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যেই আমি ঐ কথা বলেছিলাম।"

এ সময়ে ইয়াজিদ যয়নুল আবেদীনের কোন বাসনা আছে কিনা জানতে চান, কথোপকথনের এক পর্যায়ে তিনি বলেন, 'আগামী কাল শুক্রবার। জুমআর নামাযে আমি খুৎবা পাঠের অনুমতি চাচ্ছি।'

ইয়াজিদ বললেন 'আচ্ছা! তোমার এ বাসনা আমি পূর্ণ করব।'

পরদিন মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে যয়নুল আবেদীন (র.) অত্যন্ত বিশুদ্ধ ভাষায় তেজোদৃপ্ত অনন্য ভঙ্গীতে খুৎবাহ্ পাঠ শুরু করলেন। সর্ব প্রথম আল্লাহ্ তায়ালার গুণ ও প্রশংসা কীর্তন করত হযরত রাসূল (সা.)-এর নাত ও সেফাত বয়ান শেষ করে নিজের মাতৃকূলের সম্যক পরিচয় প্রদান করে তাঁর বর্তমান করুন অবস্থার কথা বর্ণনা করলেন। কারবালার মর্মান্তিক ঘটনার কথাও উল্লেখ করতে বাকি রাখলেন না। মসজিদে সমবেত মুসল্লিদের মধ্যে এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের সৃষ্টি হলো। মসজিদ জুড়ে উচ্চ কণ্ঠে ক্রন্দনের রোল উঠল। যারা কারবালার প্রান্তরে এমন ঘটনা ঘটিয়েছে তাদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষিত হতে লাগল। ইয়াজিদ মনে মনে ধারণা পোষণ করছিলেন যে, যয়নুল আবেদীন শেষ পর্যায়ে তার বিষয়ও খুৎবায় উল্লেখ করবেন। অর্থাৎ প্রকারান্তরে হলেও তাকে খলীফা বলে স্বীকার করে নিবেন। কিন্তু যখন দেখল তা না করে যয়নুল আবেদীন কেবল খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রথম তিন খলীফা তারপর চতুর্থ খলীফা তাঁর পিতামহ অতপর পিতা পিতৃব্যের বিষয় যথা বক্তব্য শেষ করে উপস্থিত অন্যায় শাসনের জুলুম অনাচার প্রভৃতির প্রতিকূলে বক্তব্য পেশ করছেন, পিতা মোয়াবিয়ার (রা.) বিষয় পর্যন্ত কিছু উল্লেখ করলেন না এবং তাঁকে নিজেকে খলিফা বা শাসক হিসেবে স্বীকৃতিমূলক কোন বাক্যোচ্চারণ করলেন না। বরং বক্তব্য প্রকাশের মাধ্যমে যয়নুল আবেদীন শুধু জনসাধারণের মনে নিজের প্রভাব বিস্তার করছেন, ক্রমান্বয়ে শ্রোতাদের মাঝে উত্তেজনার নিদর্শনও পরিলক্ষিত

www.pathagar.com

হচ্ছে। তখন ইয়াজিদ সন্ত্রস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি মুয়াযযিনকে একামত বলার নির্দেশ দিলেন।

ইমাম যয়নুল আবেদীন (র.)-এর পরিণত বয়সের একটা ঘটনা উল্লেখ করছি। একবার যুবরাজ হিশাম ইবনে আবদুল মালিক হজ্জ মওসুমে মক্কা উপস্থিত হন। তার সাথে ছিল রাজকীয় লোক লস্কর ফলে মক্কা নগরীতে ধুম ধাম পড়ে গেল। নির্দিষ্ট দিনে হজ্জের অনুষ্ঠান শুরু হলে যুবরাজ হিশামও তাওয়াফ শুরু করলেন। কিন্তু প্রচন্ড ভিড়ের জন্য হজরে আসওয়াদ চুম্বন করতে পারলেন না। সরকারী বাহিনী চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন।

এ সময় একটি অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটলো, সবাই দেখলো কতিপয় লোক পরিবেষ্টিত হয়ে ইমাম যয়নুল আবেদীন (র.) লাব্বায়কা আল্লাহুমা লাব্বায়কা এই দোয়া উচ্চারণ করতে করতে তাওয়াফ করছেন। রাজকীয় লোক লস্কর, এমনকি খোদযুবরাজ হিশামও আশ্চর্য হয়ে দেখলেন– জনতার প্রচন্ড ভীড় সরে যাচ্ছে এবং সসম্মানে রাস্তা করে দিচ্ছে। তিনি বিনা বাধায় ধীর স্থির ভাবে হজরে আসওয়াদ চুম্বন করছেন। এ দৃশ্য দেখে কেউ কেউ হিশামকে জিজ্ঞেস করলো হুজুর লোকটি কে?

যয়নুল আবেদীন (র.) কে ভাল মত চেনা সত্ত্বেও হিশাম রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে জবাব দিলেন, 'কে জানে কোথাকার কে, আমার তাকে চিনতে হবে নাকি?

ঘটনাক্রমে সেখানে সে সময়কার আরবের প্রধান কবি আবুল ফারাস ফেরাজদাক উপস্থিত ছিলেন। তিনি ইমামের প্রতি হিশামের উক্ত অবজ্ঞাসূচক উক্তি শুনে স্থির থাকতে পারলেন না। চিরনির্ভীক এবং স্বাধীনচেতা আরব মরুর বেদুইন কবির ঠোট থেকে লাফিয়ে পড়লো কবিতার পংক্তি। তিনি বললেন–

ওহে অন্ধ পাপিরা! তোমরা চিন না তারে!
যিনি সে মহান সত্ত্বা, -যাহার পদক্ষেপগুলি মক্কা চিনিতে পারে।
ইনি সে মহান পুরুষ, খোদ বাইতুল্লাহ্ জানে যার পরিচয়
হেরেম ভূমির কোন বালুকণার কাছেও তাঁর কথা অবিদিত হন
জনগণের অনুরোধ তিনি পুনঃ উচ্চারণ করলেন–
ইনি জগতের সেরা মানুষের, সেরা ইমামের সন্তান
অন্তর যার পাপলেষহীন পুতঃপবিত্র মহান।
হৃদয় যাহার সাগর আর এলেমের ভান্ডার

www.pathagar.com

তাঁকেই চিনে না একথা যে বলে লজ্জা নাই কি তার?
যিনি পবিত্র কাবার হাতীমে-পাথরে চুম্বন দিতে গেলে
তাঁর পবিত্র সুরভিতে তারা উল্লাসে উঠে ছলে।
শালীনতায়, আভিজাত্যে তাঁহার তুল্য কে আছে ভাই?
মানুষের সব সেরাগুণ শেষ এখানে আর কিছু বাকী নাই।

কবিতা মুগ্ধ মানুষ ধ্বনি তুললো, প্রিয় আবুল ফারাস! আরও বল, আরও বল তুমি নীরব হয়ো না, আল্লার কসম! তিনি শুরু করলেন–

অজ্ঞ মূর্খেরা! এই মহৎজনের পরিচয় যদি এখনও না জেনে থাক
তবে আমি আজ বলি কথা সবে কান পেতে শুনে রাখ।
ইনি রাসূল দুহিতা ফাতিমার সুযোগ্য পুত্রের সন্তান
যার জনকের মাতাসহ নবী রসূলগণের সর্বশ্রেষ্ঠ জন।
শালীনতা ও বিনয়াধিক্যে সদাই দৃষ্টি আনত যার
তবু তাঁর চোখে চোখ রেখে কথা বলে, এমন শক্তি কার?
তাঁর পেশানীর হেদায়াতী নূর জাহেলী এমনি করে বিনাশ
যেমনি সূর্য নিজ আলো দ্বারা করে দেয় সব আঁধার নাশ।

এ কবিতা লেখার দায়ে হিশামের সৈন্য বাহিনী কবি আবুল ফারাসকে বন্দী করে দামেস্কে নিয়ে যায়। এমন কি ইমাম যয়নুল আবেদীনের জনপ্রিয়তার কথা শুনে এবং পুত্র হিশামের অনুরোধে খলিফা আবদুল মালিক মদীনার শাসনকর্তাকে লিখে পাঠালেন, 'হোসাইন (রা.) তনয় যয়নুল আবেদীনের দুপায়ে শিকল পরিয়ে তাকে দামেস্কে প্রেরণ করা হোক।'

নির্দেশ মাত্র মদীনায় শাসনকর্তা তাই করলেন, ইমাম সাহেবকে বন্দীকরে দামেস্কে প্রেরণ করলেন।

কিন্তু ইমাম সাহেবকে দেখেই আবদুল মালিক কেমন যেন হয়ে গেলেন। তিনি সভাসদদের কাছে পরামর্শ চাইলেন, এখন কি করবেন? নানাজনে নানা পরামর্শ দিলেন কিন্তু তৎকালীন সময়ের সনামধন্য মুহাদ্দিস মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম জুহরী বললেন, 'ইমাম যয়নুল আবেদীন (র.)-এর কোন আচরণ রাজদ্রোহিতামূলক বা আপনাকে হেয়প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যসূচক এমন কোন প্রমাণ তো আপনার কাছে নেই। ইনি তো ইবাদত বন্দেগীতে এমনভাবে মগ্ন হয়ে থাকেন যে, তাঁর কাছে তাঁর নিজের সম্পর্কেই খবর থাকে না। অতএব

www.pathagar.com

আমার মতে এই ধরনের একজন আবেদ লোককে কোনরূপ কষ্ট না দেয়ায় উত্তম। এখন আপনার যা অভিরুচি হয় করুন।'

খলিফা আবদুল মালিকের নিকট জুহ্‌রীর প্রস্তাব মনপুত হলো। তিনি ইমাম সাহেবকে সসম্মানে মদীনায় ফেরত পাঠালেন।

উক্ত ঘটনাগুলি থেকে প্রমাণিত হয় যে তিনি খলীফা না হয়েও খলীফার থেকে বেশী ক্ষমতাবান বা মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। যে কারণে শাসকগণ বারবার এই দরবেশ মানুষটির ভয়ে ভীত হয়ে তাঁর ওপর অত্যাচার চালিয়েছেন।

খোলাফায়ে রাশেদার পঞ্চম খলীফা বলে যাকে ধরা হয় সেই ওমর ইবনে আবদুল আযীয ইমাম যয়নুল আবেদীনের সময়েই ক্ষমতায় আসীন হন। জানাযায় উমাইয়া বংশের সব থেকে বিলাসী যুবক ছিলেন তিনি। তিনি যখন মক্কা থেকে মদীনায় আসেন তখন তাঁর ব্যক্তিগত পোশাক পরিচ্ছদ বহন করার জন্য ত্রিশটি উঠের প্রয়োজন হয়েছিল। অথচ মদীনায় আসার পর ইমাম সাহেবের সাহচর্যে এসে তিনি আমূল বদলে যান এবং ইতিহাসে দ্বিতীয় ওমর হিসাবে নিজের আসন করে নিতে সক্ষম হন।

ইমাম সাহেব ছিলেন দয়ার সাগর, ক্ষমতার পালাবদলে হিশাম ক্ষমতাচ্যুত হলেন। ওমর ইবনে আবদুল আযীয হিশামকে বন্দী করে মারওয়ান ইবনে হাকামের বাড়ির সামনে হাত পা বাঁধা অবস্থায় প্রকাশ্যে বিচারের জন্য দাঁড় করিয়ে দিলেন। ঘোষণা করে দেয়া হলো হিশামের বিরুদ্ধে যার যা অভিযোগ আছে, তারা যেন নিজে এসে তার প্রতিকার করে যান।

এভাবে তিনদিন চলার পর খবর পেয়ে ইমাম যয়নুল আবেদীন সেখানে উপস্থিত হলেন। ইমামকে দেখে হিশাম সত্যিই ভয় পেয়ে গেলেন। তার ধারণা হলো ইমাম অভিযোগ করলেই তার মৃত্যুদন্ড অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু ইমাম সাহেব অভিযোগ করা দূরের কথা বরং হিশামকে খালাস করে পিঠে হাত রেখে বললেন, 'হিশাম'! চিন্তিত হয়ো না। তোমার কোন কিছুর প্রয়োজন থাকলে বলো! আমি তোমাকে সাহায্য করবো।'

তারপর লোকজনকে লক্ষ্য করে বললেন, 'হিশাম এখন পদচ্যুত, অক্ষম-অসহায় এবং দুর্বল! এরূপ লোককে ক্লেশ দান করা সমাচীন নয়। আপনারা সবাই তাকে ক্ষমা করে দিন।'

তিনি জীবনে বহুবার ওমরা ও হজ্জ পালন করেন। এরমধ্যে অনেকবার পায়ে

www.pathagar.com

হেটে তা সম্পন্ন করেন। তিনি উঠে আহরোণ করে ২০ বার হজ্জ্ব করেন বলে জানা যায়।

তিনি দান খয়রাতের ক্ষেত্রেও ছিলেন খুবই দরাজ দিল। ইবনে সায়াদ বলেন, 'আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, যয়নুল আবেদীনের নিকট ভিক্ষুকগণ কোন কিছু প্রার্থনা করলে তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন এবং ভিক্ষুকের হাতে অবশ্যই কোন কিছু দিতেন। তিনি বলতেন, 'ছাদকাহ ভিক্ষুকের হস্তগত হওয়ার পূর্বে আল্লাহ্ পাকের হস্তগত হয়।'

গর্ব অহংকার তাকে স্পর্শ করতো না। তিনি হযরত ওমর (রা.)-এর ক্রীতদাস হযরত আসলামের মজলিসে নিয়মিত বসতেন। বিষয়টি নিয়ে একদিন এক লোক বললো, 'আপনি কোরাইশ বংশের লোক হয়ে গোলামের মজলিসে কি করে বসে থাকেন? উত্তরে তিনি বললেন, যার যেখানে উপকার হয় সেখানেই সে বসে।'

মৃত্যুকালে তিনি ১০ জন পুত্রসন্তান ৩৪ জন কন্যা সন্তান রেখে যান।

ইমাম যয়নুল আবেদীন (র.) ৫৮ বছর বয়সে ৯৪ হিজরী সনে মুহররম মাসের দ্বিতীয় দশকে মদীনায় ইন্তেকাল করেন। তাঁর সন্তান মুহাম্মদ বাকী তাঁর লাশ কবরে নামান। তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে চাচা হাসান (রা.) ও চাচাতো ভাই ইবনে আব্বাসের পাশে দাফন করা হয়।

www.pathagar.com

হযরত যয়নব (রা)

রসূল (সঃ)-এর প্রথমা কন্যা। নাম যয়নব (রা) বিনতু মুহাম্মদ (স) ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুল মুত্তালিব। মাতা খাদীজাতুল কোবরা বিনতু খুয়াইলিদ ইবনে আসাদ ইবনে আবদুল ওযযা ইবনে কুসাই। তাঁর মা খাদীজা (রা) প্রথম মুসলমান, যিনি রসূল (স)-এর নবুওয়তের সংবাদ শুনেই ঈমান আনেন।

জন্ম

নবুয়তপ্রাপ্তির দশ বছর পূর্বে রসূল (স)-এর ত্রিশ বছর বয়সে যয়নব (রা) মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শৈশব-কৈশর সম্বন্ধে তেমন কিছুই জানা যায় না। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, নবী পরিবারের প্রথম সন্তান হিসাবে তিনি অত্যন্ত আদর-সোহাগ পেয়েই বেড়ে ওঠেন। সাথে সাথে পারিবারিক শিক্ষা-দীক্ষায়ও তিনি দক্ষ হয়ে ওঠেন। রসূল (স)-এর নবুয়তপ্রাপ্তির পর পরই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

বিবাহ

শিশু বয়সে যয়নব (রা)-এর বিয়ে হয় আপন খালাত ভাই আবুল আছের সাথে। তার উপাধি ছিল লাকীত এবং বংশ লতিকা হল-আবুল আছ ইবনে রাবী ইবনে আবদুল উয্যা ইবনে আবদে শামস ইবনে আবদে মানাফ ইবনে কোসাই। হযরত খাদীজা (রা)-র আপন বোন হালা বিনতু খুয়াইলিদের পুত্র ছিলেন এই আবুল আছ। ইনি খুবই ভদ্র এবং স্বজ্জন ব্যক্তি ছিলেন কিন্তু প্রথমদিকে ইসলাম কবুল করেন নি।

যয়নব (রা)-এর বিয়ের সময় উপঢৌকন হিসাবে অন্যান্য জিনিসের মধ্যে ইয়ামনের আকীক পাথরে তৈরি একটি হার খাদীজা (রা) দিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

ইসলাম গ্রহণ

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, রসূল (স)-এর নবুয়ত লাভের প্রথম পর্যায়েই যয়নব (রা) ইসলাম কবুল করেন। কিন্তু স্বামী আবুল আছ মুশরেক থেকে যান। এমতাবস্থায় স্বাভাবিক ছিল তাদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়া। এ ব্যাপারে মক্কার কাফিররা আবুল আছকে হযরত যয়নব (রা)-কে তালাক দেয়ার জন্য নানাভাবে প্ররোচিত করছিলো। কিন্তু আবুল আছ তাদের কথায় কর্ণপাত করেন নি। বরং যয়নব (রা)-এর সাথে সব সময় ভাল ব্যবহার করেছেন। রসূল (স) তাঁর এ ব্যবহারের জন্য তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, এমনকি প্রশংসাও করতেন। অপর দিকে ইসলামী শরীয়ত মতো একজন মুসলিম মহিলা অথবা পুরুষ কোন মুশরেক পুরুষ অথবা মহিলার সাথে স্বামী-স্ত্রী হিসাবে থাকতে পারে না। কিন্তু তখনো ইসলাম ও মুসলমানরা ছিলো হীনবল। তখনো রসূল (স) ও মুসলমানরা সর্বদা কাফরদের অত্যাচার-নির্যাতনের স্বীকার হচ্ছিলো। যে কারণে রসূল (স) সব দিক বিবেচনা করে তাদের বিবাহ্ বিচ্ছেদ ঘটান নি।

বদরের যুদ্ধ

মক্কায় কাফিরদের অত্যাচার যখন তুঙ্গে ওঠে তখন বাধ্য হয়েই রসূল (স) মদীনায় হিজরত করেন। মক্কা থেকে মদীনার দূরত্ব প্রায় ২০০ মাইলের মতো। কিন্তু তবু কাফিররা ইসলাম ও মুসলমানদেরকে দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার মানসে মক্কা থেকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে মদীনার উপকণ্ঠে গিয়ে হাযির হয়। এ সংবাদে রসূল (স) তাঁর সীমিত শক্তি নিয়ে তাদের মুকাবিলা করতে এগিয়ে আসেন। এ সময় তার সাথে মাত্র ৩১৩ জন সাহাবী ছিলেন। বদর নামক প্রান্তরে দ্বিতীয় হিজরীর রমযান মাসে মুসলমান ও কাফিরদের মধ্যে প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

মুসলমানদের তুলনায় কাফিররা বিপুল সংখ্যায় থাকলেও যুদ্ধে মুসলমানরা জয়লাভ করে। এ যুদ্ধে কাফেরদের নেতৃস্থানীয় ৭০ জন যোদ্ধা নিহত হয়। উল্লেখ্য যে ইসলাম ও মুসলমানদের বড় শত্রু আবূ জেহেল এ যুদ্ধেই নিহত হয়। এ ছাড়া ৭০ জন কাফির সৈন্য বন্দী হয়।

বদরের এ ঐতিহাসিক যুদ্ধে হযরত যয়নব (রা)-এর স্বামী আবুল আছ মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে এবং তিনি বন্দী হন। জানা যায় হযরত আবদুল্লাহ্ বিন জাবির (রা) তাঁকে গ্রেফতার করেন।

www.pathagar.com

বদর যুদ্ধের ফলাফলের খবর যখন মক্কায় পৌঁছল তখন তৎকালীন আরবের নিয়ম অনুযায়ী মুসলমানদের হাতে বন্দী ৭০ জন কয়েদীর আত্মীয়-স্বজনরা তাদের মুক্তির জন্য রসূল (স)-এর দরবারে ফিদিয়া পাঠাতে লাগলো।

হযরত যয়নব (রা) তখনো মক্কাতে তার শ্বশুর বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। তিনি যখন তাঁর স্বামীর বন্দী হওয়ার কথা শুনলেন তখন অন্যান্যের মত আপন দেবর আমার বিন রবির কাছে ফিদিয়া হিসাবে নিজের গলার বহুমূল্যবান হারটি পাঠিয়ে দিলেন। এই হারটিই তাঁর বিয়ের সময় হযরত খাদীজা (রা) তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন।

আমর বিন রবি যখন মদীনায় রসূল (স)-এর দরবারে এসে তার ভাইয়ের ফিদিয়া হিসাবে হারটি পেশ করলো, তখন রসূল (স) হারটি চিনতে পারলেন এবং হযরত খাদীজা (রা)-র স্মরণ করে আনমনা হয়ে পড়লেন। তাঁর চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠলো।

এরপর তিনি সাহাবাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'যদি ভাল মনে করো তাহলে এই হার যয়নব (রা)-কে ফেরত পাঠিয়ে দিতে পারো। এটা তার মা'র নিদর্শন। আবুল আছের ফিদিয়া হলো, সে মক্কা গিয়ে হযরত যয়নব (রা)-কে কালবিলম্ব না করে মদীনায় পাঠিয়ে দেবে।'

সকল সাহাবী রসূল (স)-এর প্রস্তাব সম্মানের সাথে গ্রহণ করলেন। আবুল আছও এই শর্ত মেনে নেয়ায় তাকে মুক্ত করে দেয়া হলো। মুক্ত আবুল আছের সংগে রসূল (স) হযরত যায়েদ বিন হারিছা (রা)-কে পাঠালেন। তাকে বলে দিলেন যে, সে বতনে ইয়াজিজ'-এ অপেক্ষা করবে। যয়নব (রা) যখন সেখানে এসে পৌঁছবে তখন তাঁকে নিয়ে তিনি মদীনা ফিরে আসবেন।

মদীনায় হিজরত

আবুল আছ মক্কা পৌঁছে শর্ত অনুযায়ী হযরত যয়নব (রা)-কে মদীনায় পাঠানোর ব্যবস্থা নেন। সে অনুযায়ী যয়নব (রা) যখন প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তখন ওতবা'র মেয়ে হিন্দ এসে তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'হে নবী দুলালী! তুমি কি পিতার কাছে যাচ্ছ?' তিনি উত্তর দিলেন, 'আপততঃ তো তেমন ইচ্ছে নেই। ভবিষ্যতে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হলে দেখা যাবে।' পরিস্থিতি বুঝে হিন্দ বললেন, 'বোন, আমার কাছে গোপন করার কি প্রয়োজন? তুমি সত্যিই যদি যেতে চাও এবং পথের সম্বলের কিছু প্রয়োজন থাকলে তাহলে বিনা দ্বিধায় বলতে পারো, আমি খেদমতের জন্য প্রস্তুত।' আসলে তখনো নারী সমাজের মধ্যে একটা মমত্ব ছিল।

www.pathagar.com

ইসলাম প্রচারের কারণে পুরুষদের মধ্যে যেভাবে বিরোধ ও শত্রুতা শুরু হয়েছিল, মহিলারা তখনো অতটা শত্রুভাবাপন্ন ছিলো না। তাই যয়নব (রা) এ ব্যাপারে বলতে গিয়ে বলেছেন, 'হিন্দ যা কিছু বলেছিলেন, সরল মনেই বলেছিলেন। আমার কোন জিনিসের প্রয়োজন হলে তিনি অবশ্যই পূরণ করতেন। কিন্তু সময়ের কথা বিবেচনা করে আমি অস্বীকার করেছিলাম।' (যরকানী ২য়খন্ড পৃষ্ঠা-২২৩)

আবুল আছ তার ছোট ভাই কেনানার সঙ্গে হযরত যয়নব (রা)-কে মদীনার উদ্দেশ্যে গোপনে রওনা করে দিলেন। কারণ কাফিররা সব সময় ওঁৎপেতে থাকতো মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করার জন্য। আর হযরত যয়নব (রা) তো শুধু মুসলমানই ছিলেন না, তিনি ছিলেন খোদ রসূল (স) কন্যা। যে জন্য কাফিরদের আক্রমণের ভয়ে তীরন্দাজ কেনানা তীর, ধনুক ইত্যাদি অস্ত্র সাথে নিয়েছিলেন।

এতো সাবধানতার পরও শেষ রক্ষা হলো না, তারা মদীনার পথে রওনা হওয়ার পরপরই কাফিরদের মধ্যে হৈ চৈ পড়ে গেল এবং একদল লোক তাদেরকে পাকড়াও করার জন্য বেরিয়ে পড়লো। কোরাইশ কাফিররা জিতাব নামক স্থানে তাদেরকে ঘিরে ফ্যালে। ঘেরাওকরীদের মধ্য থেকে হিবার বা হাব্বার বিন আসওয়াদ হযরত যয়নব (রা)-কে বল্লম দিয়ে আঘাত করে ফলে তিনি ঘোড়ার পিঠ থেকে মাটিতে পড়ে যান। এ সময় যয়নব (রা) অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। বল্লমের আঘাতে মাটিতে আছড়ে পড়ার কারণে তৎক্ষণাত তাঁর গর্ভপাত হয়ে যায়। এমন কি এ আঘাত থেকে তিনি আর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন নি। এতেই তিনি শাহাদাত বরণ করেন। উল্লেখ্য যে আঘাতকারী হিবার বিন আসওয়াদ হযরত খাদীজা (রা)-র আপন চাচাত ভাই ছিলেন। তার জঘন্য অপরাধের কথা রসূল (স) পর্যন্ত ভুলতে পারেন নি। যে কারণে মক্কা বিজয়ের দিন রসূল (স) তাকে হত্যা করার অনুমতি প্রদান করেন। কিন্তু হিবার তার কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে ইসলাম কবুল করেন।

যাহোক চক্ষের পলকে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক ঘটনায় তীরন্দাজ কেনা না ক্ষিপ্ত হয়ে ধনুকে তীর সংযোজন করে ঘোষণা দেন, 'এখন যে কেউ আমার কাছে আসবে, কবর হবে তার ঠিকানা।' তার এ ঘোষণায় ভীত হয়ে কোরাইশ কাফিরগণ এদিক-সেদিক সটকে পড়ে। পরিস্থিতি খারাপ দেখে ধূর্ত কোরাইশ সর্দার আবূ সুফিয়ান এগিয়ে এসে বলেন, 'মুহাম্মদের হাতে আমাদেরকে যে বিপদ-মুছিবত, পরাজয় এবং লাঞ্ছনা-অবমাননার গ্লানি সইতে হচ্ছে, সে সম্পর্কে

www.pathagar.com

তোমরা বেখবর নও। এখন তোমরা যদি প্রকাশ্যে তার কন্যাকে আমাদের সম্মুখ দিয়ে নিয়ে যাও, তাহলে মানুষ এটাকে আমাদের দুর্বলতা, কাপুরুষতা বলে অবিহিত করবে এবং এটাকে আমাদের পশ্চাদপসারণের পূর্বাভাষ বলে মনে করবে। তোমরা নিজেরাইতো এটা বুঝতে পার যে, মুহাম্মদ-এর কন্যাকে বাধা দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই আমাদের। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এখন তোমরা ফিরে যাও। হৈ চৈ থেমে গেলে মানুষ যখন বুঝতে পারবে যে, আমরা মুহাম্মদের কন্যাকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছি, তখন তোমরা গোপনে তাকে নিয়ে যাবে। কেনানা এটা মেনে নিয়ে ফেরত আসেন। ঘটানাটি সাধারণ্যে প্রচারিত হলে একদিন গোপনে তাঁকে নিয়ে কেনানা রওয়ানা হন। তিনি বতনে ইয়াজিজ' এ যায়েদ ইবনে হারেসার কাছে হযরত যয়নব (রা) পৌঁছে দিয়ে ফিরে যান। তিনি হযরত যয়নব (রা)-কে নিয়ে মদীনা- মুনাওয়ারা রওয়ানা হন। (তবকাত, ৮ ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২১)।

যয়নব (রা)-এর ওপর কোরাশইদের এ অত্যাচারের কথা স্মরণ করে রসূল (স) তাঁর ইন্তেকালের দিন শোকাভিভূত হয়ে বলছিলেন, 'আমার সবচেয়ে ভালো মেয়ে ছিলো যয়নব (রা)। আমাকে ভালবাসার জন্য তাঁকে কষ্ট দেয়া হয়েছিলো।'

আবুল আছ যয়নব (রা)-কে খুব ভালবাসতেন। সে জন্য ওয়াদা অনুযায়ী তাঁকে মদীনা পাঠিয়ে দেয়ার পর তিনি খুবই কষ্টপান। যে কারণে সিরিয়া সফরকালে যয়নব (রা)-এর কথা স্মরণ করে তিনি দু'টি কবিতা আবৃত্তি করেন। কবিতা দু'টি নিম্নরূপ–

১. আমি যখন ইরিম অতিক্রম করছিলাম
তখন; যয়নবকে স্মরণ করলাম
এবং বললাম,
হে খোদা!
যে ব্যক্তি হেরেমে অবস্থান করছে
তাকে চির সবুজ রেখো।
২. আল-আমীনের কন্যাকে
আল্লাহ্ উত্তম বদলা দিন
এবং
প্রত্যেক স্বামীই সেই কথারই প্রশংসা করে
যা সে ভালভাবে জানে।

www.pathagar.com

আবুল আছ-এর ইসলাম গ্রহণ

আবুল আছ ব্যক্তিগতভাবে খুব শরীফ ও আমানতদার মানুষ ছিলেন। তৎকালীন মক্কা শহরে তার আমানতদারীর কথা এতো মশহুর ছিলো যে, প্রচুর লোকজন তার কাছে মাল-সামান নির্দ্বিধায় রেখে দিতো এবং চাইবা মাত্র পেয়েও যেতো। অন্যদিকে তিনি ছিলেন ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একজন অভিজ্ঞ মানুষ। যে কারণে অনেকেই অধিক মুনাফার আশায় তাদের পণ্য বিক্রির জন্য আবুল আছের কাছে দিতো। হিজরী ৬ষ্ঠ সনের সওয়াল মাসে এ ধরনের মাল-সামান নিয়ে একটি কাফেলার সাথে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে আবুল আছ সিরিয়া রওনা হন। কিন্তু পথে তার কাফেলা মুসলিম মুজাহিদদের আক্রমণের শিকার হয়। মুশরিকদের পুরো কাফেলায় মুসলনমাদের হাতে মাল-সামানসহ বন্দী হয়। তবে আবুল আছ পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। তিনি পালিয়ে মদীনা পৌঁছে হযরত যয়নব (রা)-এর কাছে আশ্রয় নেন।

ফজরের নামায শেষ হলে হযরত যয়নব (রা) উচ্চস্বরে ঘোষণা করেন, 'আমি আবুল আছকে আশ্রয় দিয়েছি।'

এ কথা শুনে রসূল (স) সাহাবাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'আমি যা শুনলাম তোমরা কি তা শুনেছ? উত্তরে সাহাবাগণ বললেন, 'হ্যাঁ'। তখন রসূল (স) বললেন, 'আল্লাহ্‌র কসম! যখন তোমরা শুনেছ আমিও তখনই শুনেছি। এর পূর্বে এ বিষয়ে আমার কোন কিছুই জানা ছিলো না। তবে মুসলমানদের কেউ কাউকে আশ্রয় দিলে তা সকলকেই স্বীকৃতি দিতে হয়, বিধায় যাকে যয়নব আশ্রয় দিয়েছে তাকে আমিও আশ্রয় দিলাম।' এ কথা বলে রসূল (স) হযরত যয়নব (রা)-এর ঘরে গেলেন এবং সেখানে আবুল আছকে দেখতে পেলেন। তখন তিনি যয়নব (রা)-কে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আবুল আছ-এর আদর-যত্ন করো, তার সম্মানের যেন কোন অমর্যাদা না হয়। তবে যতক্ষণ সে মুশরেক থাকবে ততক্ষণ তার নৈকট্য থেকে দূরে থাকবে। কারণ, ইসলাম ও কুফর একত্র হতে পারে না।'

চাশতের নামাযের সময় সাহাবীদের উপস্থিতিতে রসূল (স) আবুল আছকে নিজের পাশে বসিয়ে বললেন, 'আবুল আছের সাথে আমার আত্মীয়তার সম্পর্কের কথা তোমাদের জানা আছে। তোমরা তার সহায়-সম্পদের অধিকারী হয়েছ। আমি চাই তোমরা তার সমস্ত মালামাল ফেরত দিয়ে দাও। তবে ফেরত না

www.pathagar.com

দেয়ার অধিকার অবশ্যই তোমাদের আছে। কারণ, এ মালের তোমরা ন্যায্য হকদার।'

রসূল (স)-এর এ আবেদনের প্রেক্ষিতে সাহাবাগণ আবুল আছের সমস্ত মাল-সামান ফেরত দিয়ে দিলেন। এমন কি একটি রশি কিংবা গ্লাস পর্যন্তও ফেরত দিয়ে দিলেন।

আবুল আছ তার সমস্ত মাল-সামানসহ মক্কা পৌঁছলেন এবং যথাযথ- ভাবে মালিকদেরকে তার মাল ফেরত দিলেন। এরপর তিনি কোরাইশদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'হে কোরাইশগণ! এখন আমার জিম্মায় কারোর কোন আমানত নেই তো?'

কোরাইশগণ উত্তরে বললো, 'মোটেই না। খোদা তোমাকে উত্তম জাযা দিন। তুমি একজন নেককার ও ওয়াদা পূরণকারী মানুষ।'

কোরাইশদের এ ঘোষণার পর আবুল আছ বললেন, 'তাহলে তোমরা শুনে নাও। আমি ইসলাম কবুল করছি।' একথা বলেই তিনি কলেমা শাহাদাত পাঠ করলেন–

'আশহাদুয়াল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াদাহু লা শারিকালাহু ওয়াশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আ'বদুহু ওয়ারাসুলুহু।'

অর্থাৎ– 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয় এবং তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (স) আল্লাহ্‌র বান্দাহ ও রসূল।'

কালেমা পাঠের পর আবুল আছ (রা) বললেন, 'আল্লাহ্‌র কসম! মুহাম্মদ (স)-এর খেদমতে হাযির হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ থেকে একটা মাত্র জিনিস আমাকে নিবৃত্ত রেখেছে। আর তা হচ্ছে এই যে, তখন আমি ইসলাম গ্রহণ করলে তোমরা বলতে যে, আমি তোমাদের পণ্যসামগ্রী আত্মসাৎ করার জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছি। এখন আল্লাহ আমাকে এ বিরাট দায়িত্ব থেকে সম্মানজনকভাবে মুক্ত করেছেন। তাই এখন আর ইসলাম গ্রহণ করতে কোন বাধা নেই।'

এই ঘটনাটি ঘটে সপ্তম হিজরী সনের মহররম মাসে। এর পর পরই আবুল আছ (রা) হিজরত করে মদীনা চলে যান।

www.pathagar.com

রসূল (স) আবুল আছ (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ করার কথা শুনে হযরত যয়নব (রা)-কে তাঁর সাথে একত্রে থাকার অনুমতি দেন।

যয়নব (রা) চরিত্র মাহাত্ম্য

যয়নব (রা) ব্যক্তিগতভাবে মূল্যবান পোশাক-আশাক পছন্দ করতেন। 'হযরত আনাস (রা) তাকে রেশমী কাপড় পরিধান করা অবস্থায় দেখেছেন, যাতে হলুদ রংয়ের বুটি ছিল।' রসূল (স) ও স্বামী আবুল আছ-এর প্রতি ছিলো তাঁর অসাধারণ ভালবাসা ও শ্রদ্ধা।

সন্তান-সন্ততি

যয়নব (রা)-এর একটি পুত্র সন্তান ও একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। এদের নাম যথাক্রমে আলী ও উমামা। হিজরতের পূর্বেই আলী'র জন্ম হয়। জানা যায় আলী রসূল (স)-এর দায়-দায়িত্বে লালিত-পালিত হন এবং বেড়ে ওঠেন। যেদিন মুসলিম বাহিনী মক্কা জয় করে বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করে সেদিন আলী তার নানা রসূল (স)-এর উটে সওয়ার ছিলেন।

কিশোর বয়সে পিতা আবুল আছ-এর জীবিতাবস্থায় আলী ইন্তেকাল করেন। কিন্তু ইবনে আসাক বর্ণনা করেন, 'আলী ইয়ারমুকের যুদ্ধ পর্যন্ত বেঁচেছিলেন। ইয়ারমুকের যুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করেন।'

আর কন্যা উমামা এরপরও বেঁচেছিলেন। তাঁর বিয়ে-শাদী হয়েছিল। এমন কি তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন।

এই উমামাকে রসূল (স) খুবই ভালবাসতেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, 'জাযআ গোত্রের লোকেরা একবার রসূল (স)-কে একটি হার হাদিয়াস্বরূপ দিলে রসূল (স) তা গ্রহণ করেন এবং ইরশাদ করেন, 'হারটি আমার পরিবারের একজন স্নেহভাজনকে উপহার দিব।' শ্রোতাদের মনে ধারণা জন্মিল যে এই হার ইবনে কুহাফার কন্যা আয়েশার জন্যেই জুটবে, কিন্তু তাদের এ ধারণা সঠিক হলো না। রসূল (স) মৃত যয়নবের কন্যা উমামাকে ডেকে এনে হারটি নিজ হাতে তার গলায় পরিয়ে দেন।'

আরো জানা যায়– অনেক সময় রসূল (স) উমামাকে কাঁধে নিয়েই নামায আদায় করতেন, সিজদার সময় নামিয়ে দিতেন, নামায শেষে পুনরায় কোলে নিতেন।

www.pathagar.com

ইন্তিকাল

হযরত আবুল আছ (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের পর যয়নব (রা) আর বেশি দিন জীবিত ছিলেন না। আবুল আছ (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন ৭ম হিজরীতে, এর এক বছর পর ৮ম হিজরীতে রসূল (সঃ)-এর জীবদ্দশায় তিনি ইন্তেকাল করেন। এ সম্পর্কে বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল ইস্‌তিয়াব'– এ উল্লেখ করা হয়েছে 'হযরত যয়নব যখন মক্কা থেকে পিতার নিকট হাযির হওয়ার জন্য রওনা হন, পথিমধ্যে হিবার এবং অপর এক ব্যক্তি তাঁর ওপর হামলা চালালে তিনি উটের পিঠ থেকে পড়ে যান। এতে তাঁর গর্ভপাত হয় এবং বেশ রক্তক্ষরণ হয়। দীর্ঘদিন এ অসুখে ভোগার পর হিজরী ৮ম সালে তিনি ইন্তিকাল করেন।'

'হযরত উম্মে আইমান, হযরত সাওদা, হযরত উম্মে সালমা, হযরত উম্মে আতিয়া (রা) সকলেই তাঁর গোসলে শরীক ছিলেন। নবীজী নিজে কবরে নামেন এবং আপন নয়নের পুত্তলীকে দাফন করেন। তখন তাঁর চেহারায় ছিল শোকের চিহ্ন। নবীজী তাঁর জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করেন, 'আয় আল্লাহ্! তুমি যয়নবের মুশকিল আসান কর, কষ্ট দূর কর, তাঁর কবরের সংকীর্ণতা প্রশস্ত কর।' (তবকাত ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা–২২)

বুখারী শরীফের হাদীস থেকে জানা যায়, প্রখ্যাত মহিলা সাহাবী উম্মে আতিয়া (রা) বর্ণনা করেন, 'আমি যয়নব (রা) বিনতু রসূল (স)-এর গোসলে অংশ নিয়েছিলাম। গোসলের নিয়ম কানুন স্বয়ং রসূল (স) বলে দেন। তিনি বললেন, প্রথমত প্রত্যেক অঙ্গই তিনবার অথবা পাঁচবার ধৌত কর এবং তারপর কর্পূর লাগাও।'

অন্য এক বর্ণনায় আছে, রসূল (স) হযরত উম্মে আতিয়া (রা)-কে বললেন, 'হে উম্মে আতিয়া! আমার কন্যাকে ভালোভাবে কাফনে জড়াবে। তার চুলের তিনটি বেনি বানাবে এবং তাতে সর্বোত্তম সুগন্ধী মাখাবে।' (আদ-দুররুল মানসূর পৃষ্ঠা-২৩১)

যয়নব (রা)-এর নামাযে জানাযা স্বয়ং রসূল (স) পড়ান। এরপর আবুল আছকে সংগে নিয়ে লাশ কবরে নামান এবং দাফনের কাজ শেষ করেন।

www.pathagar.com

হযরত রুকাইয়া (রা)

নাম রুকাইয়া। তিনি রসূল (স)-এর দ্বিতীয় কন্যা। অতএব পিতার দিক থেকে তাঁর বংশ লতিকা হলো– হযরত রুকাইয়া বিনতু মুহম্মদ (স) ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে মুত্তালিব। তাঁর মাতা হলেন রসূল (স)-এর প্রথমা স্ত্রী হযরত খাদীজাতুল কোবরা (রা)। সেই সূত্রে মাতার দিক দিয়ে তাঁর বংশ লতিকা হলো, রুকাইয়া বিনতু খাদীজা (রা) বিনতু খুয়াইলিদ ইবনে আসাদ ইবনে আবদুল ওযযা ইবনে কুসাই।

জন্ম

হযরত রুকাইয়া (রা)-র নবুয়ত প্রাপ্তির ৭ বছর পূর্বে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। এ সময় রসূল (স)-এর বয়স ছিল ৩৩ বছর। রুকাইয়া (রা) তাঁর বড় বোন হযরত যয়নব (রা)-এর থেকে ৩ বছরের ছোট ছিলেন।

বিবাহ

হযরত রুকাইয়া (রা)-র প্রথম বিয়ে হয় নবুয়ত প্রাপ্তির আগে ইসলামের বড় শত্রু আবূ লাহাবের পুত্র ওতবার সাথে। তিনি তখন নিতান্তই শিশু। রুকাইয়া (রা)-র শ্বশুর আবূ লাহাব ও শাশুড়ি উম্মে জামিল ছিলো ইসলামের ঘোরতর শত্রু। তারা ছিলো রসূল (স)-এর প্রতি সবচেয়ে বেশি ঘৃণা ও হিংসা পোষণকারী। রসূল (স)-এর প্রতি তাদের মতো আর কেউ জঘন্য আচরণ, শত্রুতা পোষণ এবং নির্যাতন করেনি। এ জন্য মহান রাব্বুল আলামীন তাদেরকে উদ্দেশ্য করেই সূরা লাহাব অবতীর্ণ করেন। সূরাটি তোমাদেরও মুখস্ত আছে–

'তাব্বাত ইয়াদা আবি লাহাবিউ ওয়া তাব্বা মা'আগনা আ'নহু মালুহু অমা কাছাবা ছায়ছলা নারান যাতা লাহাবিউ অ আমরা আতুহু হাম্মালাতাল হাতাবি ফি জিইদিহা হাবলুম মিম্মাছাদ।'

অর্থ– 'আবূ লাহাবের হাত দু'টি ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও, কোন কাজে আসেনি তার ধন-সম্পদ আর যা সে উপার্জন করেছে। অতিসত্ত্বর সে

www.pathagar.com

দগ্ধ হবে লেলিহান অগ্নিতে এবং স্ত্রীও যে ইন্ধন বহন করে। যার গলায় থাকবে খেজুরের রশি।'

এই সূরা নাযিল হওয়ার পর আবূ লাহাব ও উম্মে জামিল পুত্র ওতবাকে বলে, 'তুমি রুকাইয়া বিনতু মুহাম্মদকে তালাক না দিলে তোমার সাথে আমাদের ওঠা-বসা হারাম।' ওতবা মায়ের হুকুম পালন করার জন্য হযরত রুকাইয়া (রা)-কে তালাক দেয়। উল্লেখ্য যে, ওতবার সাথে কেবল আকদ হয়েছিল। তখনো বিয়ের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন হয়নি। তার আগেই তালাক হয়েছে।' (তবকাত, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৪)

অন্য বর্ণনায় আছে ইসলামের শত্রু একদল কোরাইশ ওতবার কাছে গিয়ে বলে, 'তুমি রুকাইয়া বিনতু মুহাম্মদকে তালাক দাও। তুমি কোরাইশের যে কোন রমণীকে বিয়ে করতে চাও, তাকেই তোমার সাথে বিয়ে দেবো। ওতবা তাদের এ পরামর্শ গ্রহণ করে বললো, সাঈদ ইবনুল আছ-এর কন্যাকে আমি বিয়ে করতে চাই, তাকে বিয়ে করিয়ে দাও আমার সাথে। এতে কোরাইশগণ আনন্দের সাথে রাযী হয়।

যাহোক– যারাই উদ্যোগী হোক ওতবা রুকাইয়াকে তালাক দিয়ে দেয়।

দ্বিতীয় বিবাহ ও ওসমান (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

হযরত রুকাইয়ার (রা) দ্বিতীয়বার বিয়ে হয় হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রা) সাথে। যিনি পরবর্তীকালে ইসলামের তৃতীয় খলীফা নির্বাচিত হয়েছিলেন। ওসমান (রা) তাঁর ইসলাম গ্রহণ ও রুকাইয়া (রা)-র সাথে বিয়ের ঘটনা নিজে এভাবে বর্ণনা করেছেন, 'আমি কা'বা শরীফের আঙ্গিনায় কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে বসেছিলাম। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি হঠাৎ উপস্থিত হয়ে জানায় যে, হযরত রসূল (স) তাঁর কন্যা রুকাইয়াকে আবূ লাহাবের পুত্র ওতবার নিকট বিয়ে দিয়েছেন। রূপ-সৌন্দর্য এবং ঈর্ষাযোগ্য গুণ-বৈশিষ্ট্যের জন্য হযরত রুকাইয়া মশহুর ছিলেন। এ কারণে তাঁর প্রতি আমার মনের টান ছিলো। এ খবর শুনে আমি বিচলিত হয়ে পড়ি এবং সোজা ঘরে চলে যাই। ঘরে ছিলেন আমার খালা সাওদাহ্। তিনি জ্যোতিষ বিদ্যায় দক্ষ ছিলেন। আমাকে দেখেই বলেন–

'ওসমান! তোমার জন্য সুসংবাদ। তোমাকে তিনবার সালাম। এরপর তিনবার, আবার তিনবার তোমাকে সালাম। এরপর একবার। এমনিভাবে দশবার সালাম পূর্ণ হউক। তুমি কল্যাণ লাভ করো এবং অকল্যাণ থেকে রক্ষিত হও। আল্লাহ্র শপথ, তুমি এক সতী রূপসী রমণীকে বিয়ে করবে। তুমিও

www.pathagar.com

বিবাহিত আর তোমার যিনি স্ত্রী হবেন তিনিও বিবাহিতা! সে হবে এক মহান মর্যাদাবান ব্যক্তির কন্যা। তাঁর মুখে এসব কথা শুনে আমি বিস্মিত হই। জিজ্ঞেস করি, খালা এসব কি বলছেন আপনি? জবাবে তিনি বলেন,

ওসমান, ওসমান, হে ওসমান!
লভিছ তুমি রূপ আর শান।
তিনি যে নবী ধারক বোরহান
ভেজিছে তায় মহান দাইয়্যান।
পেয়েছেন তিনি তানযীল কুরআন।
মানো তায়, ত্যাজ মূর্তি আওসান

আমি বুঝতে না পেরে বললাম একটু খুলে বলুন। তখন তিনি বললেন–

–মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ নিশ্চিত আল্লাহ্র রসূল! আল্লাহ্র কাছ থেকে এনেছেন তানজীল। তা দিয়ে ডাকেন আল্লাহ্র দিকে। চেরাগ তাঁর আসল চেরাগ। দীন তাঁর কল্যাণ। যখন শুরু হবে যুদ্ধ-বিগ্রহ, টেনে বের করা হবে তরবারী, বল্লম যখন উঁচিয়ে ধরা হবে, তখন শোরগোল হৈ-চৈ কোন কাজে আসবে না।

তাঁর এসব কথাবার্তা আমার মনে বিরাট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। আমি পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা করতে থাকি। আমি অধিকন্তু হযরত আবূ বকর-এর কাছে বসতাম। দু'দিন পর তাঁর কাছে যাই। তখন তিনি একা। কেউ নেই কাছে। আমি বিষণ্ন বদনে বসে থাকলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আজ এত চিন্তিত কেন? যেহেতু তিনি ছিলেন আমার বন্ধু, তাই আমি তাঁর কাছে আমার খালার বক্তব্যের সারকথা বললাম। তিনি বললেন, ওসমান! তুমি তো বুদ্ধিমান লোক। তুমি যদি হক ও বাতিলের পার্থক্য না কর, তা হবে অবাক হওয়ার কথা। তোমার জাতি যে মূর্তির পূজা করে, তা কি পাথরের তৈরি নয়? এগুলো না শুনতে পায়, না দেখতে পায়, না উপকার করতে পারে আর না পারে কোন ক্ষতি করতে।

আমি বললাম, আপনি যা বলছেন, একান্ত ঠিকই বলছেন। তিনি বললেন, তোমার খালা যা বলেছেন, আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, ঠিকই বলেছেন। মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ আল্লাহ্র রসূল। আল্লাহ্ তাঁকে প্রেরণ করেছেন তাঁর পয়গাম বান্দাদের নিকট পৌছাবার জন্য। তাঁর কাছে যাও, তিনি কি বলেন, শুনতে ক্ষতি কি ? তাঁর কথা শুনে নবীজীর কাছে যাই।' অপর এক বর্ণনায় দেখা যায়. এসব

www.pathagar.com

কথাবার্তার পর-নবীজী স্বয়ং হাযির হন। তিনি বললেন, 'ওসমান! আল্লাহ্ তোমাকে জান্নাতের দিকে ডাকছেন। তুমি তা গ্রহণ করো। আমি আল্লাহ্র রসূল। তোমাদের এবং গোটা মাখলুকের জন্য আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে।'

তাঁর এ কথাগুলোতে কি প্রভাব ছিল, তা আল্লাহই ভালো জানেন। আমি আর নিজেকে সংবরণ করতে পারিনি। অস্থির হয়ে আমি কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করে মুসলমান হই।'

হযরত ওসমান (রা) তখনকার সমাজে সৎ ও ভদ্র লোক হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন তৎকালীন মক্কার বিখ্যাত ধনকুবের। অর্থ- সম্পদের কোন গোনা গাঁথা ছিলনা। তার ধন-দৌলতের ব্যাপারে সারা পৃথিবীতে এখনো নানা কিংবদন্তী ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। তা'ছাড়া তিনি ছিলেন সবার কাছে সম্মানিত মানুষ। রসূল (স) তাই আপন কন্যা রুকাইয়া (রা)-কে এই শরীফ পাত্রের হাতে আনন্দের সাথে তুলে দেন। তাদের বিয়ে মক্কাতেই অনুষ্ঠিত হয়। [আল-এছাবাহ্- পৃষ্ঠা ৬২৮-২৯, মহিলা সাহাবী-নিয়ায ফতেহপুরী থেকে উদ্ধৃত]

রুকাইয়া (রা)-র ইসলাম গ্রহণ ও হিজরত

বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, রুকাইয়া (রা) তাঁর মা হযরত খাদীজা (রা)-র সাথে ইসলাম কবুল করেন। এরপর মক্কার অন্যান্য মহিলারা যখন রসূল (স)-এর কাছে বায়রাত হন তখন তাদের সাথে তিনিও বায়য়াত গ্রহণ করেন।

মক্কার কাফিরদের অত্যাচার বৃদ্ধি পেলে রসূল (স) মুসলমানদেরকে হাবশায় হিজরত করার অনুমতি দেন। এ সময় ওসমান (রা) রুকাইয়া (রা)-সহ হাবশয় হিজরত করেন। এটা নবুয়তের ৫ম সনের কথা। এ ব্যাপারে হযরত আসমা বিন্তু আবূ বকর (রা) বর্ণনা করেন, 'হযরত (স) এবং হযরত আবূ বকর (রা) গুহায় অবস্থান করেন এবং আমি সেখানে খাবার নিয়ে যেতাম। একবার হযরত ওসমান (রা) নবীজীর অনুমতি চান। তিনি হাবশায় হিজরত করার অনুমতি দেন। তাই তিনি হাবশায় হিজরত করে চলে যান। অতঃপর আমি খাবার নিয়ে গেলে নবীজী জানতে চান যে, ওসমান এবং রুকাইয়া গিয়েছে কি? আমি বললাম, জি, গিয়েছেন। তিনি আমার আব্বা হযরত আবূ বকরকে বললেন, লূত (আ) এবং ইবরাহীম (আ)-এর পর ওসমান প্রথম ব্যক্তি, যে কাফিরদের অত্যাচারের কারণে স্ত্রী-পরিজন নিয়ে দেশ ছেড়ে হিজরত করেছে।' [আল-এছাবাহ্ পৃষ্ঠা-৫৮২ তবকাত ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৪]

www.pathagar.com

হাবশায় কিছুদিন থাকার পর তারা একটা খবর পেলেন যে মক্কার কোরাইশগণ ইসলাম কবুল করেছে। অতএব মক্কা নগরীতে এখন মুসলমানদের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এ খবরে উৎসাহী হয়ে হযরত ওসমান (রা) নিজ পরিবার ও অন্যান্য কিছুসংখ্যক মুহাজিরসহ মক্কায় ফিরে আসেন। কিন্তু মক্কায়-ফিরে তারা জানতে পারলেন, তাদের শোনা খবর ছিল একটা গুজব। কারণ মক্কাবাসী কোরইশগণ তখনো গোমরাহীতে লিপ্ত আছে এবং মুসলমানদের ওপর-তাদের সর্বপ্রকার জুলুম-নির্যাতন পূর্বের মতই অব্যাহত রেখেছে। ফলে তারা পুনরায় হাবশায় হিজরত করতে বাধ্য হন।

এবার হাবশাতে তাঁরা অনেকদিন অবস্থান করেন। বিশেষ পরিস্থিতির কারণে মক্কার সাথে তাদের কোন যোগাযোগ ছিলো না। ফলে রসূল (স) দীর্ঘদিন মেয়ে-জামাইর কোন খোঁজ-খবর না পেয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। এ সময়ে হাবশা থেকে একজন মহিলা মক্কায় আসেন এবং তিনি খবর দেন যে, 'আমি তাদেরকে দেখে এসেছি। তারা ভাল আছেন।' এ সবংবাদ শুনে রসূল (স) বলেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উভয়ের প্রতি রহম করুন। ওসমান হচ্ছে প্রথম ব্যক্তি, যে পরিবার-পরিজন নিয়ে হিজরত করেছে।'

মদীনায় হিজরত

হাবশা অবস্থানেকালে হযরত ওসমান (রা) নির্ভরযোগ্য সূত্রে খবর পেলেন মদীনায় হিজরতের কথা। তখন তিনি স্ত্রী রুকাইয়া (রা) ও পুত্র আবদুল্লাহকে নিয়ে অন্যান্য কতিপয় মুহাজিরসহ মক্কা ফিরে আসেন এবং কয়েকদিন অবস্থানের পর রসূল (স)-এর অনুমতি নিয়ে মদীনায় হিজরত করেন। মদীনায় উপস্থিত হয়ে তিনি হযরত হাসান বিন সাবিত (রা)-এর ভাই আওস বিন সাবিত (রা)-এর গৃহে আশ্রয় নেন।

সন্তান-সন্ততি

হাবশা অবস্থানকালে হযরত রুকাইয়া (রা)-র একটি পুত্র সন্তান জন্ম- লাভ করে। তাঁর নাম রাখা হয়েছিল 'আবদুল্লাহ্। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওসমান (রা)-এর বয়স যখন ৬ বছর তখন একটি মোরগ হঠাৎ তাঁর চোখে ঠোকর মারে। ফলে তাঁর সমস্ত মুখমন্ডল ফুলে যায়। এ কারণেই হিজরী চতুর্থ হিজরীর জমাদিউল আওয়াল মাসে তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁর-জানাযার নামায পড়ান

www.pathagar.com

খোদ রসূল (স)। হযরত ওসমান (রা) নিজে প্রাণাধিক পুত্রকে কবরে নামান। এরপর রুকাইয়া (রা)-র আর কোন সন্তান হয়নি। এই হযরত আবদুল্লাহ (রা)-র কারণে ওসমান (রা)-র কুনিয়াত বা ডাক নাম হয় আবূ আবদুল্লাহ।

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক

হযরত রুকাইয়া (রা) ও তাঁর স্বামী হযরত ওসমান (রা)-এর মধ্যে সম্পর্ক এত মধুর ও গভীর ছিলো যে, তাঁদের সম্পর্কের ব্যাপারটি সমগ্র আরবে কিংবদন্তীতে পরিণত হয়। লোকেরা কথায় কথায় উদাহরণ হিসাবে বলতেন, 'রুকাইয়া (রা) ও ওসমান (রা)-এর চেয়ে উত্তম দম্পত্তি কখনো দেখিনি।'

অবয়ব ও গঠন

রুকাইয়া (রা)-র শারিরীক গঠন ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয়। জুরকানী বলেন, তিনি খুবই রূপবতী ছিলেন। আদ-দুররুল মানসূর গ্রন্থের ২০৭ পৃষ্ঠায় তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে, 'তিনি ছিলেন অতি রূপসী রমণী। হাবশার একটা দল তাঁর রূপ-সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে বিস্ময় প্রকাশ করতো। এরা তাঁকে খুব কষ্ট দেয়। তিনি তাদের জন্য বদদোয়া করলে সকলেই ধ্বংস হয়ে যায়।'

ইন্তেকাল

দ্বিতীয় হিজরীতে রুকাইয়া (রা)-র গায়ে বসন্ত বের হয়। সময়টা ছিলো মুসলমানদের জন্য খুবই বিপদসঙ্কুল। কারণ এ সময়ে খবর আসে মক্কার কাফিরগণ মদীনা আক্রমণের জন্য অগ্রসর হচ্ছে। ফলে রসূল (স) যুদ্ধ-যাত্রার জন্য প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি ওসমান (রা)-কে মদীনায় থেকে রুকাইয়া (রা)-র চিকিৎসা ও সেবা-যত্ন করার নির্দেশ দেন এবং তিনি যুদ্ধে গমন করেন। তিনি তাঁকে এও জানান যে, এর ফলে আল্লাহ পাক ওসমানকে জিহাদে অংশগ্রহণের সওয়াবও দেবেন, এমনকি গণীমতের মালের অংশও সে পাবে। এই যুদ্ধ মদীনার নিকটবর্তী বদরপ্রান্তরে অনুষ্ঠিত হয়। এ জন্য এই যুদ্ধকে বদর যুদ্ধ বলে। যুদ্ধে মুসলমানরা জয়ী হয়। কিন্তু হযরত রুকাইয়া (রা) আল্লাহ্‌র ডাকে সাড়া দিয়ে মাত্র ২১ বছর বয়সে ঐ বসন্ত রোগের তীব্রতার কারণে ইন্তেকাল করেন। তাঁর লাশ যখন কবরে নামানো হয়, ঠিক তখন যায়েদ বিন হারিছা (রা) বদর যুদ্ধের বিজয়ের খবর নিয়ে মদীনায় হাযির হন।

www.pathagar.com

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, 'নবীজী ফিরে এলে তাঁকে হযরত রুকাইয়া (রা)-র ইন্তেকালের খবর দেয়া হয়। তখন তিনি বলেন, 'ওসমান বিন মাজউন চলে গেছেন। এখন তুমিও তাঁর সঙ্গে গিয়ে মিলিত হও।'

এই ওসমান বিন মাজউন (রা) ছিলেন একজন বিশিষ্ট সাহাবী। যিনি মদীনায় হিজরতের পর মুহাজিরদের মধ্যে প্রথম ইন্তেকাল করেন।

রসূল (স)-এর কথা শুনে মহিলারা কাঁদতে লাগলো। এ অবস্থা দেখে হযরত ওমর (রা) তাদেরকে কাঁদতে নিষেধ করেন। তখন রসূল (স) বলেন, 'ওমর! তাদেরকে কাঁদতে দাও। কারণ, কান্নার সম্পর্ক যখন অন্তর এবং চোখের সাথে থাকে, তখন এটা হয় আল্লাহ্‌র রহমতের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর যখন এর সম্পর্ক হাত এবং মুখের সাথে থাকে তখন একে শয়তানী প্ররোচনা মনে করবে।' (তবকাত ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৪)

হযরত ফাতিমাতুজ জোহরা (রা) মেজ বোন হযরত রুকাইয়া (রা)-র কবরের কাছে উপস্থিত হয়ে চোখের পানি ছেড়ে কাঁদতেছিলেন। এ সময় রসূল (স) তাঁর পবিত্র চাদরের কোণা দিয়ে ফাতিমা (রা)-র চোখের পানি মুছে দেন।

হযরত রুকাইয়া (রা)-কে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়। তিনি ছিলেন সেই সৌভাগ্যবতী মহিলা যিনি ও তাঁর স্বামী ইসলামের জন্য প্রথম হিজরত করেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা কাফিরদের অত্যাচারের কারণে একবার নয়, দুইবার নয়, তিন তিনবার হিজরত করেন। আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন তাঁর ওপর রহমত নাযিল করুন।

www.pathagar.com

উম্মে কুলসুম (রা)

তাঁর নাম উম্মে কুলসুম। রসূল (স)-এর তৃতীয় কন্যা। বংশ লতিকা হলো উম্মে-কুলসুম বিনতু মুহম্মদ (স) ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব। মায়ের নাম হযরত খাদিজা (রা)। এদিক দিয়ে বংশ লতিকা হলো- উম্মে কুলসুম বিনতু খাদিজা (রা) বিনতু খুয়াইলিদ ইবনে আসাদ ইবনে আবদল ওযযা ইবনে কুসাই। তিনি হযরত রুকাইয়া (রা)-র ছোট ছিলেন এবং হযরত ফাতিমাতুজ জোহরা (রা)-র বড় ছিলেন।

জন্ম

তিনি নবুয়তপ্রাপ্তির ৬ বছর আগে জন্মগ্রহণ করেন বলে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন। এর কারণ হিসাবে উল্লেখ করা যায় যে, হযরত রুকাইয়া (রা) নবুয়তপ্রাপ্তির ৭ বছর আগে জন্মগ্রহণ করেন। অপরদিকে সবার ছোট হযরত ফাতিমা (রা) নবুয়তপ্রাপ্তির ৫ বছর আগে জন্মগ্রহণ করেন। আর একথা যদি সত্য হয় তা হলে উম্মে কুলসুমের জন্ম নবুয়তপ্রাপ্তির ৬ বছর পূর্বে মেনে নেয়া ছাড়া উপায় থাকে না।

বিবাহ

একান্ত শিশু বয়সে নবুয়তপ্রাপ্তির আগেই ইসলামের প্রধান শত্রু আবূ লাহাবের পুত্র উতাইবার সাথে তার বিয়ে হয়। এই আবূ লাহাবের অপর পুত্র ওতবার সাথে তার মেজ বোন রুকাইয়া (রা)-র বিয়ে একই সময়ে হয়। কিন্তু আবূ লাহাব ও তার স্ত্রী উম্মু জামিলের ইসলাম ও রসূল (স)-এর বিরুদ্ধে জঘন্য কার্যকলাপের ফলস্বরূপ যখন সূরা লাহাব নাযিল হয় তখন তারা স্বামী-স্ত্রী তাদের পুত্রদ্বয়কে ডেকে বলে, 'তোমরা যদি মুহাম্মদের কন্যাকে তালাক না দাও তাহলে তোমাদের সাথে আমাদের ওঠা-সবা হারাম।' তখন হতভাগ্য জাহান্নামী পিতা-মাতার পুত্রদ্বয়-ওতবা হযরত রুকাইয়া (রা)-কে এবং উতইবা হযরত উম্মে কুলসুম

www.pathagar.com

(রা)-কে তালাক দেয়। উল্লেখ্য যে রুকাইয়া (রা) ও উম্মে কুলসুম (রা)-এর বিয়ে হলেও তখনো রুকসাত অনুষ্ঠান অর্থাৎ উঠিয়ে নেয়া হয়নি।

দ্বিতীয় হিজরীতে হযরত রুকাইয়া (রা) বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করলে হযরত ওসমান (রা) নিঃসঙ্গ ও বিমর্ষ হয়ে পড়েন। তাঁর এমন অবস্থা দেখে রসূল (স) বললেন, 'তোমাকে দুঃখিত ও বিষণ্ন দেখতে পাচ্ছি, এর কারণ কি?' তিনি বললেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার ওপর এমন বিপদ এসেছে, যা হয়তো আর কারো ওপর আসেনি। হযরতের কন্যার ইন্তিকালে আমার কোমর ভেঙে গেছে। আল্লাহ্‌র রসূলের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছুটে গেছে। এখন আমি কি করি?' হযরত ওসমান (রা) কথা শেষ না করার আগেই রসূল (স) বললেন, 'হযরত জিব্রাঈল (আ) আমাকে আল্লাহ্ তা'আলার দরবার থেকে খবর দিয়েছেন আমার কন্যা উম্মে কুলসুমকে রুকাইয়ার মহরানায় তোমার কাছে বিয়ে দেয়ার জন্য।' (উসদুল গাবাহ্ পৃঃ ৬১২)

সে অনুযায়ী হযরত ওসমান (রা)-এর সাথে উম্মে কুলসুম (রা)-এর বিয়ে তৃতীয় হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসে সম্পন্ন হয়। বিয়ের দু'মাস পর উম্মে কুলসুম (রা)-কে তুলে নেয়া হয়।

অন্য এক বর্ণনায় আছে হযরত রুকাইয়ার মৃত্যুর পর হযরত ওসমান (রা) যখন নিঃসঙ্গ ও বিষণ্ন মনে দিন কাটাচ্ছিলেন তখন হযরত ওমর (রা) তাঁর বিধবা কন্যাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেন। ওসমান (রা) আপতত বিয়ে করবেন না বলে জানিয়ে দেন। বিষয়টি রসূল (স)-এর কানে গেলে তিনি হযরত ওমর (রা)-কে বললেন, 'আমি তোমাকে হাফছা (রা)-র জন্য ওসমান (রা)-এর থেকেও উত্তম ব্যক্তির সন্ধান দিচ্ছি এবং ওসমান (রা)-এর জন্য ভালো সম্পর্কের কথা বলছি। অতঃপর তিনি বললেন, আমার সঙ্গে হাফছার বিয়ে দাও এবং আমি আমার কন্যার বিয়ে ওসমানের (রা) সঙ্গে সম্পাদন করছি। রুকাইয়া (রা)-র মৃত্যুর পর সে খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্থ আছে।'

রসূলের প্রস্তাবে হযরত ওমর (রা) সংগে সংগে রাযি হয়ে গেলেন। সে মুতাবিক রসূলের সঙ্গে হযরত হাফছা (রা) এবং ওসমান (রা)-র সংগে উম্মে কুলসুম (রা)-এর বিয়ে হয়।

www.pathagar.com

ইসলাম গ্রহণ ও হিজরত

উম্মে কুলসুম (রা) তাঁর মা হযরত খাদীজা (রা)-র সাথে ইসলাম কবুল করেন। মক্কাবাসী অন্যান্য মহিলারা রসূল (স)-এর নিকট বায়য়াত হতে আসলে উম্মে কুলসুমও তাদের সাথে বায়য়াত গ্রহণ করেন।

রসূল (স) পরিবার-পরিজনকে মক্কায় আল্লহ্‌র জিম্মায় রেখে বন্ধু আবূ বকর (রা)-কে সাথে নিয়ে হিজরত করেন। শিকার হাত ছাড়া হওয়ার কারণে কোরাইশ কাফিরগণ আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং মুসলমানদের ওপর অত্যাচারের মাত্রা শতগুণে বাড়িয়ে দেয়। মক্কার অবস্থা সংগীন হয়ে পড়লে হযরত সাওদা (রা), হযরত ফাতিমা (রা)-সহ পরিবারের অন্যান্য সদস্য-সদস্যাদের সাথে তিনিও হিজরত করেন।

ইন্তেকাল

বিয়ের ৬ বছর পর হিজরী সনের শাবান মাসে উম্মে কুলসুম (রা) ইন্তেকাল করেন। রসূল (স)-এর নির্দেশে হযরত আসমা বিনতু আমিস (রা) হযরত সুফিয়া বিনতু আবদুল মুত্তালিব (রা) এবং হযরত উম্মে আতিয়া (রা) তাঁকে গোসল করান। রসূল (স)-এর পবিত্র চাদর দিয়ে তাঁর-কাফন দেয়া হয়। তাঁর নামাযে জানাযা পড়ান রসূল (স) নিজে। জানাযার পর হযরত আলী (রা), আবূ তালহা (রা), উসমান (রা) এবং ফজল বিন আব্বাস (রা) কবরে নামেন। তাকে মদীনার জান্নাতুল বাকী নামক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

হযরত আনাস বিন মালিক (রা) বলেন, 'যে সময় সাইয়েদা উম্মে কুলসুম (রা)-কে কবরে নামানো হলো তখন হুজুর (সা) কবরের নিকট উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁর চক্ষু দিয়ে অঝোর ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিলো।

রসূল (স) উম্মে কুলসুম (রা)-এর মৃত্যুর পর বলেন, 'আমার দশটা কন্যা থাকলে আমি একের পর এক ওসমান (রা)-এর সাথে বিয়ে দিতাম।' অন্য বর্ণনায় আছে রসূল (স) বলেছিলেন, 'আমার একশো কন্যা থাকলে আমি এক এক করে ওসমানের সাথে বিয়ে দিতাম।'

উম্মে কুলসুম (রা) ও ওসমান (রা)-এর বিবাহিত জীবন ছিল খুবই মধুর। তাদের ৬ বছরের দাম্পত্য জীবনে কোন সন্তান হয়নি। অর্থাৎ হযরত উম্মে কুলসুম (রা) ছিলেন নিঃসন্তান।

www.pathagar.com

হযরত ইব্রাহিম (রাঃ)

হযরত মারিয়া কিবতিয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে রসূল (সা.)-এর অন্যতম পুত্র সন্তান ইব্রাহীম। আওয়ালী নামক স্থানে হিজরী ৮ম সালে তাঁর জন্ম হয়। এখানেই মারিয়া (রা.) বাস করতেন। এখানে ইব্রাহীমের জন্ম হওয়ার কারণে স্থানটি 'মাশরাবাই ইব্রাহীম' নামে পরিচিতি লাভ করে। ইব্রাহীমের জন্মকালে ধাত্রী নিযুক্ত ছিলেন প্রখ্যাত সাহাবী আবূ রাফের পত্নী বিবি সালমা। তিনি যখন রসূল (সা.)-এর দরবারে হাজির হয়ে পুত্র সন্তান হওয়ার শুভ সংবাদটি দেন তখন রসূল (সা.) খুশি হয়ে তাকে একজন গোলাম দান করেন।

হযরত ইব্রাহীমের জন্মের সংবাদে রসূল (সা.) খুব খুশি হন। সাতদিনের দিন তাঁর আকীকা দেয়া হয় এবং মাথা মুড়িয়ে চুলের ওজন পরিমাণ রূপা গরীবদের মাঝে দান করে দেন। এ দিনেই মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর নামে তাঁর নামকরণ করা হয় ইব্রাহীম।

সদ্য প্রসূত শিশু ইব্রাহীমকে দুধ পান করানোর জন্য অনেক আনসার মহিলায় প্রার্থী হন। শেষমেষ খাওলা বিনতু জায়দুল আনসারীকে দাই নিযুক্ত করেন। এ জন্য রসূল (সা.) তাকে কয়েকটি ফলবান খেজুর গাছ দান করেন।

খাওলা বিনতু যায়দুল উম্মে রাফে নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি তাঁর স্বামী বারা বিন আউদু'র সাথে মদীনার উপকণ্ঠে বাস করতেন। বারা পেশায় ছিলেন কর্মকার। এ জন্য তার বাড়ি প্রায়ই ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন থাকতো। তবু রসূল (সা.) সন্তানের টানে প্রায়স সেখানে যেতেন এবং ইব্রাহীমের খোঁজ খবর নিতেন।

সতের আঠার মাস বয়সের সময়ে হযরত ইব্রাহীম ধাত্রী মাতা খাওলার গৃহেই ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে রসূল (সা.) সাহাবী আবদুর রহমানসহ সেখানে ছুটে যান। হাত বাড়িয়ে মৃত ইব্রাহীমকে কোলে তুলে নেন। আর তখনি রসূল (সা.)-এর দু'চোখ দিয়ে বাধ ভাঙা জোয়ারের মত পানি নেমে আসে। আবদুর রহমান আরজ করেন, ইয়া রসূলুল্লাহ (সা.)! আপনার অবস্থা এমন কেন? রসূল (সা.) বলেন, 'আজ আমার অপত্য স্নেহ অশ্রু বিন্দু হয়ে ঝরে পড়ছে।'

ইব্রাহীমের মৃত্যুর দিন ঘটনাক্রমে সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। সকলে বলাবলি করতে লাগলো যে, রসূল (সা.)-এর পুত্র মারা গেছে বলেই আজ সূর্যগ্রহণ হয়েছে। তারা

www.pathagar.com

বলতে লাগলো, 'আকাশ শোকাভিভূত হয়ে পড়েছে, সে জন্যই দুনিয়ায় বিদঘুটে অন্ধকার নেমে এসেছে।' কিন্তু সংস্কারক রসূল (সা.) যখন এ সংবাদ শুনলেন তখনই তিনি এ কুসংস্কারের মূলৎপাটন করার জন্য সবাইকে ডেকে বললেন, 'সূর্যগ্রহণ এবং চন্দ্রগ্রহণ হচ্ছে আল্লাহ্‌র নির্দশন। কারো জীবন ও মরণের সঙ্গে এগুলোর কোনই যোগাযোগ নেই। সুতরাং গ্রহণ লাগা বা না লাগার পেছনে কারো মৃত্যুর কোন সম্বন্ধ নেই।'

ইব্রাহীমের লাশ ছোট একটা খাটিয়ায় করে আনা হয়। রসূল (সা.) নিজে আপন পুত্রের জানাযা পড়ান। তারপর তাঁকে বিশিষ্ট সাহাবী উসমান বিন মাযউতনের কবরের পাশে দাফন করা হয়। তাঁর লাশ কবরে নামান হযরত উসামা ও ফযল বিন আব্বাস। রসূল (সা.) দাফন শেষ হওয়া পর্যন্ত সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন। পরে কবরের ওপর সামান্য পানি ছিটিয়ে দেয়া হয় এবং নির্দিষ্ট চিহ্ন দিয়ে কবরটিকে চিহ্নিত করা হয়।

www.pathagar.com

হযরত সাওদা (রা.)

তাঁর নাম সাওদা। পিতার নাম জামআ। তাঁর বংশ লতিকা এইরূপ সাওদা বিনতু জামআ বিন কায়েস বিন আবদে শামস বিন আবদ বিন নাসর বিন মালেক বিন হাসল বিন আমের ইবনে লুয়াই। তাঁর মাতার নাম ছিল শামুস বিনতু কায়েস বিন যায়েদ বিন আমর বিন লবিদ বিন আমের বিন গনম বিন আদী বিন আন নজ্জার। মাতা শামুস ছিলেন মদীনার নজ্জার বংশের মেয়ে।

সাওদা ৫৭৪ খৃষ্টাব্দের দিকে আরবের বিখ্যাত কুরাইশ বংশের একটি প্রসিদ্ধ শাখা লুওয়াই বিন আমের গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন।

সাওদা (রা.) ছিলেন রসূলুল্লাহ (সা.)-এর দ্বিতীয় স্ত্রী, উম্মেহাতুল মু'মীনীনদের নেতৃস্থানীয়া। হযরত খাদীজার ইন্তেকালের পর তিনিই সর্বপ্রথম রসূল (সা.)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং সংসারের হাল ধরেন।

হযরত সাওদা (রা.)-প্রথম বিয়ে হয় তাঁর পিতার চাচাত ভাই সাকরান বিন আমরের সাথে। ইসলামের সূচনা লগ্নেই তারা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে আত্মীয়-স্বজনের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও ইসলাম কবুল করেন। শুধু তাই নয়, তাদের নিকটাত্মীয়দের জুলুম-অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তাঁরা রসূল (সা.)-এর পরামর্শ অনুযায়ী আবিসিনিয়া হিজরত করেন। এই আবিসিনিয়াতেই তাদের একমাত্র সন্তান আবদুর রহমান জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে আবদুর রহমান হালুলার যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।

সাকরান দম্পতি আবিসিনিয়া থেকে মক্কায় ফেরার কিছুদিন পরই সাকরান ইন্তিকাল করেন। সাকরানের মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন আগে সাওদা (রা.) স্বপ্নে দেখেন, 'নবী (সা.) আগমন করে তাঁর কাঁধে কদম (পা) মোবারক স্থাপন করেছেন।' তিনি স্বামী সাকরান (রা.)-কে বলেন, 'তুমি সত্যই এ স্বপ্ন দেখে থাকলে খোদার শপথ আমি মারা যাবো এবং নবীজী তোমাকে বিয়ে করবেন।' সাওদা (রা.) পুনরায় স্বপ্ন দেখেন যে, 'তিনি তাকিয়া হেলান দিয়ে বসে আছেন, আকাশের চাঁদ ছুটে এসে তাঁর মাথায় পড়ছে।' এ স্বপ্ন সম্পর্কেও সাকরানকে অবহিত করলে তিনি বলেন, 'আমি খুব সহসা মারা যাবো এবং আমার পরে তুমি বিয়ে করবে।' সাকরান (রা.) সে দিনই অসুস্থ হন এবং কয়েকদিনের মধ্যেই ইন্তিকাল করেন। (যরকানী ৩য় খণ্ড)

www.pathagar.com

স্বামী সাকরানের মৃত্যুর পর শিশুপুত্র আবদুর রহমানকে নিয়ে সাওদা (রা.) অত্যন্ত আসহায় অবস্থায় দিন যাপন করতে থাকেন। মুসলমান হওয়ার কারণে আত্মীয়-স্বজনরাও তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসেনি। এ সময়ে একান্ত অনন্যোপায় হয়ে তিনি শিশুপুত্রসহ রসূল (সা.)-এর এক দূর-সম্পর্কীয় খালা খাওলার বাড়িতে আশ্রয় নেন। খাওলার আবস্থাও অস্বচ্ছল ছিল। তবু ধৈর্য, সংযম ও পবিত্রতার মূর্ত প্রতীক সাওদা অভাব-অনটনের মধ্যে দিয়েই আল্লাহ্ পাকের রেজামন্দি হাসিলের চেষ্টা করে যেতে লাগলেন।

পৃষ্ঠপোষক চাচা আবূ তালিবের মৃত্যু, সর্বোপরি হযরত খাদীজার মৃত্যুতে রসূল (সা.) খুবই মনকষ্টের মধ্য দিয়ে দিন যাপন করছিলেন। মা হারা মাসুম বাচ্চা উম্মে কুলসুম ও ফাতিমাকে নিয়েই বেশি চিন্তার মধ্যে ছিলেন তিনি। এমন কি ঘরের যাবতীয় কাজকর্ম রসূল (সা.)-কে নিজ হাতেই সম্পাদন করতে হচ্ছিল। যা একজন পুরুষ মানুষের জন্য ছিল সত্যিই কষ্টসাধ্য। প্রকৃতপক্ষে সংসারে এ অব্যবস্থাপূর্ণ শোচনীয় পরিস্থিতিতে, সন্তানদের লালন-পালনের জন্য রসূল (সা.)-এর একজন জীবন সংগিনীর জরুরী প্রয়োজন ছিল। মূলত খাদীজাবিহীন নবীর সংসার জীবন অনেকটা মাঝিবিহীন নৌকার মত বেসামাল অবস্থায় পৌঁছেছিল।

রসূল (সা.)-এর সংসারের এ দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে একদিন তাঁর খালা উসমান বিন মযউন-এর স্ত্রী খাওলা বিনতে হাকীম নবীগৃহে এসে দেখেন যে— রসূল (সা.) নিজ হাতে থালা-বাসন পরিষ্কার করছেন। তখন তিনি রসূল (সা.)-কে উঠিয়ে দিয়ে নিজে সেগুলো পরিষ্কার করেন এবং বিনীতভাবে রসূল (সা.)-কে বললেন, 'ইয়া রসূল্লাহ্ খাদীজার ইনতিকালে আপনাকে অত্যন্ত বিষণ্ন দেখছি।' হযরত বললেন, 'ঠিক! ব্যাপার তো তাই।' তখন খাওলা বললেন, 'ইয়া রসূলুল্লাহ! বর্তমানে আপনার সংসারে একজন পরিচর্যাকারিণীর প্রয়োজন। সুতরাং আপনি যদি অনুমতি করেন তাহলে সাওদা বিনতু জামআর সাথে আপনার বিয়ে দিতে পারি। সাওদা খুবই নিরীহ ও অসহায়। তাঁর স্বভাব-চরিত্র ও সহিষ্ণুতার যে পরিচয় আমি পেয়েছি, এতে তাঁর মত একজন রমণী আপনার গৃহে আসলে আপনার কষ্ট অনেকাংশে লাঘব হবে। সাওদা আপনার সংসারকে সুন্দররূপে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।' নবী করীম (সা.) এ প্রস্তাবে রাজি হলেন এবং ঐ দিনই খাওলা সাওদাকে সুসংবাদ শুনান। সাওদা তা কবুল করলে খাওলা জামআর নিকট বিয়ের প্রস্তাব পেশ করলেন। জামআ খৃষ্টান ছিলেন তবু তিনি বললেন, 'কোরেশ বংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষের সঙ্গে আমার মেয়ে বিয়ে দিতে আমি রাজি আছি।'

www.pathagar.com

সাওদা ও তাঁর পিতা বিয়েতে রাজি হওয়ায় রসূল (সা.) নিজে জামআর বাড়িতে উপস্থিত হলেন। চারশত দিরহাম মোহরানা ধার্য করে সাওদার পিতা নিজে খুতবা প্রদান করে বিয়ে পড়ান। কিন্তু সাওদার ভাই আবদুল্লাহ এই বিয়ের খবর জানার পর প্রচণ্ড অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এমন কি নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে মাথা, কপালে ধুলাবালি মাখিয়ে বলেছিলেন, 'হায় কি সর্বনাশ হলোরে ?' পরে যখন তিনি ইসলাম কবুল করেন তখন তার এ জঘন্য উক্তির জন্য সব সময় আফসোস করতেন।

বিয়ের পর পরই সাওদা রসূল (সা.)-এর সংসারে চলে আসেন এবং বাচ্চাদের লালন-পালনসহ গৃহের সব দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে নেন। ফলে রসূল (সা.) যে অসহনীয় যন্ত্রণার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন তা থেকে পরিত্রাণ লাভ করেন এবং ইসলাম প্রচারে মনোনিবেশ করেন।

রসূল (সা.) ও সাওদার যখন বিয়ে হয় তখন রসূল (সা.)-এর বয়স ৫১ বছর আর সাওদা (রা.)-র বয়স ৫৫ বছর। এর কাছাকাছি সময়েই রসূল (সা.) হযরত আয়েশা (রা.)-কে বিয়ে করেন। এ সময় আয়েশা (রা.)-র বয়স ছিল ৯ বছর। আয়েশা (রা.) বিয়ের ৩ অথবা ৪ বছর পর রসূল (সা.)-এর সংসারে আসেন। এই অসম বয়সের বিয়ের ব্যাপারে অর্থাৎ বৃদ্ধা ও শিশুকে বিয়ে করার ব্যাপারে ইসলাম বিরোধী ঐতিহাসিকদের কেউ কেউ সমালোচনামুখর হওয়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু রসূল (সা.) ছিলেন সর্ব মানবতার বন্ধু। ইচ্ছে করলে তিনি খাদীজার মৃত্যুর পরও আরবের সেরা সুন্দরী যুবতীদের যে কাউকে বিয়ে করতে পারতেন কিন্তু তিনি তা করেন নি। তিনি সম্পূর্ণ বৃদ্ধা একজন মহিলাকে বিয়ে করলেন। কারণ সাওদা ছিলেন একজন অসহায়া বিধবা। ইসলাম গ্রহণের কারণে তাঁর আত্মীয়-স্বজন তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। রসূল (সা.) এই সহায়হীন মুসলিম মহিলার কল্যাণের চিন্তা করেই তাঁকে বিয়ে করেছিলেন। অপরদিকে তাঁর শিশু কন্যা উম্মে কুলসুম ও ফাতিমা'র কথা চিন্তা করেও তিনি বৃদ্ধা সাওদাকে ঘরে তুলে নেন।

কিশোরী আয়েশাকে রসূল (সা.)-এর বিয়ে করার ব্যাপারে কথা হচ্ছে— আরবে জাহেলী যুগে প্রচলিত ছিল আরবরা কথিত ভাইয়ের মেয়ের সংগে কোন বিয়ের সম্পর্ক করতো না। রসূল (সা.) ও আয়েশা (রা.)-র বিয়ে সেই কুসংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত হানলো। তা'ছাড়া এ বিয়েটা হয়েছিল মূলত আল্লাহ্‌র-ই নির্দেশে।

হযরত সাওদা (রা.) ছিলেন দীর্ঘাঙ্গী ও সুন্দরী। তাঁর দৈহিক গঠন ছিল চমৎকার। তবে তিনি একটু মোটা ধরনের ছিলেন, যে কারণে দ্রুত চলাফেরা করতে কষ্ট হত। এজন্য তিনি বিদায় হজ্জের সময় মুজদালেফা থেকে রওয়ানা

www.pathagar.com

হওয়ার নির্দিষ্ট সময়ের আগেই রওয়ানা হতে চেয়েছিলেন কিন্তু মহানবী (সা.) তা অনুমোদন করেন নি। শেষ পর্যন্ত রসূল (সা.)-এর সাথেই তাঁকে রওয়ানা হতে হয়। একদিন প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার জন্য ভোররাতে খোলা মাঠের দিকে (তখনো পর্দার আয়াত নাযিল হয়নি) সাওদা গমন করেন। ফেরার পথে হযরত ওমর (রা.) তাকে চিনে ফেলেন। হযরত ওমর (রা.) তাঁকে তখন বলেন, 'আমি তোমাকে চিনে ফেলেছি।' বিষয়টি সাওদা (রা.) ও ওমর (রা.) কেউই পছন্দ করেন নি। যে কারণে বিয়য়টি নিয়ে তাঁরা রসূল (সা.)-এর সাথে আলাদা আলাদাভাবে আলোচনা করেন। এর পর পরই পর্দার আয়াত নাযিল হয়।

রসূল (সা.) বিদায় হজ্জের পর আযওয়াজে মোতাহহারাতকে বলেন, 'অতপর আর ঘরের বাইরে যাবে না।' হযরত আবূ হোরায়রা (রা.) থেকে জানা যায় নবী (সা.)-এর ওফাতের পরও অন্যান্য স্ত্রীরা হজ্জ করেন। কিন্তু সাওদা বিনতু জামআ ও যয়নব বিনতু জাহাশ এ নির্দেশটি এমন কঠোরভাবে মেনে চলেন যে আর ঘরের বাইরে যাননি। তিনি বলতেন, 'আমি হজ্জ করেছি, ওমরাহ্ করেছি। এখন আল্লাহ্র নির্দেশ মত ঘরে বসে কাটাবো।'

সাওদা (রা.) যখন রসূল (সা.)-এর ঘরণী হয়ে আসেন তখন তাঁর ওপর শত্রুদের পক্ষ থেকে নানা ধরনের অত্যাচার-নির্যাতন নেমে এসেছিল। হযরত সাওদা স্বামীর এ দুঃখ-কষ্ট ও মর্মযাতনার বিষয় উপলব্ধি করে সর্বদা তাঁর কষ্ট লাঘবের চেষ্টা করতেন। হযরত খাদীজার মতই সাওদা তাঁর বুদ্ধি-বিবেচনা দিয়ে স্বামীর সংকটকালের মোকাবিলা করেছেন। নিঃসন্দেহে সাওদাহ্ (রা.) এসব ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠস্থানীয়া ছিলেন।

সাওদা (রা.) নবী নন্দিনী উম্মে কুলসুম ও ফাতিমাকে এমনভাবে লালন-পালন করেন যে, তাঁরা কোন দিনই তাদের মায়ের অভাব টের পায়নি। তিনি হযরত আয়েশা (রা.)-কে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। রসূল (সা.)-এর ঘরে আসার পর সাওদা (রা.) নিজেই আয়েশার সকল সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করেন। এমনকি নিজের অংশেরটাও অনেক সময় তাঁকে ভোগ করতে দেন। এ জন্যই আয়েশা (রা.) তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন, 'আমি কেবল একজন মহিলার কথাই জানি, যার অন্তরে হিংসার ছোঁয়াচ মোটেই পড়েনি। তিনি হলেন বিবি সাওদা। কতইনা ভাল হত যদি আমার অন্তর তার দেহে স্থান লাভ করত।'

স্বল্প ভাষিণী, মধুর আচরণকারিণী, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্না পতিপ্রাণা নারী ছিলেন হযরত সাওদা (রা.)। অতিথিপরায়ণতা ও দানশীলতার জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি সর্বমোট ৫টি হাদীস বর্ণনা করেন। এর মধ্যে বুখারী শরীফে একটি

www.pathagar.com

হাদীস উল্লেখ আছে। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস, ইয়াহইয়া বিন আবদুর রহমান বিন আস, আদ বিন জাররার মত বিখ্যাত সাহাবীরা তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

একবার হযরত ওমর (রা.) উপহারস্বরূপ একটি থলে ভর্তি দিরহাম সাওদা (রা.)-র নিকট পাঠালেন। সাওদা (রা) থলে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'এর ভেতর কি আছে?' বলা হল, 'দিরহাম।' এ কথা শুনে সাওদা (রা.) বললেন, 'খেজুরের থলেতে কি দিরহাম শোভা পায়।' এই বলে তিনি সমস্ত দিরহাম গরীব মিসকিনের মধ্যে বিলি করে দিলেন।

সাওদা (রা) ছিলেন বেশ রসিক মহিলা। মাঝে মাঝে তিনি এমন এমন রসিকতাপূর্ণ কথা কলতেন যে, রসূলও (সা.) হেসে ফেলতেন। একবার তিনি রসূল (সা.)-কে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'কাল রাতে আমি আপনার সাথে নামায পড়ছিলাম। আপনি রুকূতে এত দেরি করছিলেন যে, আমার সন্দেহ হয়েছিল নাক ফেটে রক্ত ঝরবে। এই কারণে আমি আমার নাক অনেকক্ষণ টিপে ধরেছিলাম।' রসূল (সা.) এ কথা শুনে মুচকি হাসলেন।

হযরত সাওদা (রা.) সেই উদার মহিলা তিনি সপত্নী বিবি আয়েশার জন্য ছাড় দিতে গিয়ে রসূল (সা.)-এর খেদমতে বলেছিলেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.) আমার জন্য যে রাত আপনার সান্নিধ্যে থাকা বরাদ্দ আছে, সেই রাতটুকু আমি বিবি আয়েশকে দান করলাম। সে কুমারী, আল্লাহ পাক আপনার সান্নিধ্য ও সাহচার্য দ্বারা তাকে অধিক উপকৃত করুন, এটাই আমার কামনা।' রসূল (সা.) তা শুনে অত্যন্ত খুশি হয়ে বললেন, 'সাওদা! প্রকৃতই তুমি অনন্যা।'

কতখানি উদার ও মহৎ হৃদয়ের মানুষ হলে এটা সম্ভব? সম্ভবত সাওদা (রা.) বলেই তা সম্ভব হয়েছিল।

রসূল(সা.)-এর ঔরসে হযরত সাওদা (রা.)-এর গর্ভে কোন সন্তান জন্মলাভ করেনি। প্রথম স্বামী সাকরানের ঔরসে আবদুর রহমান নামে একজন পুত্র সন্তান ছিলেন। যাঁর কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

রসূল সা.)-এর ওফাতের ২৩ বছর পর ৮১ বছর বয়সে হযরত সাওদা (রা.) ইন্তিকাল করেন। মাদীনার জান্নাতুল বাকী নামক গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর মৃত্যু সন নিয়ে মতভেদ আছে। ওয়াকিদীর মতে আমির মুয়াবিয়ার শাসনামলে ৪ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন। আর ইবনে হাজারের মতে ৫৫ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন। ইমাম বুখারী (র.) বিশুদ্ধ সনদে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ওমর (রা.)-এর খেলাফাতের সময় ইন্তিকাল করেন।

www.pathagar.com

হযরত আয়েশা (রা.)

নাম আয়েশা। আয়েশা শব্দের অর্থ সৎচরিত্রা। ডাক নাম উম্মে আবদুল্লাহ। উপাধি সিদ্দিকা ও হুমায়রা। পরবর্তীকালে নবী (সা.)-র স্ত্রী হওয়ার কারণে উম্মুল মু'মীনীন বা মু'মীনদের মা খেতাব প্রাপ্তা হন।

পিতার নাম আবূবকর সিদ্দিক। যিনি রসূল (সা.)-এর সার্বক্ষণিক সহচর ও বন্ধু ছিলেন। খোলাফায়ে রাশেদার প্রথম খলিফা ছিলেন। তাঁর মায়ের নাম ছিল যয়নব এবং ডাক নাম ছিল উম্মে রুম্মান। পিতার দিক থেকে তাঁর বংশ লতিকা হল, আয়েশা বিনতু আবূবকর ইবনে কুহাফা ইবনে ওসমান ইবনে আমের ইবনে ওমর ইবেন কা'ব ইবনে সা'দ ইবনে তাইম। মাতার দিক থেকে আয়েশা বিনতু উম্মে রুম্মান বিনতু আমের ইবনে উয়াইমের ইবনে আবদে শামস ইবনে ইতাব ইবনে আযীনা ইবনে শা'বী ইবনে ওয়াহমান ইবনে হারেম ইবনে গানাম ইবনে মালক ইবনে কেনান। পিতৃকুলের দিক হতে হযরত আয়েশা (রা.) তাইম গোত্রের এবং মাতৃকূলের দিক হতে কেনানা গোত্রের ছিলেন।

হযরত আয়েশা (রা.) নিঃসন্তান ছিলেন। একদিন তিনি রসূল (সা.)-কে বলেন, 'ইয়া রসূলুল্লাহ (সা.)! আপনার অন্যান্য স্ত্রীগণ তাদের পূর্বোক্ত স্বামীর সন্তানদের নামানুসারে গুণবাচক নাম গ্রহণ করে থাকেন। আমি কি ডাকনম গ্রহণ করার ব্যাপারে কারো নামের সাথে নিজের নামকে সংযুক্ত করবো?' রসূলুল্লাহ (সা.) মৃদু হাসলেন এবং বললেন, 'আয়েশা! তুমি তোমার বোনে ছেলে আবদুল্লাহর নামের সংগে সংযুক্ত করে ডাকনাম (কুনিয়াত) গ্রহণ কর। এর পর হতে তিনি উম্মে আবদুল্লাহ নামেই পরিচিতি লাভ করেন। অবশ্য তার পিতা আবূবকর (রা.)-এর আসল নাম ছিল আবদুল্লাহ, আর ডাক নাম ছিল আবকর। এ জন্য আয়েশা (রা.)-কে উম্মে আবদুল্লাহ বলার কারণ ইবনুল আসীর এভাবে বর্ণনা করেছেন, তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে রসূল (সা.) তাঁকে 'সত্যবীর কন্যা সত্যবাদিনী' বলে ডাকতেন।

হযরত আয়েশা (রা.)-র জন্ম ও বিয়ের সন-তারিখ নিয়ে বেশমতপার্থক্য আছে। তবুও সব মতগুলো নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে এ সিদ্ধান্তে আা যায় যে, নবুয়াতের ১ম সনে তাঁর জন্ম হয়েছিল এবং নবুয়াতের ১০ম সনের শওয়াল মাসে বিয়ে হয়েছিল। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৯ বছর। যদিও ব্যাপকভব পরিচিত

www.pathagar.com

হয়ে আছে যে, তাঁর বিয়ে ৬/৭ বছর বয়সে হয়েছিল। হিজরী দ্বিতীয় সনের শাওয়াল মাসে রসূল (সা.) ও হযরত আয়েশা (রা.)-র রসুমত (বিবাহ বাসর) অনুষ্ঠিত হয়। এ সময়ে আয়েশার বয়স হয়েছিল ১৩ বছর, আর নবী নন্দিনী হযরত ফাতিমার বয়স হয়েছিল ১৮ বছর। আয়েশা (রা.) ফাতিমা (রা.) থেকে ৫ বছরের ছোট ছিলেন।

রসূল (সা.)-এর খালা খাওলা বিনতু হাকিম ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও আরবের জাহেলী যুগের কুসংস্কার দূর করার জন্য আয়েশা (রা.)-কে বিয়ে করার ব্যাপারে তাঁকে বললেন, সংগে সংগে রসূল (সা.) এ ব্যাপারে হ্যাঁ-না কিছুই বললেন না। তিনি আল্লাহ্‌র হুকুমের অপেক্ষা করতে লাগলেন। এরপর তিনি এক রাতে স্বপ্ন দেখলেন, 'এক ফেরেশতা কারুকার্য খচিত একটি রুমালে জড়িয়ে অতি মনোরম এক বস্তু তাঁকে ইনাম দিচ্ছেন। রসূল (সা.) তা হাতে নিয়ে ফেরেশতাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এটি কি জিনিস ? উত্তরে ফেরেশতা তা খুলে দেখার জন্য আরয করলেন। রসূল (সা.) খুলে দেখলেন তার মধ্যে হযরত আয়েশার সুরত রয়েছে।'

বুখারী শরীফে এ স্বপ্নের ব্যাপারে আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.) তাঁকে বলেন, 'দু'বার তোমাকে আমায় স্বপ্নে দেখান হয়েছে। আমি দেখলাম তুমি একটি রেশমী বস্ত্রের মধ্যে এবং ফেরেশ্‌তা আমাকে বলছে ইনি আপনার স্ত্রী, তাঁর ঘোমটা সরান। আমি দেখলাম তুমি। তখন আমি মনে মনে বলেছিলাম, যদি তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তবে তিনি তা কার্যকরী করবেন।'

এরপর রসূল (সা.) এর নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে খাওলা হযরত আয়েশা (রা.)-র পিতা-মাতার নিকট প্রস্তাব পেশ করেন। প্রস্তাব শুনে আবূবকর জানান যে, এ বিয়েতে তাঁর কোন আপত্তি নেই। কিন্তু তিনি বিস্মিত হয়ে বলেন, 'এই বিয়ে কিভাবে বৈধ হবে? আয়েশা তো রসূলে খোদার ভাইঝি।' এ কথা শুনে রসূল (সা.) বলেন, 'তিনি তো কেবলমাত্র আমার দীনি ভাই।' খাওলা আবূবকর (রা.)-কে বোঝান যে, রসূল (সা.) তো আপনার রক্ত সম্পর্কের ভাই নন। রক্ত সম্পর্ক না থাকলে একই খান্দানে এক মুসলমান অন্য মুসলমানের মেয়েকে পর্যন্ত বিয়ে করতে পারে।

আয়েশা (রা.)-র মা এ ব্যাপারে বললেন, 'আয়েশার সাথে রসূলুল্লাহ (সা.)-র বিয়ে খুবই আনন্দের কথা। আমার বিশ্বাস এ বিয়ের ফলে আরবের অনেক জঘন্য কুপ্রথা দূর হবে।'

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হলে হযরত আবূবকর (রা.) তাঁর পিতা আবূ কোহাফাকে বিষয়টি বললেন। তিনি তাঁর মতামতে বললেন, 'রসূলুল্লাহর সাথে আমার নাতনীর বিয়ে হলে তা বড়ই গৌরবের কথা হবে। আমার আদরের

www.pathagar.com

নাতনী মাহবুব রাব্বুল মাশরিকাইন ও মাগরিবাইন-এর মাহবুবা হবে। তবে আমি আমার নাতনীর বিয়ে যুবায়ের ইবনে মাতয়াম-এর ছেলের সাথে দেবার প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ আছি। এই কথা আমি কাউকে এতদিন প্রকাশ করিনি। আমি যুবায়েরের মতামত নিয়ে তোমাকে আমার অভিমত জানাবো।'

যুবায়ের ও তার পরিবার তখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি। যে কারণে তারা নওমুসলিম আবূবকরের কন্যার সাথে তাদের সন্তানের বিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে রসূল (সা.)-এর সাথে আয়েশা (রা.)-র বিয়ের বাধা দূরীভূত হয়।

উভয়পক্ষ বিয়েতে সম্মত হয়ে ৫০০ দিরহাম মোহরানা ধার্য করা হয়। এরপর আবূবকর (রা.) নিজে রসূল (সা.)-এর বাড়িতে গিয়ে তাঁকে নিজ বাড়িতে আনলেন। রসূল (সা.) আবূবকরের বাড়িতে আসার সাথে সাথে উপস্থিত মেহমানবৃন্দ 'মারহাবান মারহাবান, আহলান ওয়াসাহলান' বলে তাঁকে খোশ আমদেদ জানালেন। বিয়ের মজলিসে সবাইকে উদ্দেশ্য করে হযরত আবূবকর সিদ্দিক (রা.) একটি বক্তৃতা দিলেন, 'আপনারা জানেন রসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের পয়গম্বর। তিনি আমাদেরকে আঁধার হতে আলোকে নিয়ে এসেছেন। এই আলোকের প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখবার এবং চিরদিনের জন্য আমাদের এই অকৃত্রিম বন্ধুত্ব বজায় রাখবার পথ অনেকদিন ধরে খুঁজছি। তাই আজ আপনাদের খেদমতে আমার ছোট মেয়েটিকে এনেছি। এই ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে কতশত কুসংস্কার আমরা গড়ে তুলেছি। বিনা অজুহাতে আমরা শিশু কন্যাকে মাটিতে পুঁতে ফেলি, হাত পা বেঁধে দেব-দেবীর পায়ে বলি দেই; যাদেরকে বাঁচিয়ে রাখি তাদেরকে জীবন্ত-মরা করে ফেলি, দোস্তের মেয়েকে আমাদের কেউই বিয়ে করতে পারে না। আপনারা যদি আমার এই আয়েশাকে রসূলুল্লাহ (সা.)-র হাতে সোপর্দ করে দেন তবে চিরতরে আরব দেশ হতে এ সকল কুসংস্কার মুছে ফেলতে পারবেন। এতে আপনারা আমার বন্ধুত্বকে বজায় রাখতে পারবেন এবং আমার কন্যা রসূলুল্লাহ (সা.)-র সাথে থেকে ভবিষ্যতে তাঁর আদর্শ ও বাণী জগতে প্রচার করতে পারবেন।' উপস্থিত সুধীবৃন্দ এ বক্তৃতা শোনার পর সমবেত কণ্ঠে আবার বলে উঠলেন, 'মারহাবান, মারহাবান, আয়েশার বিয়ের মধ্যে দিয়ে আমাদের সেই কল্যাণ নেমে আসুক।'

এরপর হযরত আবূবকর (রা.) নিজে খুতবা পাঠ করে রসূল (সা.) ও আয়েশার (রা.) বিয়ে পড়িয়ে দেন।

হযরত আয়েশা (রা.)-র জন্ম, বিয়ে ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা মত থাকলেও একটা বিষয়ে সমস্ত ঐতিহাসিকই একমত, তা হল- তিনি শাওয়াল মাসে জন্মগ্রহণ করেন,

www.pathagar.com

শাওয়াল মাসেই তাঁর বিয়ে হয় এবং শাওয়াল মাসেই তিনি স্বামীগৃহে প্রথম পদার্পণ করেন।

বাল্যকাল থেকেই আয়েশা (রা.) নানা ক্ষেত্রে প্রত্যুতপন্নমতিত্বের পরিচয় দেন। তিনি ছিলেন অসম্ভব প্রতিভাধর একজন বালিকা। তাঁর স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণ। যে কোন বিষয় তিনি দু'একবার পড়লেই মুখস্থ করে ফেলতে পারতেন। হযরত আয়েশা (রা.) তাঁর পিতার সাথে থেকে ৩/৪ হাজার কবিতা ও কাসিদা কণ্ঠস্থ করেছিলেন। তিনি ছোটবেলা থেকেই পিতা হযরত আবূবকর (রা.) ন্যায় একজন ন্যায়পরায়ণ মানুষের পূত-পবিত্র সংসর্গে থেকে আদব-কায়দা, আচার-ব্যবহার, চাল-চলন, দান-খয়রাত, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, অতিথি আপ্যায়ন এবং সত্যবাদিতার ক্ষেত্রে তাঁকেই আদর্শ হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। তিনি তাঁর পিতা-মাতার নিকট থেকে যে শিক্ষা পেয়েছিলেন, রসূল (সা.)-এর সহচর্যে এসে তা শতধারায় বিকশিত হয়েছিল। ফলশ্রুতিতে পরবর্তী জীবনে তিনি মুসলিম বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ আলেমা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন।

ইসলাম প্রচারের শুরু থেকেই মক্কা ও মদীনাতে মুনাফিকরা তৎপর ছিল। ইসলামের প্রচার প্রসার দেখে তাদের অন্তর্জ্বালা ক্রমেই বাড়ছিল। তারা সুযোগ খুঁজছিল বড় ধরনের কোন গোলযোগ সৃষ্টির জন্য। বিশেষ করে রসূল (সা.) ও আবূবকর (রা.)-এর মধ্যে যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল এটাকে তারা ভেঙে দেয়ার ষড়যন্ত্র করতে লাগলো। তাদের ধারণা ছিল আবূবকর যেহেতু সমাজের প্রভাবশালী মানুষ, তাছাড়া রসূল (সা.) সব কিছুকে বিনা বাক্য ব্যয়ে বিশ্বাস করে, ফলে তাঁর রেসালাতের দাবি আরো মযবুত হয়। অতএব তাদের বন্ধুত্বে ভাঙন ধরানো একান্ত জরুরী। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য মুনাফিকদের সরদার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই পুণ্যবতী, সতীসাধ্বী হযরত আয়েশা (রা.)-র চরিত্রের ভয়ানক এক অপবাদ রটনা করে। ৬ষ্ঠ হিজরীতে অনুষ্ঠিত বনীল মুস্তালিক যুদ্ধের সময় এ ঘটনার সূত্রপাত। মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই পরিকল্পিতভাবে তার প্রচুরসংখ্যক সাঙ্গপাঙ্গসহ এ যুদ্ধে রসূল (সা.)-এর সঙ্গী হয়। ইতোপূর্বে অন্য কোন অভিযানে এত বিপুলসংখ্যক মুনাফিক একত্রিত হয়নি। হযরত আয়েশা (রা) নিজেই এ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, 'রসূল করীম (সা.)-এর নিয়ম ছিল যখন কোন দূরদেশে সফরে বের হতেন তখন কোরয়ার (লটারী) সাহয্যে ফয়সালা করতেন তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে কে তাঁর সফর সঙ্গী হবেন। বনীল মুস্তালিক যুদ্ধের সময় এই 'কোরয়া' ব্যবহারে আমার নাম বের হয়। ফলে আমি তাঁর সঙ্গে গমন করি। ফিরে আসার সময় যখন আমরা মদীনার নিকট পৌঁছেছি রাত্রিকালে নবী করীম (সা.) এক

www.pathagar.com

মনযিলে তাঁবু গেড়ে অবস্থান করলেন। রাতের শেষভাগে সেখান থেকে যাত্রা প্রস্তুতি শুরু করা হলো। আমি ঘুম থেকে উঠে ইস্তিঞ্জার জন্য হাওদা থেকে নেমে বাইরে গেলাম। ফিরে আসার সময় অবস্থানের যায়গার নিকটে আসতেই মনে হলো আমার গলার হার ছিঁড়ে কোথাও পড়ে গেছে। আমি তা খুঁজতে লাগলাম। ইতোমধ্যে কাফেলা রওয়ানা হয়ে গেছে। নিয়ম ছিল এই রকম যে রওয়ানা হওয়ার সময় আমি আমার নিজের 'হাওদাজে' (পালকি) বসে যেতাম। আর চারজন লোক তা তুলে উটের পিঠের উপর বেঁধে দিত। এই সময় খাদ্যের অভাবহেতু আমরা মেয়েরা ছিলাম বড়ই হালকা ভারহীন। আমার হাওদাজ তোলার সময় লোকেরা অনুভবই করতে পারলো না যে আমি হাওদাজের মধ্যে নেই। তারা আমার অজ্ঞাতসারে হাওদাজ উটের পিঠের উপর তুলে রওয়ানা হয়ে গেল। পরে আমি হার নিয়ে যখন ফিরে এলাম তখন সেখানে কাউকে দেখতে পেলাম না। ফলে আমি আমার গায়ের চাদর দিয়ে সমস্ত শরীর আবৃত করে সেখানেই বসে পড়লাম। আর চিন্তা করতে লাগলাম সম্মুখের দিকে গিয়ে লোকেরা যখন আমাকে দেখতে পাবে না তখন তারা আমাকে তালাশ করতে নিজেরাই ফিরে আসবে। এই অবস্থায় আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালবেলা সাহাবী সাকওয়ান ইবনে মুয়াত্তিল কাফেলার পরিত্যক্ত জিনিস সংগ্রহ করার জন্য ঘটনাস্থলে এসে আমাকে দেখে চিনতে পারলেন। কেননা পর্দার আয়াত নাজিল হওয়ার পূর্বে তিনি আমাকে কয়েকবার দেখেছিলেন। আমাকে দেখে তিনি উট থেকে নামলেন এবং বিস্ময়ের সংগে তার মুখ দিয়ে উচ্চারিত হলো, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। রসূলে করীম (সা.)-এর বেগম এখানে রয়ে গেছেন! এই শব্দ কানে যেতেই আমার ঘুম ভেঙে যায়। আমি তাড়াতাড়ি উঠলাম এবং মুখ ঢেকে ফেললাম। তিনি আমার সাথে কোনই কথা বললেন না। তিনি তার উট এনে আমার সামনে বসিয়ে দিলেন আর নিজে দূরে দাঁড়িয়ে রইলেন। আমি উটের উপর উঠে বসলাম, আর তিনি লাগাম ধরে হেটে রওয়ানা হলেন। প্রায় দুপুরের সময় আমরা কাফেলাকে ধরে ফেললাম.....। এই ঘটনার ওপর মিথ্যা অপবাদের এক পাহাড় রচনা করা হল। যারা এই ব্যাপারে অগ্রণী ছিল তন্মধ্যে আবদুল্লাহ ইবেন উবাই ছিল অন্যতম। কিন্তু আমার বিরুদ্ধে কি কি কথা বলা হচ্ছে তার আমি কিছুই জানতে পারিনি.....।' (তাফহীমুল কুরআন, ৯ম খন্ড)

মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই জোরে সোরে মদীনাবাসীদের কাছে বলতে লাগলেন, 'খোদার কসম. এই মেয়েলোকটি নিজেকে বাঁচিয়ে আসতে পারেনি। দেখ, দেখ তোমাদের নবীর স্ত্রী অপরের সাথে রাত্রি যাপন করে

www.pathagar.com

এসেছে।' ইত্যাদি কথা মুনাফিকেরা ব্যাপকভাবে চারিদিকে ছড়িয়ে দিল। পরিস্থিতি এমন হলো যে, রসূল (সা.) ও হযরত আবূবকর (রা.) লজ্জায়, ঘৃণায় বিমূঢ় হয়ে পড়লেন। আর হযরত আয়েশা (রা.) এমনি মর্মাহত হলেন যে সম্পূর্ণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এই অবস্থায় আয়েশা (রা.)-কে কিছুদিনের জন্য পিতৃগৃহে পাঠিয়ে দেয়া হল।

হযরত আয়েশা (রা.) যখন তাঁর পিতার বাড়িতে অবস্থান করেছিলেন তখন একদিন রসূল (সা.) সেখানে গিয়ে তাকে বললেন, 'আয়েশা! যা শুনছি তা যদি সত্য হয়, আপনি যদি দোষী হন, আপনি অনুতপ্তা হয়ে তওবা করুন, আল্লাহ কবুল করবেন। আর যদি মিথ্যা হয় আপনার নির্দোষিতা ও পবিত্রতা সম্বন্ধে শীঘ্রই ওহী নাজিল হবে।' হযরত আয়েশা (রা.) মা-বাবাকে ইংগিতে উত্তর দেয়ার জন্য বললেন। কিন্তু তারা কোন কথা বলতে পারলেন না। তাঁদেরকে নির্বাক দেখে আয়েশা (রা.) এইভাবে উত্তর দিলেন, 'যদি আমি একরার করি. আমি পবিত্র ও নির্দোষী- আল্লাহ নিশ্চয়ই তা অবগত আছেন- তাহলে এই মিথ্যা অপবাদের সত্যতায় কে সন্দেহ করবে? আর যদি আমি অস্বীকার করি তবে মানুষ কেনই বা বিশ্বাস করবে? আমার অবস্থা এখন হযরত ইউসুফের বাবার মত যিনি বলেছেন ধৈর্যাবলম্বন কর।'

আয়েশা (রা.)-র পবিত্র চরিত্রের নিষ্কলুষতা সম্বন্ধে রসূল (সা.)-এর মনে কোন সন্দেহ ছিল না কিন্তু তবু সাবধানতার জন্য প্রকৃত ঘটনা তদন্তের মানসে হযরত আলী ও ওসমানের সমন্বয়ে তিনি দুই সদস্যের একটি টিম গঠন করলেন। তদন্ত কমিটি অনেক অনুসন্ধান করেও হযরত আয়েশা (রা.)-র কোন ত্রুটি পেলেন না। শেষ মেশ তাঁরা রির্পোট পেশ করলেন যে, 'এটা হচ্ছে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের কারসাজি। যে কথা রসূল (সা.) মসজিদে নববীতে সকল সাহাবীর উপস্থিতে বিস্তারিত পেশ করেছিলেন। এমন কি তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উবাইসহ অপরাধীদের শাস্তির ব্যাপারে সবাইকে বিবেচনা করতে বলেন।

এরপর আল্লাহ রব্বুল আলামীন আয়েশা (রা.)-র পবিত্রতা ও উত্তম চরিত্রের পক্ষে সূরা নূরের ১১ থেকে ২৬ নং আয়াত পর্যন্ত নাযিল করেন। ইরশাদ হচ্ছে, 'যারা মিথ্যা অপবাদ রচনা করেছে, তারা তোমাদেরই একটি দল। এ অপবাদকে তোমরা নিজেদের জন্য অমঙ্গল মনে করো না। বরং তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তাদের প্রত্যেকের জন্য রয়েছে কৃত পাপ কর্মের ফল। আর তাদের মাঝে যে এই কাজে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে, তার জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।' এ কথা শুনার পর বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীগণ কেন নিজেদের বিষয়ে সৎ

www.pathagar.com

ধারণা করেন নি, এবং বলেনি যে এটা নির্জলা মিথ্যা অপবাদ। তারা কেন সাক্ষী উপস্থিত করেনি, এজন্য তারা আল্লাহ্‌র বিধান মত মিথ্যাবাদী। ইহলোক ও পরলোকে তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ দয়া না থাকলে তোমরা যাতে নিমগ্ন ছিলে তজ্জন্য কঠিন শাস্তি তোমাদেরকে স্পর্শ করত। যখন তোমরা মুখে মুখে তা ছড়াচ্ছিলে এবং এমন বিষয়ে মুখ খুলছিলে যে সম্পর্কে তোমাদের কোন জ্ঞান ছিল না, আর তোমরা একে তুচ্ছ জ্ঞান করেছিলে, আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তা ছিল গুরুতর বিষয়। আর তোমরা তা শ্রবণ করলে, তখন কেন বললে না, এ বিষয়ে তোমাদের বলাবলি করা উচিত নয়। আল্লাহ্ পবিত্র, মহান, এ এক জঘন্য অপবাদ। আল্লাহ্ পাক তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন, তোমরা যদি বিশ্বাসী হও তবে কখনো এরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি করো না। আল্লাহ্ পাক তোমাদের জন্য স্বীয় আয়াতগুলো সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ ও বিজ্ঞানময়। যারা বিশ্বাসীদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে, তাদের জন্য রয়েছে ইহলোক ও পরলোকে কঠোর শাস্তি। আল্লাহ্ পাক সুবিজ্ঞ এবং তোমরা মূর্খ।'

এই ওহী নাযিলের পর মুমীনদের মনে শান্তি ফিরে এল। রসূল (সা.)-এর নির্দেশে অপবাদকারী তিনজন মুনাফিককে প্রত্যেককে আশিটি করে দোররা মারা হল। কিন্তু মূল আসামী আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইকে শাস্তি না দিয়ে রসূল (সা.) তার বিচারের ভার আল্লাহ্‌র উপর ছেড়ে দিলেন।

এ ঘটনাটি ইফ্‌কের বা অপবাদ আরোপের ঘটনা হিসেবে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে।

ইফ্‌কের ঘটনার মাত্র তিন মাস পর 'জাতুল জ্বায়েশ' যুদ্ধে রসূল (সা.) গমন করেন। এবারও হযরত আয়েশা রসূল (সা.)-এর সফর সঙ্গী হন এবং তাঁর হারটি হারিয়ে যায়। বিষয়টি তিনি তৎক্ষণাৎ রসূল (সা.)-কে জানান। ফলে রসূল (সা.) যাত্রার বিরতির নির্দেশ দেন। হার খুঁজতে খুঁজতে ফজরের ওয়াক্ত প্রায় যায় যায় অবস্থা। এদিকে কাফেলার সাথে এক ফোঁটাও পানি ছিল না। কিভাবে নামায আদায় করা হবে এ ব্যাপারে সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন।

হযরত আবূবকর যথারীতি এ কাফেলার সাথে ছিলেন। তিনি বুঝলেন আয়েশার জন্য এ জিল্লতি। তাই তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে রসূল (সা.)-এর তাঁবুতে গেলেন। রাগত কণ্ঠে বললেন, 'আয়েশা! এই কি তোর আচরণ ? তোর হারের জন্য সমগ্র কফেলার লোকজন এক চরম বিপদের সম্মুখীন। আযু-গোসলের জন্য এক বিন্দু পানিও নেই। এখন লোকজন কেমন করে ফজরের নামায আদায় করবে ? বারে বারে তুই আমাদেরকে এ কি ফ্যাসাদে ফেলে চলেছিস ?'

www.pathagar.com

আয়েশা (রা.) টু শব্দটি করলেন না। কারণ রসূল (সা.) তখন তার কোলে মাথা রেখে চোখ বুঁজেছিলেন। তিনি মনে মনে শুধু আল্লাহ্‌র সাহায্য চাইলেন। এ সময় রসূল (সা.)-এর নিকট ওহী নাজিল হল-

'আর যদি তোমরা পীড়িত হও কিংবা বিদেশ ভ্রমণে থাক, কিংবা তোমাদের কেউ শৌচাগার হতে ফিরে আসে, কিংবা স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় এমতাবস্থায় পানি পাওয়া না গেলে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম কর। হস্তদ্বয় ও মুখমন্ডল মাসেহ কর, আল্লাহ্ পাক ক্ষমাশীল ও মার্জনাকারী।'

তায়াম্মুমের হুকুম নাজিল হওয়ায় উপস্থিত সবাই খুব খুশি হয়ে আয়েশা (রা.) ও আবূবকর (রা.)-এর প্রশংসা করতে লাগলো। রসূলও (সা.) খুশি মনে সবাইকে নিয়ে তায়াম্মুম করে জামায়াতের সাথে ফজর নামায আদায় করলেন। নামায শেষে যাত্রা করার উদ্দেশ্যে আয়েশাকে বহনকারী উট উঠে দাঁড়াতেই দেখা গেল তাঁর হার সেখানে পড়ে আছে। হার পাওয়াতে হযরত আবূবকর (রা.) নিজ কন্যার কাছে এসে বললেন, 'মা আয়েশা! আমি জানতাম না তুই এতই পুণ্যবতী। তোকে কেন্দ্র করে আল্লাহ্ তা'অলা উম্মতে মুহাম্মদীর প্রতি যে রহমাতের ধারা বর্ষণ করেছেন, তার জন্য হাজারো শোকর। আল্লাহ্ পাক তোকে দীর্ঘায়ু দান করুন।'

রসূল (সা.) মধু খুব পছন্দ করতেন। এ জন্য জয়নাব (রা.) তাঁকে প্রায়ই মধুর শরবত তৈরি করে দিতেন। কিন্তু বিষয়টি আয়েশা (রা.) সহ অন্যান্য নবী পত্নীদের পছন্দনীয় ছিল না। রসূল (সা.) যখন ব্যাপারটি আঁচ করলেন, তখন তিনি আর মধু খাবেন না বলে আল্লাহ্‌র দরবারে মুনাজাত করলেন।

মহান রব্বুল আলামীন কিন্তু তাঁর পেয়ারা হাবীবের এ মুনাজাত পছন্দ করলেন না। সাথে সাথে অহী নাজিল হল, 'হে প্রিয় নবী! আল্লাহ্ পাক যা কিছু আপনার জন্য বৈধ করেছেন, স্বীয় স্ত্রীলোকের প্ররোচনায় তাদের মনস্তুষ্টির জন্য সে হালাল বিষয়কে আপনি অবৈধ বা হারাম বলে অভিহিত করতে পারেন না। আল্লাহ্ পাক ক্ষমাশীল ও দয়ালু। আর আল্লাহ্ পাক আপনার কসম ভঙ্গ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং তা হবে আইনসঙ্গত। আল্লাহ্ পাক আপনার বিশ্বস্ত বন্ধু এবং তিনি সর্ব বিষয়ে সুপরিজ্ঞাত।'

এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর রসূল (সা.) আবার মধু পান করা শুরু করলেন। আয়েশাসহ অনান্য নবীপত্নীগণ এ ব্যাপারে রসূল (সা.)-এর নিকট ক্ষমা চাইলেন। তিনি সকলকে ক্ষমা করে দিলেন। এই ঘটনা 'তাহরীম' এর ঘটনা হিসেবে পরিচিত। উম্মেহাতুল মু'মীনীনগণ একবার স্বচ্ছল জীবন-যাপনের প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করার জন্য রসূল (সা.)-এর নিকট আবেদন

www.pathagar.com

জানালেন। বিষয়টি রসূল (সা.) মোটেই ভালভাবে নিলেন না। তিনি দীর্ঘ ঊনত্রিশ দিন নিজ গৃহে না গিয়ে মসজিদে নববীর নিকটস্থ একটি ছোট ঘরে কাটিয়ে দিলেন।

সুযোগ বুঝে মুনাফিকরা বলে বেড়াতে লাগলো রসূল (সা.) তাঁর স্ত্রীদের ত্যাগ করেছেন। কথাটি এক কান থেকে আর কানে এমনিভাবে সারা মদীনায় ছড়িয়ে পড়লো। বুঝতেই পারো গুজব বাতাসের আগে ছড়ায়। এ ক্ষেত্রেও তাই ঘটলো। পরিস্থিতির এত অবনতি হল যে সাহাবারা পেরেশান হয়ে পড়লেন।

হযরত আবূবকর (রা.) আয়েশাকে বললেন, 'আয়েশা! তোমার উচিত, সিদ্ধান্ত পরিহার করে নবী পাকের দরবারে আত্মসমর্পণ করা। তিনি যদি তোমাদেরকে তালাক না দিয়ে থাকেন তা'হলে এটাই হবে ক্ষমা লাভের একমাত্র উপায়।'

আয়েশা (রা.) দাবি দাওয়া প্রত্যাহার করে নিলেন কিন্তু রসূল (সা.)-এর নিকট হাজির হতে সাহস করলেন না।

হযরত ওমর (রা.) তাঁর কন্যা হাফসা (রা.)-কে অনুরূপ বললেন। এমনিভাবে সমস্ত উম্মেহাতুল ম'মীনীনগণ তাদের দাবি প্রত্যাহার করলেন। কিন্তু রসূল (সা.) গৃহে ফিরলেন না।

এমতাবস্থায় ওমর (রা.) সাহস করে রসূল (সা.)-এর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চাইলেন। পরপর তিনবার নাকোচের পর চতুর্থবারে সাক্ষাতের অনুমতি পাওয়া গেল। ভয়ে ভয়ে ওমর (রা.) অত্যন্ত কাতর কণ্ঠে বললেন, 'ইয়া রসূলুল্লাহ (সা.)! আপনি কি উম্মাহাতুল মু'মীনীনদের তালাক দিয়েছেন ? নবীপাক উত্তর দিলেন, 'না!' পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি কি এ সংবাদ উম্মেহাতুল মু'মীনীনদের দিতে পারি ?' তিনি বললেনে, 'হ্যাঁ জানাতে পার।'

হযরত ওমর (রা.) বাইরে এসে সকলকে শুভ সংবাদ দিলেন। এরপর ওহী নাযিল হল, 'হে নবী! আপনি আপনার মহিয়সীগণকে বলে দিন, যদি তোমরা দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও জাকজমক কামনা কর, তবে আস আমি তোমাদেরকে পরিত্যাগ করি। আর যদি আল্লাহ, আল্লাহ্‌র রসূল ও পরকালের প্রত্যাশা কর তবে আল্লাহ্‌পাক পুণ্যবান রমণীদের জন্য মহা পুরষ্কার নির্ধারিত করে রেখেছেন।'

ঊনত্রিশ দিন পর রসূল (সা.) সর্বপ্রথম আয়েশার ঘরে প্রবেশ করে এ আয়াত পাঠ করলেন এবং বললেন, 'আয়েশা এ দু'টির কোনটি তুমি বেছে নিতে চাও।' উত্তরে আয়েশা বললেন, 'ইয়া রসূলুল্লাহ! আল্লাহ এবং আল্লাহ্‌র রসূলই আমার একান্ত কাম্য।'

এক এক করে রসূল (সা.) সমস্ত উম্মেহাতুল মু'মীনীনকে এভাবে জিজ্ঞেস করলেন। সবাই সন্তোষজনক উত্তর দিলেন। রসূল (সা.) সবার উত্তরে প্রীত হলেন।

www.pathagar.com

হযরত আয়েশা (রা.) সেই সৌভাগ্যবান উম্মেহাতুল মু'মীনীন যাঁর কোলে মাথা রেখে রসূল (সা.) ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব থেকে অসুস্থাবস্থায় নবী করীম (সা.) আয়েশার গৃহেই ছিলেন, এমন কি তাঁর গৃহেই রসূল (সা.)-কে দাফন করা হয়। পরবর্তীকালে হযরত আবূবকর (রা.) ও হযরত ওমর (রা.)-কেও রসূল (সা.)-এর পাশে অর্থাৎ আয়েশার গৃহে দাফন করা হয়।

আসলে রসূল (সা.) অন্যান্যদের তুলনায় আয়েশা (রা.)-কে একটু বেশি ভালবাসতেন। তিনি নিজেই বলেছেন, 'পরওয়ারদিগার! যা কিছু আমার আয়ত্তাধীন, (অর্থাৎ স্ত্রীদের মধ্যে সাম্য বজায় রাখা) সে ক্ষেত্রে ইনসাফ থেকে যেন আমি বিরত না থাকি, আর যা আমার আয়ত্তের বাইরে (অর্থাৎ আয়েশার মর্যাদা ও ভালবাসা) তা ক্ষমা করে দাও। (আবূ দাউদ)

আমর ইবনুল আস (রা.) নবীজীকে জিজ্ঞেস করেন, 'ইয়া রসূলুল্লাহ (সা.)! দুনিয়ায় আপনার সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি কে? রসূল (সা.) বললেন, আয়েশা। তিনি বললেন, আমি জানতে চাচ্ছি পুরুষদের মধ্যে কে সবচেয়ে প্রিয়। জবাব দিলেন, আয়েশার পিতা (অর্থাৎ হযরত আবূবকর)।'

হযরত আয়েশা (রা.)-ও প্রাণ দিয়ে রসূল (সা.)-কে ভালবাসতেন। নবীজী ইন্তেকালের সময় যে পোশাক পরিহিত ছিলেন পরবর্তীকালে আয়েশা তা যত্ন সহকারে হেফাযত করেন। একদিন তিনি জনৈক সাহাবাকে নবীজীর কম্বল ও তহবন্দ (লুঙ্গি জাতীয়) দেখিয়ে বলেন, 'খোদার কসম, হযরত এ কাপড় পরিধান করে ইন্তিকাল করেছেন।' জীবনের শুরুতেই আয়েশা (রা.) বিধবা হন, এরপর তিনি ৪৮ বছর জীবিত ছিলেন। এই ৪৮ বছর তিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও আন্তরিকতার সাথে রসূলের রেখে যাওয়া কাজেরই তদারকি করেছেন।

রসূল (সা.)-এর ওফাতের পর হযরত আবূবকর (রা.)-এর খেলাফত কে স্বীকার করে বয়াতকালে নবী পত্নীগণ হযরত উসমানের মাধ্যমে মীরাস দাবি করার উদ্যোগ নিলে, আয়েশা (রা.) সবাইকে স্মরণ করিয়ে বলেন, 'রসূল (সা.) বলে গেছেন, কেউ আমার ওয়ারিশ হবে না। আমার রেখে যাওয়া জিনিস হবে ছদকা।'

হযরত আয়েশা (রা.) পোশাক পরিচ্ছদ পরার ব্যাপারে খুব সতর্কতা অবলম্বন করতেন। একবার তাঁর ভাইঝি হাফছা বিনতু আবদুর রহমান পাতলা ওড়না পরে তাঁর সামনে আসলে তিনি ওড়নাটি ছুড়ে ফেলে বলেন, 'সূরা নূর-এ আল্লাহ তা'আলা কি বলছেন, তুমি কি পড়নি?' এরপর একটা মোটা কাপড়ের ওড়না তাকে দেন।

www.pathagar.com

আয়েশা (রা.) কোন এক বাড়িতে একবার বেড়াতে যান। সেখানে বাড়িতে মালিকের দু'জন মেয়েকে চাদর ছাড়াই নামায পড়তে দেখে বলেন, 'আগামীতে বিনা চাদরে কখনো নামায পড়বে না।'

হযরত আবূবকর (রা.)-এর আমল থেকে আয়েশা (রা.) বিভিন্ন জটিল বিষয়ে সাহবাদেরকে পরামর্শ দিতেন। এ সময় থেকেই তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর হাদীস বর্ণনা করতে থাকেন এবং ফতোয়া দেয়া শুরু করেন।

হযরত ওমর (রা.)-এর শাসনামালে যখন তিনি খালিদ বিন ওয়ালিদকে সেনাপতির পদ থেকে পদচ্যুত করেন, তখন এ সংবাদ পাওয়ার পর আয়েশা (রা.) খলিফাকে পরামর্শ দেন খালিদকে সাধারণ সৈনিক হিসেবে রাখার। তা না হলে বিশৃংখলা দেখা দিতে পারে বলে তিনি আশংকা করছিলেন। ওমর (রা.) মা আয়েশার কথা অনুযায়ী কাজ করেন।

মিসর অভিযানে আমর ইবনুল আস যখন সুবিধা করতে পারছিলেন না, তখন আয়েশা (রা.) ওমর (রা.)-কে তাড়াতাড়ি জোবায়েরের নেতৃত্বে নতুন সৈন্য বাহিনী মিসরে পাঠানোর পরামর্শ দেন। খলিফা সেই অনুযায়ী কাজ করলেন। ফলে অল্পদিনেই মিসর মুসলমানদের পদানত হয়।

ইরাক বিজয়ের পর গণীমতের মালের মধ্যে এক কৌটা মনি-মুক্তা পাওয়া যায়। রসূল (সা.)-এর প্রিয় স্ত্রী হিসেবে আয়েশা (রা.) বলেন, 'হযরতের পর খাত্তাবের পুত্র ওমর আমার প্রতি বিরাট অনুগ্রহ করছেন। হে আল্লাহ, তাঁর দানের জন্য আগামীতে আমাকে বাঁচিয়া রেখো না।'

ওমর (রা.)-এর খিলাফতকালে উম্মেহাতুল মু'মীনীনদের সকলকে বার্ষিক দশ হাজার দিরহাম বৃত্তি মঞ্জুর করা হয়। কিন্তু হযরত আয়েশা (রা.)-র জন্য বার হাজার ধার্য করা হয়।

এর কারণ উল্লেখ করে ওমর (রা.) বলেন, 'হযরত আয়েশা (রা.) ছিলেন নবীজীর অতি প্রিয়।'

মৃত্যুর আগে ওমর (রা.)-এর পুত্র আবদুল্লাহকে আয়েশা (রা.)-র নিকট পাঠান তাঁর লাশ রসূল (সা.)-এর পাশে দাফন করার অনুমতির জন্য। এ আবেদন পেশ করলে আয়েশা (রা.) বলেন, ' স্থানটি আমার নিজের জন্য রাখলেও ওমরের জন্য তা আনন্দের সাথে ত্যাগ করছি।'

আয়েশা (রা.)-র অনুমতি পাওয়ার পরও ওমর (রা.) ওছিয়ত করে যান, 'আমার মৃতদেহ আস্তানার সামনে রাখবে। অনুমতি পাওয়া গেলে ভেতরে দাফন করবে. অন্যথায় সাধারণ মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করবে।' সেই অনুযায়ী

www.pathagar.com

কাজ করা হয়। আয়শা (রা.)-র অনুমতি পাওয়ার পর হুজরার ভেতর ওমর (রা.)-এর লাশ দাফন করা হয়।

হযরত ওসমান (রা.)-এর খিলাফতকালে বিভিন্ন বিষয়ে আয়েশা (রা.)-র নিকট থেকে যুক্তি পরামর্শ গ্রহণ করা হত এবং সে মুতাবেক কাজ করা হত। তাঁর সময়ের প্রথমদিকে রাজ্যে হট্টগোল দেখা দিলে মুহাম্মদ বিন আবূবকরসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ খলিফার পদত্যাগের দাবি নিয়ে আয়েশার কাছে আসেন। আয়েশা (রা.) বলেন, 'না, তা হতে পারে না। রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যদি ওসমানের হাতে খেলাফতের দায়িত্ব আসে তাহলে সে যেন তা স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ না করে।'

ওসমান (রা.)-এর খেলাফতের শেষ দিকে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের বিরুদ্ধে দুঃশাসনের অভিযোগ উঠলে আয়েশা (রা.)-র পরামর্শ অনুযায়ী তাদেরকে রাজধানীতে তলব করা হয় এবং গভর্নরদের পেশকৃত দলিল-দস্তাবেজ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয় একটি তদন্ত কমিটির মাধ্যমে। এ তদন্ত কমিটিও আয়েশা (রা.)-র পরামর্শে গঠিত হয়।

ইসলাম প্রচারের শুরু থেকেই মুনাফিকরা আল্লাহ, রসূল (সা.) ও ইসলামের বিরুদ্ধে কাজ করে আসছিল। হযরত ওসমান (রা.)-এর সময়ে এসে তারা খুবই সুকৌশলে কাজ শুরু করে এবং হযরত ওসমান (রা.)-এর শাহাদাতের ফলে তা আরো বিস্তৃতি লাভ করে। হযরত আলী (রা.) এমনি এক দুঃখজনক পরিস্থিতিতে মুসলিম বিশ্বের খলীফা হন। খেলাফত প্রাপ্তির পর পরই তাঁর ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয় হযরত ওসমান হত্যার বিচার করার জন্য। কিন্তু ঘটনা এমন ছিল যে, হত্যাকরী কে বা কারা তা সঠিক করে কেউ জানতো না। ওসমান (রা.)-এর স্ত্রী নাইলা ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও কাউকে চিনতে পারেন নি। ফলে কাউকে সাজা দেয়া যাচ্ছিল না। চক্রান্তকারীরা এ সুযোগটিই গ্রহণ করলো। তাদের প্ররোচনায় কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবাও ওসমান হত্যার বিচার দাবি করলেন। এদের মধ্যে হযরত আয়েশা, হযরত তালহা ও হযরত যুবাইর (রা.)-এর মত লোকও ছিলেন। তাঁরা হযরত আয়েশার নেতৃত্বে মক্কা থেকে বসরার দিকে যাত্রা করেন, সেখানে ওমসান হত্যার বিচার দাবিকারীদের সংখ্যা ছিল বেশি। এহেন সংবাদে হযরত আলী (রা.) সেনাদলসহ সেখানে পৌঁছান এবং দু'বাহিনী মুখোমুখি অবস্থান নেয়। যেহেতু উভয়পক্ষ সততার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, ফলে আলাপ আলোচনার পর বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়। কিন্তু চক্রান্তকারীরা এ ধরনের পরিস্থিতির পক্ষে ছিল না। তাই তারা অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে রাতের আধারে এক পক্ষ অপর পক্ষের ওপর আক্রমণ চালায়, আর প্রচার করতে থাকে যে অপর পক্ষ সন্ধির সুযোগ নিয়ে অন্যায়ভাবে

www.pathagar.com

আক্রমণ করেছে। এতে যুদ্ধ আরো ভয়াবহ রূপ নেয়। উভয়পক্ষে প্রচুর শহীদ হন। শেষ পর্যন্ত হযরত আলী জয়লাভ করেন এবং আয়েশা (রা.)-কে সসম্মানে মদীনা পাঠিয়ে দেন।

এই যুদ্ধে হযরত আয়েশা (রা.) উটে আরোহণ করে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন বলে ইতিহাসে এটা জঙ্গে জামাল বা উটের যুদ্ধ নামে পরিচিত।

আমীর মুয়াবিয়ার শাসনামলে আয়েশা (রা.)-র খেদমতে তিনি এক লক্ষ দিরহাম উপহারস্বরূপ পাঠিয়েছিলেন। আয়েশা (রা.) ঐদিন সন্ধ্যার আগেই পুরো এক লক্ষ দিরহাম গরীব মিসকিনদের মধ্যে দান করে দিলেন। ঐদিন তিনি রোযা ছিলেন। কিন্তু তিনি ইফতার করার জন্যেও কিছু রাখেনম নি। তাই তার দাসী আরজ করলো, 'ইফতারের জন্য তো কিছু রাখা প্রয়োজন ছিল।" উত্তরে আয়েশা (রা.) বললেন, 'মা! তোমার এ বিষয়ে পূর্বে আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয়া উচিৎ ছিল।'

হযরত আয়েশা (রা.) অনেক ক্ষেত্রে অনেকের চেয়ে বিশিষ্ট ছিলেন। উম্মেহাতুল মু'মীনীনদের মধ্যে তাঁর ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য ছিল ব্যতিক্রমধর্মী। তিনি নিজেই বলেন, 'এটি আমার অহঙ্কার নয়, বরঞ্চ প্রকৃত ঘটনা এই যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নয়টি বিষয়ে দুনিয়ার সকলের চেয়ে আমাকে বিশেষভাবে সম্মানিতা করেছেন– (১) আমার বিবাহের পূর্বে আমার সূরত ফেরেশ্তাগণ রসূলুল্লাহর সামনে রেখেছিলেন। (২) যখন আমার নয় বছর বয়স তখন রসূল্লাহ (সা.) আমার বিয়ে করেছিলেন। (৩) ১৩ বছর বয়সে রসূলুল্লাহ (সা.)-র বাড়িতে পদার্পণ করেছি। (৪) আমি ছাড়া রসূলুল্লা (সা.)-হর কোন স্ত্রী কুমারী ছিল না। (৫) রসূলুল্লাহ (সা.) যখন আমার নিকট থাকতেন তখন প্রায়ই তাঁর ওপর ওহী নাযিল হতো। আমি রসূলুল্লাহ (সা.) এর প্রিয়তমা স্ত্রী ছিলাম। (৭) আমাকে লক্ষ্য করে সূরা নূরের এবং তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল হয়েছে। (৮) আমি চর্মচক্ষে দুবার জিবরাঈল (আ.)-কে দর্শন করেছি। (৯) রসূলুল্লাহ (সা.) আমারই কোলে পবিত্র মাথা রেখে ইন্তেকাল করেছেন।

হযরত আয়েশা (রা.) ছিলেন একজন মহৎ হৃদয়ের মানুষ। কবি হাসসান বিন সাবিত ইফকের জঘন্য অপবাদকারীদের মধ্যে শামিল ছিলেন। তবু কবি সাবিত যখন আয়েশা (রা.)-র মজলিসে আসতেন তিনি সাদরে তাকে বরণ করে নিতেন। অন্যরা সাবিতের কৃতকর্মের জন্য সমালোচনা ও নিন্দা করলে তিনি বলতেন, 'তাকে মন্দ বলো না। সে বিধর্মী ও পৌত্তলিক কবিদের কবিতার উত্তর রসূলুল্লাহ (সা.)-এর তরফ থেকে প্রদান করতো।'

www.pathagar.com

হযরত আয়েশা (রা.)-র ছিল প্রচন্ড সাহস ও আত্মিক মনোবল। যে কারণে তিনি ওহুদ যুদ্ধের সময় আহতদের সেবা করতে পেরেছিলেন। তিনি সেখানে দৌড়াদৌড়ি করে মশক (কলস জাতীয় চামড়ার তৈরি এক প্রকার পানির পাত্র) কাঁদে নিয়ে তৃষ্ণার্তদের পানি পান করিয়েছিলেন। তিনি উষ্ট্রের যুদ্ধের এক পক্ষের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এমনিতেও তিনি মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদে অংশগ্রহণের প্রবল ইচ্ছা পর্যন্ত প্রকাশ করেছেন। রাতেরবেলা তিনি একাকিনী কবরস্থানে গমন করতেন।

রসূল (সা.) জীবিত থাকতে তিনি তাঁর সাথে সাথে রাতেরবেলা তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতেন। বেশির ভাগ দিন তিনি রোযা রাখতেন।

ইশরাকের নামায সম্বন্ধে আয়েশা (রা.) নিজে বলেছেন, 'আমি নবীজীকে কখনো ইশরাকের নামায পড়তে না দেখলেও আমি নিজে তা পড়ি। তিনি অনেক কিছু পছন্দ করতেন, উম্মতের ওপর ফরয হয়ে যাবে এ আশংকায় তদনুযায়ী আমল করতেন না।'

হযরত আয়েশা (রা.)-এর পাণ্ডিত্যের বিবরণ শুনলে অবাক হতে হয়, তিনি কুরআন, হাদীস, ফিকাহ, উসূল, ইজমা, কিয়াস, সাহিত্য, ইতিহাস, রসায়ন, চিকিৎসা বিদ্যা ইত্যাদি নানা বিষয়ে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি শিক্ষকতা ও বক্তৃতায় পারদর্শী ছিলেন। এক পরিসংখ্যানে জানা যায় তাঁর ছাত্র সংখ্যা ছিল কমপক্ষে বার হাজার।

এ জন্যই আয়েশা (রা.) সম্পর্কে রসূল (সা.) বলেছেন, 'শরীয়তের অর্ধেক বিদ্যাই তোমরা ঐ রক্তাভ গৌরবর্ণা মহিষীর নিকট হতে শিখতে পারবে।'

হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) বলেন, 'সাহাবী হিসাবে আমাদের সামনে এমন কোন কঠিন বিষয় উপস্থিত হয়নি, যা হযরত আয়েশাকে জিজ্ঞেস করে তাঁর কাছে কিছু জানতে পারিনি।'

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবূ সালমা ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আওফ বলেন, 'হযরত আয়েশার চেয়ে সুন্নাতে নববীর বড় আলেম, দীনের সূক্ষ্মতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ, কালামে মজীদের আয়াতের শানে নুযূল এবং ফারায়েয সম্পর্কে বেশি জ্ঞানের অধিকারী আর কাউকে দেখিনি।'

হযরত আতা ইবনে আবূ রোবাহ তাঁর সম্বন্ধে বলেন, 'হযরত আয়েশা ছিলেন সবচেয়ে বড় ফকীহ, সবচেয়ে উত্তম মানুষ এবং লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বড় সঙ্গ মতের অধিকারিণী।

www.pathagar.com

ইমাম যুহরী বলেন, 'সকল পুরুষ এবং উম্মুল মু'মীনীনদের সকলের এলেম একত্র করা হলে হযরত আয়েশার এলেম হবে তাদের সবার চেয়ে বেশি।"

হযরত আয়েশা (রা.) মোট ২২০০ টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে ১৭৪ টি হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম ঐক্যমত্যে পৌছেছেন। ইমাম বুখারী (র.) তাঁর কাছ থেকে এককভাবে ৫৪টি হাদীস এবং ইমাম মুসলিম (র.) ৬৮টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। কারো মতে তিনি শরীয়তের এক-চতুর্থাংশ নির্দেশাবলী বর্ণনা করেছেন।

হযরত আয়েশা (রা.) অন্ধ অনুকরণের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি সবকিছু যাচাই বাছাই করে তারপর গ্রহণ করতেন। রসূল (সা.)-এর সময়ে মেয়েরা মসজিদে গিয়ে পুরুষদের পেছনে নামায পড়তে পারতেন কিন্তু রসূল (সা.)-এর ইন্তেকালের পর তৎকালীন সময়ের মেয়েদের চলাফেরা দেখে আয়েশা (রা.) বেশ গোস্বার সাথে বলেছিলেন, 'রসূলে খোদা যদি জানতেন, নারীদের কি দশা হবে, তা হলে তিনি বনী ইসরাঈলের মতো নারীদেরকে মসজিদে আসতে নিষেধ করতেন।'

কা'বা শরীফের চাবিধারী ইবনে ওসমান একবার এসে আয়েশা (রা.)-কে বললেন, 'কা'বা শরীফের গেলাফ নামানোর পর তা দাফন করা হয়েছে। যেন মানুষের নাপাক হাত তা স্পর্শ করতে না পারে।' হযরত আয়েশা বললেন, 'এটাতো কোন যুক্তিযুক্ত কথা হলো না। গেলাফ খুলে ফেলার পর যার ইচ্ছে তা ব্যবহার করতে পারে। তুমি তা বিক্রি করে গরীব-দুঃখীদের মধ্যে তার মূল্য বিতরণ করে দাওনা কেন?'

বুঝতেই পারছো আয়েশা (রা.) কেমন সংস্কারমুক্ত মানুষ ছিলেন।

সাহাবী ও তাবেয়ী মিলে মোট দুই শতাধিক রাবী আয়েশা (রা.)-র নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, মসরুক, আসওয়াদ, ইবনুল মুসাইয়িব, উরওয়াহ, কাসেম প্রমুখ সাহাবিগণ।

আমীর মুয়াবিয়ার শাসনামলে ৫৮ হিজরীতে ১৭ রমযান ৬৮ বছর বয়সে হযরত আয়েশা (রা.) ইন্তিকাল করেন। তাঁর ওছিয়ত মোতাবেক রাতেরবেলা তাকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়। মদীনার তৎকালীন গভর্নর আবূ হোরায়রা (রা.) তাঁর নামাযে জানাযা পড়ান। আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের ও ওরওয়াহ বিন জুবায়ের দুই সহোদর জানাযার পর তাঁর লাশ কবরে নামান।

হযরত আয়েশা (রা.)-র মৃত্যু সংবাদে ঐ রাতেরবেলায়ও পুরুষ ছাড়াও প্রচুর পরিমাণে মহিলার সমাগম ঘটে। তাঁর মৃত্যু সংবাদ সবাইকে এত ব্যথাতুর করেছিল যে, মাসরুক বলেন, 'নিষিদ্ধ না হলে আমি উম্মুল মু'মীনীনের জন্য মাতমের আয়োজন করতাম।' আর হযরত আবূ আইউব আনসারী বলেন, 'আমরা আজ মাতৃহারা শিশুর মত এতীম হলাম।'

www.pathagar.com

হযরত হাবসা (রা.)

তাঁর নাম হাফসা। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) তাঁর পিতা ছিলেন। মায়ের নাম যয়নব বিনতু মাযউন। তাঁর বংশ লতিকা হাফসা বিনতু ওমর ইবনে খাত্তাব ইবনে নওফেল ইবনে আবদুল ওয়যা ইবনে বিরাহ ইবেন আবদুল্লাহ ইবনে কুরাত ইবনে রিযাহ ইবনে আদী ইবনে লুয়াই ইবনে ফিহির ইবনে মালিক।

হযরত হাফসা (রা.) নবুয়াতের পাঁচ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। এ সময় কোরাইশগণ কা'বাঘর পুনঃনির্মাণ করছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ছিলেন তাঁর সহোদর। তিনি কবে কিভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তা পরিষ্কার করে জানা যায় না। শুধু এতটুকু জানা যায় যে, হযরত ওমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের প্রভাব সমগ্র পরিবারের ওপর পড়ে। ফলে তাঁর গোটা বংশের লোক ইসলাম কবুল করে। হযরত হাফসাও এ সময়ে আব্বা, মা ও স্বামীসহ ইসলাম কবুল করেন।

তাঁর স্বামী ছিলেন প্রখ্যাত সাহাবী খোনাইস ইবনে হুযাইফা ইবেন কায়েস ইবনে আদী। তিনি বনু সাহম বংশের লোক ছিলেন। মদীনায় হিজরতকালে স্বামী খোনাইস (রা.)-এর সাথে হাফসা (রা.)-ও মদীনায় হিজরত করেন। পরবর্তীতে বদর যুদ্ধ সংঘটিত হলে খোনাইস (রা.) তাতে অংশগ্রহণ করেন এবং মারাত্মকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে অল্প কয়েকদিন পর ইন্তেকাল করেন। সময়টা ছিল দ্বিতীয় হিজরীর ১৭ রমযান। স্বামীর মৃত্যু হলে বিধবা হাফসা (রা.) পিতৃগৃহে ফিরে আসেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন।

হাফসা (রা.) বিধবা হয়ে পিতৃগৃহে ফিরে আসার পর পিতা হিসেবে স্বাভাবিকভাবেই হযরত ওমর (রা.) মেয়ের পুনরায় বিয়ে দেয়ার ব্যাপারে চেষ্টা শুরু করেন। প্রথমে তিনি হযরত আবূবকর সিদ্দিক (রা.)-এর সাথে তাঁকে বিয়ে দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং আবূবকর (রা.)-এর সাথে সরাসরি কথা বলেন। কিন্তু আবূবকর (রা.) কোন জবাব না দিয়ে সম্পূর্ণ চুপ থাকেন। আবূবকর (রা.)-এর এই নীরবতা ওমর (রা.) ভালভাবে মেনে নিতে পারেন নি। তাই হযরত ওসমান (রা)-এর নিকট তাঁর কন্যা হাফসাকে বিয়ে দেয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। এ সময়ে

www.pathagar.com

হযরত ওসমান (রা.) বিপত্নীক ছিলেন। মানে তাঁর স্ত্রী নবী নন্দিনী হযরত রোকাইয়া (রা.) কিছুদিন আগে ইন্তেকাল করেন। কিন্তু তবুও ওসমান (রা.) এ প্রস্তাব এড়িয়ে গিয়ে জানিয়ে দেন যে আপাতত তিনি বিয়ের চিন্তা-ভাবনা করছেন না।

আসলে হযরত হাফসা (রা.) ছিলেন রাগী মেজাজের মানুষ যা আবূবকর (রা.) বা ওসমান (রা.)-এর মত নরম স্বভাবের মানুষেরা পছন্দ করতেন না। যে কারণে তাঁরা উভয়েই ভদ্রভাবে বিষয়টা এড়িয়ে গেছেন। সকলের তো জানা— স্বয়ং হযরত ওমর (রা.) নিজেই ছিলেন অসম্ভব কঠোর প্রকৃতির মানুষ। কথায় বলে না, 'বাপকা বেটা, সিপাইকা ঘোড়া।' ঠিক তেমনি হাফছা (রা.) ছিলেন 'বাপকা বেটি'। যাই হোক হাফসা (রা.)-কে বিয়ে করার ব্যাপারে আবূবকর (রা.) ও ওসমান (রা.)-এর অনীহা ওমর (রা.)-কে বেশ লজ্জায় ফেলেছিল। এ জন্য তিনি বিষয়টি সবিস্তারে রসূল (রা.)-কে অবহিত করেন।

সকলের অবগতির জন্য জানাচ্ছি, এই সেই ওমর (রা.) যাঁর ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে হযরত জিবরাইল (আ.) নাযিল হয়ে বললেন, 'মুহাম্মদ (সা.), ওমরের ইসলাম গ্রহণে আসমানের অধিবাসীরা উৎফুল্ল হয়েছেন।' আর ইতোপূর্বে ইসলাম গ্রহণকারীরা তো খুশিতে ফেটে পড়লেন। কারণ তারা জানতেন, ওমরের ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে ইসলামের ইতিহাস ভিন্ন দিকে মোড় নিল। সত্যিই তাই ওমর ইসলাম গ্রহণের পর পরই অন্য মুসলমানদেরকে নিয়ে কা'বায় গিয়ে সালাত আদায় করলেন– যা ছিল মুসলমানদের জন্য অভাবনীয় এবং বিস্ময়কর। কারণ ইতোপূর্বে ৪০/৫০ জন ইসলাম কবুল করলেও প্রকাশ্যে তাঁরা কা'বা ঘরে গিয়ে নামায আদায় করার সাহস করেন নি। ওমর (রা.) এখানেই ক্ষান্ত হলেন না, তিনি আল্লাহ, রসূল ও ইসলামের প্রধান শত্রু আবূ জেহেলের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি নিজেই বলেছেন, 'আমি তার দরজায় করাঘাত করলাম। আবূ জেহেল বেরিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কি মনে করে?' আমি বললাম, 'আপনাকে এ কথা জানাতে এসেছি যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁর আনীত বিধান বাণীকে মেনে নিয়েছি।' এ কথা শোনা মাত্র সে আমার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিল এবং বললো, 'আল্লাহ তোকে কলংকিত করুক এবং যে খবর নিয়ে তুই এসেছিস তাকেও কলংকিত করুক।'

বুঝতেই পারছো অবস্থা কি। মূলত এখান থেকেই ইসলাম ও কুফরের মধ্যে প্রকাশ্য বিরোধ শুরু হয়। তারপর! তারপর তো কত ঘটনা, কত সংঘর্ষ-সংগ্রাম, কত বিজয়। আর এ জন্যই আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) ওমর (রা.) সম্পর্কে বলেছেন,

www.pathagar.com

'ওমরের জিহ্বা ও অন্তঃকরণে আল্লাহ্ তা'আলা সত্যকে স্থায়ী করে দিয়েছেন। তাই সে 'ফারুক' । আল্লাহ্ তাঁর দ্বারা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করে দিয়েছেন।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) সব দিক ভেবে চিন্তে ওমর (রা.)-এর মর্ম বেদনার কথা উপলব্ধি করলেন এবং তাঁকে কন্যাদায়গ্রস্থতা থকে মুক্ত করার জন্য নিজেই হাফসাকে বিয়ে করার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। হিজরী তৃতীয় সনে এ বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এতে করে হযরত ওমর (রা.) যার পরনাই খুশি হন। অন্যদিকে একজন বিশিষ্ট শহীদ সাহাবীর নিঃসন্তান বিধবা স্ত্রীর দুঃখময় নিঃসঙ্গ জীবনের অবসান ঘটে।

রসূল (সা.) যখন হাফসা (রা.)-কে বিয়ে করে ঘরে তুলে নিলেন, তখন একদিন আবূবকর (রা.) ওমর (রা.)-এর সাথে দেখা করে বললেন, 'ওমর! যখন তুমি আমার নিকট হাফসার বিয়ের প্রস্তাব করেছিলে, তখন আমার নীরবতা তোমাকে ব্যথিত করেছিল। কিন্তু আমার নীরব থাকার কারণ ছিল এই যে, একদা রসূলুল্লাহ (সা.) হাফসা সম্পর্কে নিজেই আলোচনা করেছিলেন। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, রসূলুল্লাহ (সা.) অবশ্যই হাফসাকে স্বীয় পত্নীত্বে বরণ করে নেবেন। এ গোপন কথাটি আমি আর কারও নিকট প্রকাশ করিনি। যদি রসূল (সা.) হাফসাকে বিয়ে না করতেন, তাহলে আবশ্যই আমি তাকে বিয়ে করতাম।'

পণ্ডিদদের মতে, রসূল (সা.) হাফসা (রা.)-কে প্রধানত তিনটি কারণে বিয়ে করেছিলেন— (১) হযরত মুহাম্মদ (সা.) যে ইসলামের বিজয় নিশানকে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেবেন তা তিনি অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অনুভব করেছিলেন এবং আল্লাহ তাঁকে এই বিষয়ে অবহিত করেছিলেন। হযরত ওমর (রা.)-কে পুরস্কারস্বরূপ ও তাঁর মর্যাদাকে সমুন্নত করার জন্য আল্লাহ্র রসূল হযরত হাফসা (রা.)-কে বিয়ে করেন এবং উভয়ের মধ্যকার আত্মীয়তার বন্ধনকে সুদৃঢ় করেন। শুধুমাত্র রসূল (সা.)-এর সাথে এই আত্মীয়তার বন্ধনের কারণেই কিয়ামত পর্যন্ত মানুষ ওমর (রা.)-কে স্মরণ করবে। এটি একটু সুদূর প্রসারী তাৎপর্যপূর্ণ মর্যাদা (২) হযরত হাফসা (রা.)-কে নিজের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে আল্লাহ্র রসূল (সা.) হাফসা (রা.)-র মর্যাদাকে এত উচ্চে সমুন্নত করেছেনে যে শুধুমাত্র রসূল (সা.)-এর সাথে বিয়ে হওয়ার কারণে হাফসা (রা.) মুহাম্মদ (সা.)-এর অন্যান্য স্ত্রীদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবেন এবং সে নিশ্চয়তা আল্লাহ রব্বুল আলামীন প্রদান করেছেন। ও (৩) আল্লাহ্র রসূল (সা.) হযরত হাফসা (রা.)-কে বিয়ে করার মাধ্যমে ওমর (রা.)-কে কন্যা দায়মুক্ত করেন এবং সকল প্রকার নিন্দার হাত থেকে তাঁকে রক্ষা করেন।

www.pathagar.com

পূর্বেই জানিয়েছি যে হযরত হাফসা (রা.) একটু কড়া মেজাজের মানুষ ছিলেন। এমনকি তিনি অনেক সময় রসূল (সা.)-এর সাথেও কথা কাটাকাটি করতেন। বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, 'একদা হযরত ওমর (রা.) কোনও বিষয় নিয়ে গভীর চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। এমন সময় ওমরের স্ত্রী এসে বললেন, তুমি কি নিয়ে বেশি চিন্তা করছ ? ওমর (রা.) বললেন, আমার বিষয় সম্পর্কে খোঁজ নেবার অধিকার তুমি কোথায় পেলে ? প্রত্যুত্তরে ওমরের স্ত্রী বললেন, তুমি আমার কথা পছন্দ কর না। কিন্তু তোমার মেয়ে হাফসা সমানে সমানে রসূলুল্লাহ (সা.)-র সাথে প্রতিবাদ করে থাকে। হযরত ওমর (রা.) বলেন, আমি তখনই হাফসার নিকট চলে আসলাম এবং তাকে জিজ্ঞেস করলাম, মা হাফসা! তুমি নাকি রসূলুল্লাহ (সা.)-র সাথে সমানে সমানে উত্তর দিয়ে থাক ? হাফসা বললেন, হ্যাঁ, অনেক সময় তাই হয়। আমি বললাম, খবরদার! কখনো এরূপ করবে না। তুমি মনে কর না যে, তোমার রূপ রসূলুল্লাহ (সা.)-কে বিমুগ্ধ করেছে, বরং তুমি রসূলুল্লাহ (সা.)-র প্রতি বিনয়ীভাব প্রকাশ করবে।'

হাফসা (রা.)-র এ ধরনের আচরণের কারণে একবার তো রসূল (সা.) তাঁকে এক তালাক পর্যন্ত দিয়ে বসেন। অবশ্য হাফসার রাতভর নফল ইবাদত ও দিনের বেলা রোযা রাখার কথা স্মরণ করিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলামীন রসূল (সা.)-কে তাঁকে (হাফসাকে) রুজু করে নেয়ার জন্য নির্দেশ দেন। রসূল (সা.) আল্লাহ্‌র নির্দেশ মত কাজ করেন।

এত কিছুর পরও রসূল (সা.) হাফসাকে প্রচন্ড ভালবাসতেন। অনেক গোপন কথাও তাঁকে বলতেন। একবার তিনি হাফসার সাথে একটি গোপন বিষয়ে আলাপ করেন এবং অন্য কারো কাছে না প্রকাশ করার জন্য বলেন। কিন্তু নারীসুলভ মানসিকতার কারণে তিনি তা হযরত আয়েশা (রা.)-র কাছে বলে দেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই রসূল (সা.) হাফসার (রা.) ওপর গোস্বা হন। এরপর এ বিষয়কে কেন্দ্র করে সূরা তাহরীমের এ আয়াত নাযিল হয়, 'আর রসূল যখন তাঁর এক স্ত্রীর কাছে একটি গোপন কথা বলেন, আর তিনি তা ফাঁস করে দেন, আল্লাহ তাকে সে সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি কিছু প্রকাশ করেন আর কিছু বাদ দেন। তিনি তাঁর স্ত্রীর নিকট প্রকাশ করলে তিনি বলেন, কে আপনাকে এটা বলে দিয়েছে? তিনি বললেন, যিনি মহাজ্ঞানী সর্বজ্ঞ, তিনি আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন।'

পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে যখন হযরত আয়েশা (রা.) ও হযরত হাফসা (রা.) একমত হয়ে বিষয়টি মিটিয়ে ফেলার উদ্যোগ নিলেন, তখন এই আয়াত নাযিল হয়, 'তোমরা উভয়ে আল্লাহ্‌র নিকট তওবা করলে তা তোমাদের জন্য

www.pathagar.com

উত্তম। কেননা তোমাদের দিল সঠিক নির্ভুল পথ থেকে সরে গিয়েছে। আর তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করলে আল্লাহই তো তাঁর প্রভু, জিবরাঈল এবং নেককার ঈমানদারগণ তো আছেই, এসবের পর আল্লাহ্‌র ফেরেশতারা তাঁর সহায়ক রয়েছেন।'

মুনাফিকরা সব সময় তাদের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের জন্য নানা ধরনের ফাঁক ফোকর খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। এ আয়াতে ঐসব মুনাফিকদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং তাদের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলা হয়েছে, 'হাফসা আর আয়েশা যদি বিরোধ চায় আর মুনাফিকরা যদি ষড়যন্ত্র করে তা দিয়ে ফায়দা হাসিল করতে চায়, তাহলে আল্লাহ তাঁর রসূলকে সাহায্য করবেন। আর আল্লাহ্‌র সাথে আছেন জিবরাঈল ফেরেশতা এবং দুনিয়ার নেককার মুমীনগণ।

তিরমিজী শরীফে বর্ণিত আছে, 'একদা উম্মুল মু'মীনীন সুফিয়া (রা.) কাঁদতে ছিলেন। রসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তিনি উত্তর দিলেন, আমাকে হাফসা বলেছে যে, আমি ইহূদীর মেয়ে। রসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে সান্তনা দিয়ে বললেন, তুমি নবী বংশের মেয়ে। তোমার বংশে বহুনবী আবির্ভূত হয়েছেন। বর্তমানে তুমি নবীর স্ত্রী। সুতরাং হাফসা তোমার ওপর কোন বিষয়ে গৌরব করতে পারে?'

আরো বর্ণিত আছে ,'একদিন হযরত আয়েশা ও হাফসা সুফিয়াকে বললেন, আমরা রসূলুল্লাহ (সা.)-র নিকট তোমার চেয়ে অধিক প্রিয় ও মর্যাদাশালীনী। আমরা তাঁর স্ত্রী এবং একই রক্তধারার অধিকারীনী। সুফিয়া এ কথায় ক্ষুণ্ন হলেন এবং রসূলুল্লাহ (সা.)-র নিকট অভিযোগ পেশ করলেন। জবাবে রসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তুমি একথা কেন বলনি যে, তোমরা আমার চেয়ে অধিক সম্মানিতা কেমন করে হতে পার? আমার স্বামী স্বয়ং মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ (সা.) আমার পিতা হারুন (আ.) ও আমার চাচা হযরত মূসা (আ.)।

আসলে হযরত হাফসা ও আয়েশা (রা.)-র মধ্যে খুবই মধুর সম্পর্ক ছিল। অনেক সময় তাঁরা একত্রে রসূল (সা.)-এর সফর সঙ্গী হতেন।

হযরত হাফসা (রা)-র নাম যে কারণে ইতিহাসের পাতায় ও মু'মিনদের মনে অত্যন্ত মর্যাদার সাথে লেখা হয়ে আছে তা'হলো তিনি ছিলেন পবিত্র কোরআনের সংরক্ষক বা হেফাজতকারী। ঘটনাটা তোমাদেরকে খুলে বলি, য়ামামার যুদ্ধে বহুসংখ্যক কারী ও কোরআনে হাফেজ শহীদ হয়েছিলেন। 'হযরত আবূবকর (রা)-এর খেলাফতকালে ১১ হিজরী সালে জিলহজ্জ মাসে য়ামামা নামক স্থানে কিছুসংখ্যক ধর্মত্যাগীর সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এই যুদ্ধে

www.pathagar.com

মুসলিম সেনাপতি ছিলেন খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা) এবং ধর্মত্যাগী সেনাপতি ছিলো মুসায়লামা কাযযাব। এই যুদ্ধে এত বেশিসংখ্যক কোরআনে হাফেজ শহীদ হয়েছিলেন যে, এর ফলে মক্কা মদীনায় হাফেজের সংখ্যা অনেক কমে যায়। হযরত ওমর (রা.) এই ঘটনায় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে আবূকবর (রা.)-এর কাছে আল কোরআন সংকলনের সরকারী ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করেন। অনেক আলাপ আলোচনা ও চিন্তাভাবনার পর হযরত যায়দ ইবনে সাবিতের ওপর কোরআন সংকলনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। হযরত যায়দ (রা) সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় এবং তৎকালীন আরবের প্রখ্যাত কারী ও হাফিজদের সহায়তায় বহু পরিশ্রমে পবিত্র কোরআনের একটি পাণ্ডুলিপি তৈরি করেন। এটি ছিল হযরত আবূবকর (রা.)-এর খেলাফতকালে সর্বজন স্বীকৃত সরকারী পাণ্ডুলিপি।

হযরত আবূবকর (রা.) জীবদ্দশায় পাণ্ডুলিপিটি তাঁর কাছে সংরক্ষিত ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর কোরআনের এই পাণ্ডুলিপিটি হযরত ওমর (রা.)-এর অধিকারে সংরক্ষিত থাকে। তাঁর ইন্তেকালের পর হযরত হাফসা (রা.) কোরআনের এই পাণ্ডুলিপিটি অত্যন্ত যত্নসহকারে নিজের কাছে সংরক্ষিত করে রাখেন। খলিফা ওমরের (রা.) রাজত্বকালে পবিত্র কোরআনের এই মূল পাণ্ডুলিপি থেকে নকল করে এক লক্ষ পাণ্ডুলিপি তৈরি করে বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠানো হয়।

কিন্তু হযরত ওসমান (রা.)-এর খেলাফতের সময় হুযায়ফা ইবনুল য়ামন নামক এক সাহাবী যুদ্ধ উপলক্ষে আযারবাইজান গমন করে ইরাক ও সিরিয়াবাসীদের মধ্যে কোরআন পাঠে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষ্য করেন। পরে তিনি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে এই বিষয়ে হযরত ওসমান (রা.)-কে অবহিত করেন এবং কোরআনের উচ্চারণে এই পার্থক্য দূরীভূত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার সুপারিশ করেন। হযরত ওসমান (রা.) বিষয়টির গুরুত্ব গভীরভাবে উপলব্ধি করে এ ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। হযরত ওসমান (রা.) জানতেন যে হযরত আবূবকর (রা.)-এর সময়ে তৈরিকৃত কোরআনের মূল পাণ্ডুলিপিটি হযরত হাফসার (রা.)-র কাছে সংরক্ষিত আছে। ফলে তিনি হযরত হাফসার নিকট এই মর্মে খবর পাঠান যে তিনি যেন অবিলম্বে তাঁর কাছে সংরক্ষিত পবিত্র কোরআনের পাণ্ডুলিপিটি পাঠিয়ে দেন এবং হাফসা (রা.)-র পাঠানো পাণ্ডুলিপিটির ভিত্তিতে কোরআনের নকল তৈরি করে তাঁর পাণ্ডুলিপিটি ফেরত দেয়া হবে। হযরত হাফসা (রা.) তাঁর পাণ্ডুলিপিটি খলিফা ওসমানের কাছে পাঠিয়ে দেন। হযরত ওসমান কায়েকজন লেখক যেমন– যায়দ ইবনে সাবিত (রা.) আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র (রা.), সা'দ ইবনে আবিল-আস (রা.) এবং আবদুর রহমান ইবনে হারিস ইবনে হিশামকে কোরআনের নকল তৈরির কাজে নিয়োজিত করেন। হযরত

www.pathagar.com

ওসমান (রা.) এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করেছিলেন যে, কোরআনের লিখন ও পঠনে যদি মত পার্থক্য সৃষ্টি হয় তাহলে যেন কোরায়শী রীতিতেই কোরআন লেখা হয় কেননা কোরায়শী ভাষায়ই আল কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত ওসমান (রা.)-এর নির্দেশে এমনিভাবে কোরায়শী রীতিতেই পবিত্র কোরআনকে সংরক্ষিত করা হয় যার অবিকল পাণ্ডুলিপি আজ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে। এমনিভাবে পবিত্র কোরআন সংরক্ষণের ইতিহাস পর্যালোচনা করে আমরা দেখতে পাই মুসলমানরা যখন পবিত্র কোরআনের লিখন ও পঠনে চরম এক অনিশ্চয়তার মাঝে ছিল তখন হযরত হাফসা (রা.)-র নিকট সংরক্ষিত কোরআনের মূল পাণ্ডুলিপিটিই মুসলমানদের সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান করেছে। যদি হযরত হাফসা (রা.) যত্নসহকারে এই পাণ্ডুলিপিটি সংরক্ষণ না করতেন তবে হযরত ওসমান (রা.)-এর পক্ষে হয়তো সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভবপর হতো না। হযরত হাফসা (রা.) পবিত্র কোরআনের সর্বজন স্বীকৃত পাণ্ডুলিপিটি এমনিভাবে সংরক্ষণ করে কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের অন্তরে অম্লান ও চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।' (বহু বিবাহ ইসলাম ও মুহাম্মদ (সা.) পৃ-২২৬, ২২৭)।

পিতা হযরত ওমর (রা.)-এর কাছে লেখাপড়া শিখেছিলেন হাফসা (রা.)। রসূল (রা.) স্বয়ং ছিলেন তাঁর শিক্ষক। হাফসা (রা.) রসূল (সা.)-এর নিকট থেকে কোরআন, হাদীস, ফিকাহ, উসুল এবং শরীয়তের অন্যান্য বিষয় অদ্যপান্ত শিক্ষা লাভ করেন। যে কারণে নারীদের জন্য প্রয়োজনীয় সব জ্ঞানে তিনি ছিলেন সুপন্ডিত। কোরআন হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে তিনি পারঙ্গম ছিলেন। তিনি সর্বমোট ৬০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। অনেক প্রখ্যাত সাহাবীই তাঁর ছাত্রদের পর্যায়ভুক্ত ছিলেন। এ ব্যাপারে পুরুষদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, হামযা ইবনে আবদুল্লাহ, হারেসা ইবনে ওয়াহাব, আবদুর রহমান ইবনে হারেস প্রমুখ এবং মহিলাদের মধ্যে সুফিয়া বিনতু আবূ ওবায়দা এবং উম্মে মুবাশশির আনসারিয়ার নাম করা যেতে পারে। হাফসা (রা.)-র জ্ঞান ও মনীষা সারাবিশ্বে এখনো মশহুর হয়ে আছে এবং মুসলিম জাহানের কল্যাণ সাধনে অকল্পনীয় সহায়ক হয়েছে।

হাফসা (রা.) ব্যক্তিগত জীবনে রাগী স্বভাবের হলেও তিনি ছিলেন অসম্ভব ইবাদত গোজার একজন মানুষ। এই খোদাভীরু মহীয়ষী নারী রাত্রি জেগে যেমন তাহাজ্জত নামায আদায় করতেন, তেমনি দিনেরবেলা রোযা রাখতেন। যে কারণে তিনি আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দীতে পরিণত হতে পেরেছিলেন। তিনি খুবই সাধারণ জীবন যাপন করতেন। মৃত্যুকালে তিনি সহোদর আবদুল্লাহকে ডেকে বলেন, 'যৎসামান্য আসবাবপত্র যা আছে, বিষয়-সম্পত্তি সবই যেন আল্লাহ্‌র রাহে গরীব-মিসকিনদের মাঝে বিলিয়ে দেয়া হয়।'

www.pathagar.com

হযরত আমীর মুয়াবিয়ার শাসনামলে হিজরী ৪৫ সনে ৬৩ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর দিনেও হাফসা (রা.) রোযা ছিলেন এবং রোযা অবস্থায়ই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তৎকালীন মদীনার শাসনকর্তা মারওয়ান বিন হাকাম তাঁর জানাযার নামায পড়ান। হযরত আবূ হোরায়রা (রা.) কবর পর্যন্ত তাঁর লাশ বহন করে নিয়ে যান। এরপর আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর ও তাঁর পুত্রগণ লাশ কবরস্থ করেন। জান্নাতুল বাকী নামক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। রসূল (সা.)-এর ঔরসে তাঁর কোন সন্তান জন্মলাভ করেনি। মূলত তিনি ছিলেন নিঃসন্তান।

www.pathagar.com

হযরত যয়নব (রা.)

নাম তাঁর যয়নব। ডাকনাম উম্মুল মাসাকীন বা গরীব দুঃখীর মা। পিতার নাম ইবনুল হারেস এবং মাতার নাম মানদাব বিনতু আউফ। তাঁর নসব নামা এ রকম-যয়নব বিনতু খুযায়মা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনে আবদে মান্নাফ ইবনে হেলাল ইবনে আমের ইবনে সাঅসাআ।

তিনি নবুয়াতের ছাব্বিশ বছর আগে বনু বকর ইবনে হাওয়াযেনে হেলালীয়া গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন।

তুফায়েল ইবনুল হারীছের সাথে তাঁর প্রথম বিয়ে হয়। প্রথম স্বামীর সাথে তাঁর বনিবনা হয়নি। এ জন্য প্রথম স্বামী তাকে তালাক দিলে আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশের সাথে বিয়ে হয়। এই আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশের সাথে তিনি একই সময়ে ইসলাম কবুল করেন। জাহাশ ছিলেন প্রখ্যাত সাহাবীদের একজন। তিনি ওহুদের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। ওহুদ যুদ্ধের প্রাক্কালে তিনি দোয়া করেছিলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে এমন এক প্রতিপক্ষ দাও যে খুব বাহাদুর। আমি তোমার রাস্তায় যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে যাবো এবং সে আমার ঠোঁট, নাক ও কান কেটে ফেলবে এবং আমি এ অবস্থায় তোমার সাথে মিলিত হবো। তখন তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করবে, হে আবদুল্লাহ। তোমার ঠোঁট, নাক ও কান কাটা কেন, আমি আরজ করবো, হে আল্লাহ! তোমার এবং তোমার রসূল (সা.)-এর জন্য।'

তাঁর দোয়া আল্লাহ রব্বুল আলামীন কবুল করেন। তিনি অত্যন্ত বীরত্বের সাথে লড়ে যাচ্ছিলেন। এক পর্যায়ে শত্রুর তরবারীর আঘাতে তাঁর তরবারি দ্বিখন্ডিত হয়ে যায়। তখন রসূল (সা.) তাঁর হাতে একটি ডাল তুলে দেন। তিনি ডালটিকেই তরবারি হিসেবে ব্যবহার করতে থাকেন এবং এক সময় শাহাদাত বরণ করেন। যুদ্ধ শেষে দেখা গেল মুশরিকরা তাঁর ঠোঁট নাক এবং কান কেটে ফেলেছে। যেমন তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করেছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রা.) শাহাদাত বরণ করলে বিধবা যয়নব (রা.) খুবই অসহায়া হয়ে পড়েন। আসলে ওহুদ যুদ্ধে ৭০ জন সাহাবী শহীদ হওয়ার ফলে ইসলামের সেই প্রথম যুগেই বিধবাদের একটি লম্বা কাফেলা দাঁড়িয়ে যায়। যাঁরা ছিলেন একান্তই অসহায়। কারণ মুসলমান হওয়ার কারণে তাঁদের আত্মীয়-স্বজনরা

www.pathagar.com

তাঁদেরকে একটু আশ্রয় পর্যন্ত দিতে রাজি ছিল না। এমতাবস্থায় রসূল (সা.) এ অসহায় মুসলমান বিধবা মহিলাদেরকে বিয়ে করার জন্য সাহাবীদেরকে উৎসাহ দিতে থাকেন। নিজেও এ ব্যাপারে এগিয়ে আসেন।

যয়নব (রা.) ছিলেন ওহুদ যুদ্ধের ফলে যাঁরা বিধবা হয়েছিলেন তাদের অন্যতম। তিনি বিধবা হওয়ার পর আত্মীয়-স্বজনের দ্বারে দ্বারে মাথা ঠুকেছেন একটু আশ্রয়ের জন্য কিন্তু তারা তাঁকে পাত্তা দেয়নি। শেষ পর্যন্ত রসূল (স) তাকে সমাজে পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য, মর্যাদা ফিরিয়ে দেয়ার জন্য বিয়ে করেন। এক বর্ণনায় জানা যায়, 'অসহায়া জয়নব নিজেকে বিনা মোহরে রসূল (সা.)-এর কাছে পেশ করেন। তবে অন্য বর্ণনা মতে রসূল (সা.) ও তাঁর বিয়ের মোহরানা ধার্য হয়েছিল চার শত দেরহাম।

হিজরী তৃতীয় সনে রসূল (সা.) ও যয়নব (রা.)-এর মধ্যে এ বিয়ে সম্পন্ন হয়। এ সময়ে হযরত যয়নব (রা.)-এর বয়স ছিল ৩০ বছর এবং রসূল (সা.)-এর বয়স ছিল ৫৬ বছর । হযরত যয়নব (রা.) ছিলেন জন্মগতভাবেই প্রশস্ত হৃদয় ও উদার প্রকৃতির মানুষ। তিনি ছোটবেলা থেকেই ভূখা, নাঙা, গরীব-দুঃখীদের বন্ধু ছিলেন। তিনি ধনাঢ্য পিতার সন্তান হওয়া সত্ত্বেও গরীবদের দুঃখ সইতে পারতেন না। এমন বহু ঘটনা আছে যে, তিনি খেতে বসেছেন— এমন সময় ক্ষুধার্ত ভিক্ষুক এসে খাবার চেয়েছে, ব্যাস! তিনি নিজের খাবারটাই দিয়ে দিয়েছেন। এ জন্য ইসলাম গ্রহণের আগে সেই বাল্যকালেই তিনি উম্মুল মাসাকীন নামে আরবে পরিচিতা হয়ে ওঠেন।

সাধারণ জনগণের পক্ষ থেকে এ ধরনের খেতাব নিঃসন্দেহে অত্যন্ত বড় ব্যাপার। জানা যায় উম্মেহাতুল মু'মীনীনগণ কোন এক সময় রসূল (সা.) -এর নিকট জানতে চান, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল। আমাদের মধ্যে সকলের আগে কে পরলোক গমন করবেন।' রসূল (সা.) আল্লাহ্‌র হুকুম অনুযায়ী উত্তর দিলেন, 'তোমাদের মধ্যে যার হাত সর্বাপেক্ষা বড় সেই সকলের আগে মৃত্যুবরণ করবে।' সকলেই ভাবলেন মাপের দিক দিয়ে হযরত সওদা (রা.)-র হাত তুলনামূলকভাবে যেহেতু বড় সেহেতু সম্ভবত তিনি সবার আগে ইন্তেকাল করবেন। কিন্তু সবার আগে যখন যয়নব (রা.) ইন্তেকাল করলেন তখন সবাই বুঝলেন রসূল (সা.) কি বুঝাতে চেয়েছিলেন। আসলে রসূল (সা.) যয়নব (রা.)-এর দরাজ হাতকে বড় বলেছিলেন।

www.pathagar.com

হযরত যয়নব (রা.) রসূল (সা.)-এর সাথে বিয়ের মাত্র তিন মাস পরেই ইন্তেকাল করেন। তিনি রসূল (সা.)-এর উপস্থিতিতেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা.)। উম্মেহাতুল মু'মীনীনদের মধ্যে এ ভাগ্য আর কারো হয়নি। যদিও খাদীজা (রা.)-ও রসূল (সা.)-এর জীবদ্দশায় ইন্তেকাল করেন। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, খাদীজা (রা.) যখন ইন্তেকাল করেন তখন জানাযার নামাযের হুকুম হয়নি।

মৃত্যুকালে এই সৌভাগ্যবতী হযরত যয়নব (রা.)-এর বয়স হয়েছিল মাত্র ৩০ বছর। এত কম বয়সেও রসূল (সা.)-এর কোন স্ত্রী ইন্তেকাল করেন নি। তাঁকে মদীনার বিখ্যাত কবরস্থান জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়।

www.pathagar.com

হযরত উম্মে সালমা (রা.)

রসূল (সা.)-এর ষষ্ঠ স্ত্রী ছিলেন হযরত উম্মে সালমা (রা.)। তাঁর মূল নাম ছিল হিন্দ। ডাক নাম উম্মে সালমা। এ নামেই তিনি পরিচিতা হয়ে আছেন। পিতার আসল নাম সুহাইল, ডাক নাম আবূ উমাইয়া। ইনি কোরাইশ বংশের মখজুম গোত্রের লোক। মায়ের নাম আতিকা। পিতার দিক থেকে তাঁর বংশ লতিকা ছিল। হিন্দ বিনতু আবূ উমাইয়া সুহাইল ইবনে মুগীরা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনে মখজুম। আর মায়ের দিক থেকে হিন্দ বিনতু আতিকা বিনতু আমের ইবনে রাবীয়াহ ইবনে মালেক কেনানা। হযরত উম্মে সালমা (রা.) পিতা-মাতা উভয় দিক থেকেই তৎকালীন আরবের খুবই মর্যাদাসম্পন্ন বংশের লোক ছিলেন।

তাঁর পিতা আবূ উমাইয়া ছিলেন আরবের একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি। তিনি এতটাই উদার, দানশীল এবং হৃদয় খোলা মানুষ ছিলেন যে 'যাদুর রাকিব' উপাধিতে ভূষিত হন। মাঝে মধ্যে যখন সফরে যাওয়ার প্রয়োজন হত তখন আবূ উমাইয়া পুরো কাফেলার ব্যয়ভার নিজেই বহন করতেন। এজন্যই তাঁর উপাধি দেয়া হয় 'যাদুর রাকিব' বা মুসাফিরের পাথেয়।

উম্মে সালমা (রা.)-র প্রথম বিয়ে হয় তাঁরই চাচাত ভাই আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল আসাদের সাথে। ইনি রসূল (সা.)-এর দুধ ভাই ছিলেন। মূল নাম আবদুল্লাহ হলেও পরবর্তীতে তিনি আবূ সালমা নামেই পরিচিতি লাভ করেন।

ইসলামের একান্ত প্রাথমিক অবস্থায়, যখন ইসলাম কবুল করা মানে বিপদের পাহাড়কে নিজের মাথায় তুলে নেয়ার মত অবস্থা ছিল। ঠিক এই বিপদ সঙ্কুল অবস্থায় উম্মে সালমা এবং তাঁর স্বামী পরিবার পরিজনের তীব্র বিরোধিতার মুখে ইসলাম কবুল করেন। স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের ওপর নেমে আসে নানা অত্যাচার-নির্যাতন। শেষ পর্যন্ত মক্কায় টিকতে না পেরে তাঁরা অন্যান্য মুসলমানদের সাথে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে আবিসিনিয়া হিজরত করেন। এখানেই তাঁদের প্রথম সন্তান সালামা জন্মগ্রহণ করেন।এই পুত্র সালমার নামেই স্বামী আবূ সালমা এবং স্ত্রী উম্মে সালমা নামে খ্যাতি লাভ করেন।

জানা যায় আবিসিনিয়ার আবহাওয়া সালামা পরিবারের স্বাস্থ্যের অনুকূলে ছিল না। যে কারণে তাঁরা বাধ্য হয়ে মক্কায় ফিরে আসেন। পরবর্তীতে রসূল (সা.)-এর নির্দেশে মদীনায় হিজরত করেন। এখানে উল্লেখ্য যে হযরত উম্মে সালমা (রা.)

www.pathagar.com

মদীনায় হিজরতকারী প্রথম মহিলা। কিন্তু মদীনায় হিজরতের অভিজ্ঞতা ছিল খুবই তিক্ত ও দুঃখজনক। ঐতিহাসিক ইবনে আসীর সেই ঘটনাটি হযরত উম্মে সালমার জবানীতেই পেশ করেছেন। তিনি বলেন, 'আবূ সালমা যখন মদীনা যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, তখন তাঁর কাছে একটি মাত্র উট ছিল। আমি এবং আমার পুত্র সালমাকে তার পিঠে সওয়ার করান। তিনি নিজে উটের লাগাম ধরে রওয়ানা করেন। বনু মুগীরা ছিল আমার সমগোত্রীয়।

এ গোত্রের লোকেরা আমাদেরকে দেখে ফেলে এবং আবূ সালমাকে বাধা দিয়ে বলে যে, আমরা আমাদের কন্যাকে এত খারাপ অবস্থায় যেতে দেব না। তারা আবূ সালমার হাত থেকে লাগাম ছিনিয়ে নেয় এবং আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলে যায়। ইতোমধ্যে আবূ সালমার খান্দানের লোক বনু আবদুল আসাদ এসে পৌঁছে। তারা পুত্র সালমাকে ছিনিয়ে নেয় এবং বনু মুগীরাকে জানিয়ে দেয় যে, তোমরা তোমাদের কন্যাকে স্বামীর সাথে যেতে না দিলে আমরাও আমাদের শিশুকে তোমাদের কন্যার সাথে কিছুতেই যেতে দেবো না। এখন আমি আমার স্বামী এবং পুত্র সন্তান তিনজনই একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম। শোকে-দুঃখে আমার অবস্থা কাহিল। যেহেতু হিজরতের হুকুম হয়েছিলো, তাই আবূ সালমা মদীনায় চলে যান। আমি একা রয়ে যাই। প্রতিদিন ভোরে ঘর থেকে বেরুতাম এবং একটা পাহাড়ে বসে বসে সন্ধ্যা পর্যন্ত ক্রন্দন করতাম। প্রায় এক বছর আমাকে এ অবস্থায় কাটাতে হয়। একদিন বনু মুগীরার এক ব্যক্তি, যিনি ছিলেন আমার বন্ধু, আমার এ অস্থিরতা দেখে দয়া পরবশ হয়ে তার বংশের লোকদেরকে একত্রিত করে বললেন, আপনারা এ অসহায়াকে কেন ছেড়ে দিচ্ছেন না ? একে তো আপনারা স্বামী এবং সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছেন। তার এ কথাগুলো বেশ কাজ করেছে। শেষ পর্যন্ত তাদের মনে দয়ার উদ্রেক হয়। তারা আমাকে অনুমতি দিয়ে বলে যে, তোমার ইচ্ছে হলে স্বামীর কাছে যেতে পার।

এটা শুনে বনু আবদুল আসাদের লোকেরাও সন্তান আমার কাছে ফেরত দেয়। এবার উটের পিঠে হাওদা বেঁধে পুত্র সালমাকে বুকে নিয়ে সওয়ার হই। আমি ছিলাম সম্পূর্ণ একা। এ অবস্থায় তয়গম পৌঁছি। সেখানে ওসমান ইবনে তালহা ইবনে আবূ তালহার সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমার অবস্থা জানতে পেরে জিজ্ঞেস করেন, তোমার সাথে কেউ আছে ? আমি বললাম, না, আমি একা। আর আমার এ শিশু সন্তান। তিনি আমার উটের লাগাম ধরে টেনে নিয়ে যান। আল্লাহ্ সাক্ষী, তালহার চেয়ে শরীফ লোক আরবে আমি পাইনি। মনযিল এলে আমার অবতরণ দরকার হলে তিনি গাছের আড়ালে চলে যেতেন। রওয়ানা করার সময় হলে তিনি

www.pathagar.com

উট নিয়ে আসতেন। আমি ভালোভাবে বসলে তিনি উটের লাগাম ধরে আগে আগে গমন করতেন। গোটা পথ এভাবে কাটে। মদীনা পৌঁছে বনু আমের ইবনে আওফ-এর জনপদ কোবা অতিক্রমকালে ওসমান ইবনে আবূ তালহা আমাকে জানান যে, তোমার স্বামী এ গ্রামে আছেন। আবূ সালমা এখানে অবস্থান করছেন। আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে স্বামীর সাথে সাক্ষাৎ হয়। আমাকে আবূ সালমার সন্ধান দিয়ে ওসমান ইবনে আবূ তালহা মক্কা ফিরে যান।'

এই ঘটনাটি উম্মে সালমার ওপর খুব প্রভাব ফেলে। তিনি তার সারা জীবনেও ঘটনাটি ভোলেন নি এবং ওসমান ইবনে তালহার মহানুভবতার কথা স্মরণ করেছেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, 'আমি কখনো ওসমান ইবনে তালহার চেয়ে শরীফ সাথী কাউকে দেখিনি।'

আমরা যদি ইসলাম প্রচারের সেই প্রথম দিকের দিকে নজর ফেরাই তা'হলে দেখবো হিজরতকালীন সময়ে আবূ সালমার খান্দানের ওপর যে অত্যাচার-নির্যাতন হয়েছে, যে কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে অন্যদের বেলায় তেমন হয়নি। উম্মে সালমা নিজেই বলেন, 'ইসলামের জন্য আবূ সালমার খান্দানকে যে কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে, তা আহলে বায়াতের আর কাউকে সইতে হয়েছে বলে আমার জানা নেই।'

উম্মে সালমা এমনই মর্যাদাবান পিতার সন্তান ছিলেন যখন হিজরতকালে তিনি মদীনার কোবা পল্লীতে পৌঁছান তখন তাঁর পরিচয় জানতে পেরে কেউই তা বিশ্বাস করতে চায়নি। কারণ ঐ জাহেলী যুগেও কোরাইশ বংশের আবূ উমাইয়ার মত সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলারা এমনি একা বেড়াতেন না। কিন্তু উম্মে সালমার ব্যাপরটা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি ইসলামের হুকুম আহকাম সর্বোপরি আল্লাহ্‌র নির্দেশকে নিজের জীবনের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন। এর কিছুদিন পর হজ্জ করার জন্য কিছু লোক যখন মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয় তখন উম্মে সালমা তাঁর পরিবারে একটা চিঠি পাঠান। এবার সবাই বিশ্বাস করে যে সত্যিই তিনি কোরাইশ বংশের আবূ উমাইয়ার সন্তান।

মদীনায় স্বামীর সাথে একত্রিত হওয়ার পর তাঁরা আবার সাংসারিক জীবন শুরু করেন। কিন্তু বেশিদিন একত্র থাকা সম্ভব হয়নি। এরই মধ্যে ডাক আসে ওহুদ যুদ্ধের। জিন্দাদীল প্রাণ, বীর যোদ্ধা আবূ সালমা ওহুদ যুদ্ধে বীরবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এ যুদ্ধে তিনি বহু শত্রু সৈন্যকেও নিধন করেন। তবে শত্রুর নিক্ষিপ্ত একটি তীর তাঁর বাহুতে এসে বিদ্ধ হয়। জখমটা ছিল মারাত্মক। দীর্ঘ একমাস চিকিৎসার পর তিনি কোন রকম সুস্থ হয়ে ওঠেন। জানা যায় এ ঘটনারও দু'বছর এগার মাস

www.pathagar.com

পর রসূল (সা.)-এর নির্দেশে তিনি 'কতন' এলাকায় একটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এ যুদ্ধে প্রায় এক মাস সময় লেগে যায়। এখানেও তিনি আঘাতপ্রাপ্ত হন। যতদূর জানা যায়, এ আঘাতটা তাঁর পূর্বের যখমীকে কাঁচা করে দেয়। তিনি মদীনায় ফিরে আসেন। যখমীর তীব্রতা বাড়তে থাকে। চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় কিন্তু কোন কিছুতেই আর কিছু হয়নি। হিজরী ৪ সালের জমাদাল আখরার ৯ তারিখে তিনি ইন্তেকাল করেন।

আবূ সালমার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে রসূল (সা.) তাঁর বাড়িতে ছুটে যান। শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা ও গভীর শোক প্রকাশ করেন। হযরত উম্মে সালমা যখন খুবই কাতর হয়ে বার বার বলছিলেন, 'অসহায় অবস্থায় কেমন মৃত্যু হয়েছে হায়!' তখন রসূল (সা.) তাঁকে ধৈর্য ধারণ করবার ও মরহুমের মাগফেরাতের জন্য দোয়া করতে বলেন। বিষয়টি সুনানে নাসাঈ নামক গ্রন্থের ৫১১ পৃষ্ঠায় এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে— হযরত রসূল (সা.) উম্মে সালমা (রা.)-কে বলেন, বলো, 'হে খোদা! আমাকে তার চেয়ে উত্তম উত্তারাধিকারী দাও। এরপর নবীজী আবূ সালমার মৃতদেহ দেখতে যান এবং অতি গুরুত্বের সাথে তাঁর জানাযার নামায পড়ান। এ জনাযার নামাযে তিনি ৯টি তাকবীর বলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়, ইয়া রসূলুল্লাহ! আপানার ভুল হয়নি তো? হযরত বললেন, ইনি হাজার তাকবীরের যোগ্য ছিলেন। ইন্তিকালের পর তাঁর চোখ খোলা ছিল। নবীজী নিজ হাতে তাঁর চোখ বন্ধ করে দেন এবং তাঁর জন্য মাগফেরাতের দোয়া করেন।'

উম্মে সালমা (রা.) তাঁর স্বামী আবূ সালমাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন। আর এ কারণে একবার তার স্বামীকে বললেন, 'যদি কোন স্ত্রীর স্বামী বেহেশতবাসী হয়, আর স্ত্রী তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর পুনর্বিবাহ না করে, তবে আল্লাহ সেই স্ত্রীকেও তার স্বামীর সঙ্গে বেহেশতে স্থান দান করেন। এইরূপ যদি স্ত্রীর মৃত্যু হয় তবে স্বামীও তার সঙ্গে বেহেশতে প্রবেশ করে।' অতএব, হে আবূ সালমা! আসুন আমরা উভয়ে চুক্তি করি যে, আপনার পরে আমি অথবা আমার পরে আপনি আর বিয়ে করবেন না। উত্তরে হযরত আবূ সালমা (রা.) বললেন, কিন্তু পুনঃ বিয়ে সুন্নত। আচ্ছা তুমি কি আমার উপদেশ মান্য করবে? উম্মে সালমা (রা.) বললেন, কেন করবো না? আপনার আনুগত্য ছাড়া আমি আর কোন কিছুতে খুশি হতে পারবো কি? তখন আবূ সালমা (রা.) বললেন, তবে শুন! আমি মারা গেলে আমার পরে তুমি বিয়ে করে ফেলো।' এরপর আবূ সালমা দোয়া করলেন, 'আয় মাবূদ! আমার পরে সালমাকে আমার থেকে উত্তম স্থলাভিষিক্ত দান করো।'

www.pathagar.com

উম্মে (সা.) বলেন, 'আমার স্বামী আবূ সালমা (রা.) মৃত্যুর পর আমি ভাবতাম যে, তাঁর থেকে উত্তম ব্যক্তি কে হতে পারে। এর কিছুদিন পরেই আমার হযরত রসূল (সা.)-এর সাথে শুভ পরিণয় অনুষ্ঠিত হয়।'

স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা উম্মে সালমা যখন অত্যন্ত অসহায়া ও দরিদ্র অবস্থায় দিনাতিপাত করছিলেন তখন হযরত আবূবকর (রা.) তাঁর অসহায়ত্বের কথা বিবেচনা করে বিয়ের প্রস্তাব দেন। কিন্তু তিনি এ বিয়েতে রাজি হননি। এক বর্ণনায় আছে হযরত ওমর (রা.)-ও বিয়ের প্রস্তাব দেন। অবশ্য অন্য বর্ণনা মতে হযরত ওমর (রা.) নিজের জন্য এ প্রস্তাব দেননি। বরং রসূল (সা.)-এর হয়ে তিনি এ প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। আসলে ইসলামের জন্য উম্মে সালমার অপরীসীম ত্যাগ, স্বামীর মৃত্যুর পর ছোট ছোট বাচ্চাদের নিয়ে বেহাল অবস্থা ইত্যাদির কথা চিন্তা করেই রসূল (সা.) এই প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন।

হযরত উম্মে সালমা (রা.) ছিলেন সুসাহিত্যিক, কাব্যপটু ও অসাধারণ পাণ্ডিত্বের অধিকারীণী একজন আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্না মহিলা। নবী (সা.)-র স্ত্রীদের মধ্যে সমস্ত দিক দিয়ে হযরত আয়েশা (রা.)-র পর তাঁর স্থান ছিল। রূপ সৌন্দর্য, জ্ঞান প্রজ্ঞায় বিভূষিতা এই মহিলার পক্ষে রসূল (সা.)-এর প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব ছিল না। তাই তিনি প্রস্তাবকারী হযরত ওমর (রা.)-কে পরিষ্কার ভাষায় বললেন, 'আমি ব্যক্তিগতভাবে রসূল (সা.)-এর প্রস্তাব স্বাগত জানাচ্ছি। এর সাথে সাথে আমি রসূল (রা.)-এর দরবারে তিনটি আরজ পেশ করছি—

ক) আমার স্বভাব প্রকৃতিতে আত্মমর্যাদার চেতনা অধিক।

খ) আমি একজন বিধবা মহিলা, আমার সন্তানাদি আছে।

গ) আমি একা, বিয়ের কাজ সম্পাদন করার আমার কেউ নেই।

হযরত ওমর (রা.) উম্মে সালমার এ আরজ শোনার পর বললেন, 'হে উম্মে সালমা, তুমি কেমন মহিলা! আমার প্রস্তাবে রাজি হওনি। এখন রসূলে করীম (সা.)-এর প্রস্তাবেও শর্তারোপ করছ!' বুদ্ধিমতি উম্মে সালমা উত্তর দিলেন, 'হে ওমর ইবনুল খাত্তাব! আমার ইয়াতিম সন্তান আছে। আমি নিঃস্ব! আমি আমার বাস্তব অবস্থা রসূল (সা.)-এর দরবারে কেবল তাঁর অবগতির জন্য পেশ করছি। এ কোন ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ কিংবা অহংকারবোধের বহিঃপ্রকাশ নয়।'

সব কথা শুনে রসূল (সা.) উম্মে সালমাকে বললেন, 'হে উম্মে সালমা! তোমার যে ইয়াতিম সন্তানদের কথা উল্লেখ করেছ তাদের লালন-পালনের ব্যবস্থা আল্লাহই করবেন, আর তোমার কেউ নেই সে সমস্যারও সামধান হবে।' এর

www.pathagar.com

কিছুদিন পর রসূল (সা.)-এর সাথে তাঁর বিয়ে হয়। সময়টা ছিল হিজরী ৪ সালের শাওয়াল মাস।

বিয়ের সময় রসূল (সা.) উম্মে সালমাকে দু'টি যাঁতা, একটি কলসী এবং খুরমার বাকলে ভর্তি একটি চামড়ার বালিশ দান করেছিলেন।

বিয়ের পর সন্তান-সন্ততিসহ উম্মে সালমা নবীজীর গৃহে আসেন এবং সংসার জীবন শুরু করেন। নবী স্ত্রীগণ দু'টি দলে বিভক্ত ছিলেন। এর একটির নেতৃত্বে ছিলেন, হযরত আয়েশা (রা.) এবং অপরটির নেতৃত্বে ছিলেন হযরত উম্মে সালমা (রা.)।

উপস্থিত বুদ্ধির জোরে উম্মে সালমা (রা.) হুদায়বিয়ার সন্ধির সময়ে যে, সংকটের সৃষ্টি হয়েছিল তা থেকে উত্তরণে রসূল (সা.)-কে সহযোগিতা করেছিলেন। ঘটনাটি ছিল– হুদায়বিয়ার সন্ধি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর রসূল (সা.) সেখানেই সবাইকে কোরবানী করার নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে কেউই রসূল (সা.)-এর হুকুম মত কাজ করেন নি। বরং চুপচাপ বসেছিলেন। আসলে বাহ্যত হুদায়বিয়ার সন্ধিটা ছিল সরাসরি মুসলমানদের স্বার্থের বিরুদ্ধে। যে কারণে মুসলমানেরা খুবই মনঃকষ্টে ভুগছিলেন। রসূল (সা.) কোরবানী করার জন্য পর পর তিনবার নির্দেশ দেন কিন্তু তবুও মুসলমানেরা যখন কোরবানী না করে চুপ রইলেন তখন অত্যন্ত বিষণ্ন মনে তিনি নিজ তাঁবুতে ফিরে গেলেন। এবং উম্মে সালমার কাছে পূর্বাপর সকল কিছু খুলে বললেন। উম্মে সালমা তখন রসূল (সা.)-কে বললেন, 'আপনি কাউকে কিছুই বলবেন না বরং বাইরে গিয়ে নিজের কোরবানী নিজে করে ফেলুন এবং ইহরাম ত্যাগ করার জন্য মাথার চুল কেটে ফেলুন।' তাঁর কথামত রসূল (সা.) বাইরে বেরিয়ে এসে নিজের কোরবানী নিজে করলেন এবং মাথা মুড়িয়ে (ন্যাড়া) ফেললেন। এরপর দেখা গেল একে একে সবাই রসূল (সা.)-এর অনুসরণে কোরবানী করলেন এবং ইহরাম ত্যাগ করলেন। এমন কি মাথা মুড়ানোর জন্য মোটামুটি ভিড় লেগে গিয়েছিল, যে কার আগে কে মাথা মুড়াবে।

বুঝা যায় হযরত উম্মে সালমা (রা.) কেমন বুদ্ধিমতি মহিলা ছিলেন। তাঁর বুদ্ধিভিত্তিক ও মনস্তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তের কারণেই সেদিন বড় ধরনের সংকট কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছিল। এ ব্যাপারে ইমামুল হারামাইন বলেছেন, 'মহিলা জগতের ইতিহাসে সঠিক সিদ্ধান্ত দানের এত বড় নযীর আর নেই।' (যুরকানী ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৭২)।

www.pathagar.com

উম্মে সালমা সম্পর্কে মাহমুদ বিন লবিদ বলেন, 'যদিও মাহনবী (সা.)-র সকল পত্নী আল্লাহ্‌র রসূলের প্রচুর হাদীস স্মৃতি ধার্য করেছিলেন, তবু তাদের মধ্যে হযরত আয়েশা (রা.) এবং উম্মে সালমা (রা.)-এর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না।'

তিনি রসূল (সা.)-এর মতই সুন্দর সুরে কোরআন তিলাওয়াত করতে পারতেন এবং ছাত্রদের শেখাতেন। উম্মে সালমা (রা.) সর্বমোট ৩৭৮টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি রসূল (সা.)-এর প্রত্যেকটি কথায় অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে শুনতেন, মনে রাখতেন এবং আমল করার চেষ্টা করতেন।

মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে ইবনে কিয়াম লিখেছেন, 'উম্মে সালমার ফতোয়াসমূহ যদি একত্রিত করা যায় তাহলে তা দিয়ে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা তৈরি হতে পারে।'

উম্মে সালমা (রা.) অতিশয় লাজুক প্রকৃতির মহিলা ছিলেন। বিয়ের পর রসূল (সা.) যখন উম্মে সালমা (রা.)-র ঘরে আসতেন তখন তিনি লজ্জার কারণে মেয়ে যয়নববে কোলে করে বসে থাকতেন। এ অবস্থা বেশ কিছু দিন বহাল ছিল। তারপর ধীরে ধীরে পরিস্থিতির উন্নতি হয়।

উম্মে সালমা (রা.) ছিলেন অত্যন্ত আমলদার একজন মহিলা। বিদায় হজ্জের সময় তিনি অসুস্থ ছিলেন। কিন্তু যথার্থ ওজর থাকা সত্ত্বেও যখন তিনি রসূল (সা.)-এর সাথে আগমন করেন, তখন রসূল (সা.) তাওয়াফ সম্পর্কে বললেন, 'উম্মে সালমা, ফজরের নামায চলাকালে উটের পিঠে সওয়ার হয়ে তুমি তাওয়াফ করবে।'

তিনি মাসে সোমবার, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার রোযা রাখতেন। কোরআনের পবিত্রতার আয়াত তাঁর ঘরেই নাযিল হয়। তিনি নামাযের মোস্তাহাব সময় ত্যাগ করা লোকদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'নবীজী যোহরের নামায জলদী পড়তেন, আর তোমরা আছরের নামায জলদী পড়।' উম্মে সালমা উদার হাতে দান-খয়রাত করতেন। তিনি একটি খেজুর হলেও তা ভিক্ষারীর হাতে দিতে বলেছেন।

রসূল (সা.)-এর ইন্তেকালের পর উম্মে সালমা (রা.) স্বামীর স্মৃতি ধরে রাখার জন্য তাঁর চুল মোবারক একটা রূপার কৌটায় সংরক্ষণ করে রাখেন এবং দর্শনার্থীদের দেখাতেন।

উম্মে সালমা (রা.) চমৎকার স্বাস্থ্যের অধিকারিণী ছিলেন। তিনি তৎকালীন আরবের একজন রূপবতী মহিলা ছিলেন। রসূল (সা.)-এর ঔরসে তাঁর গর্ভে কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করেনি। পূর্ববর্তী স্বামী আবূ সালমার ঘরে তাঁর দু'পুত্র সালমা ও ওমর এবং দু' কন্যা দুররা ও বাররা জন্মগ্রহণ করেন। বাররার নাম রসূল (সা.)

www.pathagar.com

পরিবর্তন করে রাখেন জয়নব। সালমা বড় হলে হামযা (রা.)-র কন্যা উসামার সাথে বিয়ে দেন। দ্বিতীয় পুত্র ওমর হযরত আলী (রা.)-র শাসনামলে ফারেস ও বাহরাইনের শাসনকর্তা ছিলেন। এই ওমর (রা.)-এর উদ্যেগেই রসূল (সা.) ও উম্মে সালমার বিয়ে হয়।

উম্মুল মু'মীনীন হযরত উম্মে সালমা (রা.) ৬৩ হিজরী সনে ৮৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। হযরত আবূ হোরায়রা (রা.) তাঁর জানাযার নামায পড়ান। জানাযা শেষে তাকে মদীনার জান্নাতুল বাকীতে সমাধিস্থ করা হয়।

www.pathagar.com

হযরত জয়নব (রা.)

'আল্লাহ্ তা'আলা আসমানে আমার আকদ সম্পন্ন করেছেন, আর আমার বিয়েতেই নবীজী গোশত-রুটি দিয়ে ওলীমার ব্যবস্থা করেছেন।' কথাগুলি তাঁর বিয়ের ব্যাপারে গর্বভরে বলতেন হযরত জয়নব বিনতু জাহাশ (রা.)।

তাঁর নাম জয়নব। পূর্বে তাঁর নাম ছিল বুররাহ্। ডাক নাম উম্মে হাকাম। আব্বার নাম জাহাশ। ইনি তৎকালীন আরবের সম্মানিত ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন। তাঁর মার নাম ছিল উমাইয়া বিনতু আবদুল মুত্তালিব। অর্থাৎ জয়নব বিনতু জাহাশ (রা.) রসূল (সা.)-এর আপন ফুফাতো বোন ছিলেন।

তাঁর বংশ লতিকা ছিল এ রকম, জয়নব বিনতু জাহাশ ইবনে রুবাব ইবনে ইয়া' মা'র ইবনে সোবরা ইবনে মুবরা ইবনে কাসীর ইবনে গানাম ইবনে দুদরান ইবনে আসাদ খোযায়মা।

পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে তিনি নবুয়তের সূচনালগ্নে ইসলাম গ্রহণ করেন। সেই সূত্রে তিনি সাবেকুনাল আউলুনদের পর্যায়ভুক্ত হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন।

অবিশ্বাসী মক্কাবাসিগণের অত্যাচার যখন সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন রসূল (সা.)-এর নির্দেশে পরিবারের অন্যান্য সদস্যের সাথে জয়নব (রা.) আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। পরে সেখান থেকে মদীনায় হিজরত করেন।

তৎকালীন আরব সমাজে অন্যান্য পণ্য সামগ্রীর সাথে বাজারে মানুষও বেচাকেনা হত। যাদেরকে বাজারে পণ্য সামগ্রীর মত বেচাকেনা করা হতো তারা ক্রীতদাসরূপে পরিচিত ছিল। নবুয়াতের পূর্বে ও সুচনালগ্নেও এ প্রথা চালু ছিল। পরবর্তীকালে রসূল (সা.) খোলাফায়ে রাশেদা, সাহাবাগণ ও পরবর্তীকালের মুসলিম শাসকগণ ধীরে ধীরে এ কু-প্রথার বিলুপ্তি সাধন করেন।

হ্যাঁ! যা বলছিলাম, সেই জাহেলী যুগের প্রথা অনুযায়ী হযরত খাদীজা (রা.)-এর ভাতিজা হাকীম ইবনে খুজাইমা বাজার থেকে যায়েদ ইবনে হারিসা নামের এক দাস বালককে কিনে এনে ফুফুকে উপহার হিসেবে দিলেন। পরবর্তীতে হযরত খাদীজা প্রিয় দাস যায়েদকে স্বামী মুহাম্মদ (সা.)-এর খেদমতের জন্য দিয়ে দিলেন। কিন্তু দয়ার সাগর, সর্বমানবতার মুক্তিদূত, রহমাতাল্লিল আলামীন তাকে আযাদ

www.pathagar.com

(মুক্ত) করে দিলেন। এমনকি আপন পালক পুত্র হিসেবে তাকে গ্রহণ করলেন। রসূল (সা.)-এর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে যায়েদ ইসলাম কবুল করলেন এবং অচিরেই নিজেকে কোরআন হাদীসের জ্ঞানে সমৃদ্ধ করে তুললেন।

এই ক্রীতদাস হযরত যায়েদ (রা.)-এর সাথে রসূল (সা.)-এর আপন ফুফাতো বোন অনিন্দ্য সুন্দরী জয়নব বিনতু জাহাশ (রা.)-এর বিয়ে দেন। রসূল (সা.)-এর উদ্দেশ্য ছিল মানুষের মধ্যে সমতা ফিরিয়ে আনা। সব মুসলমান সমান, সকলে ভাই ভাই, আশরাফ-আতরাফের কোন বালাই ইসলামে নেই। ইসলামের সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েই তিনি একজন সদ্য আজাদপ্রাপ্ত ক্রীতদাসের সাথে আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ বংশ, কোরাইশ বংশের মেয়ে তাও আবার নিজেরই ফুফাতো বোনকে বিয়ে দেন। কিন্তু নারীসুলভ মানষিকতার কারণে হযরত জয়নব (রা.) এ বিয়েকে ভাল মনে নিতে পারেন নি। যে কারণে বিয়ের প্রায় এক বছর একত্রে বসবাস করার পরও তাদের মধ্যে সার্বিক অর্থে কোন ভাল সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারেনি। ফলে হযরত যায়েদ (রা.) প্রচণ্ড অশান্তির মধ্যে দিনাতিপাত করছিলেন।

আসলে জয়নব (রা.) বিয়ের আগেই রসূল (সা.)-এর খেদমতে যায়েদ (রা.) সম্বন্ধে আরয করেছিলেন, 'আমি তাঁকে আমার জন্য পছন্দ করি না।' তিনি শুধু রসূল (সা.)-এর নির্দেশ মেনে নেয়ার জন্যই এ বিয়েতে রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু যখন দু'জনের মধ্যে মোটেই বনিবনা হচ্ছিল না তখন একদিন যায়েদ (রা.) এসে রসূল (সা.)-কে বললেন, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! জয়নব আমার কথার ওপর কথা বলে তর্ক করে, আমি তাকে তালাক দিতে চাই।'

একথা শুনে রসূল (সা.) যায়েদ (রা.)-কে আল্লাহ্‌র ভয় দেখিয়ে তালাক দেয়া থেকে বিরত থাকতে বললেন। কারণ তালাক দেয়া শরীয়ত মতে জায়েজ হলেও পছন্দনীয় ও কাম্য কাজ নয়। এমন কি বৈধ কাজসমূহের মধ্যে এ কাজটি নিকৃষ্টতম ও সর্বাধিক ঘৃণিত। যে কারণে হযরত (সা.) তাঁকে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কি তার মধ্যে কোন ত্রুটি দেখতে পেয়েছো?' যায়েদ উত্তর করলেন 'না! কিন্তু আমি তার সংগে বসবাস করতে পারবো না।' হযরত (সা.) তাঁকে আদেশের সুরে বললেন, 'বাড়িতে ফিরে গিয়ে তোমার স্ত্রীকে দেখাশোনা কর, তার সংগে ভাল আচরণ কর এবং আল্লাহকে ভয় কর। কারণ আল্লাহ বলেছেন, 'তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সদাচরণ কর আর আল্লাহকে ভয় কর।' কিন্তু তাদের সম্পর্ক এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে শেষ পর্যন্ত হযরত যায়েদ (রা.) রসূল (সা.) নিষেধ করার পরও জয়নব (রা.)-কে তালাক দিয়ে দেন।

www.pathagar.com

এ বিষয়টি সূরা আহযাবে এভাবে বর্ণিত হয়েছে, 'হে নবী! সেই সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন তুমি সে ব্যক্তিকে, যার প্রতি আল্লাহ্ এবং তুমি অনুগ্রহ করেছিলে, বলেছিলে যে, তোমার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করো না এবং আল্লাহকে ভয় কর।'

যায়েদ (রা.) যখন জয়নব (রা.)-কে তালাক দিলেন তখন জনগণের মধ্যে জল্পনা কল্পনা চলতে লাগলো, ক্রীতদাসের তালাক প্রাপ্তাস্ত্রীকে কে-ই বা বিয়ে করবে। সত্যি কথা বলতে কি, তালাকপ্রাপ্তা হওয়ার পর জয়নব (রা.) হয়ে গেলেন অবজ্ঞা ও ঘৃণার পাত্রী! এ অবস্থা থেকে জয়নব (রা.)-কে রেহাই দিতে আল্লাহ্ রসূল (সা.)-এর সাথে তাঁকে বিয়ে দিতে মনস্থ করলেন। তাই জয়নব (রা.) তালাকপ্রাপ্তা হওয়ার পর ইদ্দত পুরা হলে রসূল করীম (সা.) তাঁকে বিয়ে করার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। কিন্তু জাহেলী প্রথা সেখানে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কারণ হযরত যায়েদ (রা.) ছিলেন রসূল (সা.)-এর পালক পুত্র। তৎকালীন আরবের লোকজন পালক পুত্রকে আপন পুত্রের মতই মনে করত। যায়েদ (রা.) ঐ সময়ে যায়েদ ইবনে মুহাম্মদ (সা.) নামেই পরিচিত ছিলেন। ফলে রসূল (সা.) অপবাদের আশংকা করছিলেন। তা'ছাড়া মোনাফিকদের তর্জন গর্জনও ছিল। যাই হোক, আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন চাচ্ছিলেন সকল প্রকার কুসংস্কারের মুলৎপাটন করে নির্ভেজাল একটি ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার। তাই আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন সবকিছু নিরসন কল্পে ঘোষণা করলেন, 'তোমাদের পুরুষদের মধ্যে মুহাম্মদ (সা.) কারো পিতা নন বরং তিনি আল্লাহ্র রসূল এবং সর্বশেষ নবী। (সূরা আহযাব-৪০)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরও ঘোষণা করেন, 'তাদেরকে তাদের পিতার নামে ডাক। এটাই আল্লাহ্র নিকট অধিক সঙ্গত।' আল্লাহ্ আরো বলেন, 'তুমি অন্তরে তা গোপন করছিলে, যা আল্লাহ্ প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন, তুমি মানুষকে ভয় করছ, অথচ আল্লাহই তো বেশি ভয় পাওয়ার যোগ্য।' (সূরা আহযাব ঃ ৩৭) রসূল (সা.) নিশ্চিন্ত হলেন। এরপর তিনি যায়েদকেই পাঠালেন বিয়ের পরগাম নিয়ে জয়নব (রা.)-এর কাছে। তিনি জয়নব (রা.)-এর গৃহে গিয়ে বললেন, 'আল্লাহ্র রসূল (সা.) তোমাকে বিয়ে করতে চান।' তিনি বললেন, 'এটা খুব ভাল কথা। তবে ইস্তেখারা করে সিদ্ধান্ত নেব।' তিনি ইস্তেখারায় বসে গেলেন। ইতোমধ্যেই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রসূল (সা.) ও জয়নব (রা.)-এর বিয়ের ব্যাপারে আয়াত নাযিল হল।

'অতঃপর যায়েদ যখন তার কাছ থেকে হিস্যা পূর্ণ করে নিল তখন আমি তাঁকে তোমার নিকট বিয়ে দিলাম। যাতে প্রয়োজন পুরো করার পর মুখ ডাকা পুত্রের স্ত্রীদের ব্যাপারে মু'মীনদের ওপর কোন দোষারোপ না চলে। আল্লাহ্র ইচ্ছে তো পূরণ হবেই।' (সূরা আহযাব ঃ ৩৭)

www.pathagar.com

সরাসরি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে, 'তখন আমি তাঁকে তোমার নিকট বিয়ে দিলাম।' এমন কথা নাযিল হওয়ার পর বিয়ের কাজ সম্পন্ন করা হল। সময়টা ছিল ৫ম হিজরীর জিলকদ মাস। এ জন্যেই হযরত জয়নব (রা.) গর্ব করে বলতেন, 'আমার বিয়ে স্বয়ং আল্লাহ্ দিয়েছেন।'

এ বিয়েতে বেশ আনন্দ করা হয়। আলিমা অনুষ্ঠানে আনসার ও মুহাজিরদের প্রায় তিন'শজনকে দাওয়াত করা হয়। খাওয়ার মেনু ছিল গোশত-রুটি। একেক বারে দশজন করে লোক খেতে বসছিলেন। কিন্তু শেষ দলের লোকজন খাওয়া শেষ হওয়ার পরও বসেছিলেন। তারা নানা গল্পে মেতে উঠলেন। ফলে রাত ক্রমেই গভীর হতে লাগলো। রসূল (সা.) লজ্জার কারণে মেহমানদেরকে উঠতে বলতে পারছিলেন না, অথচ খুব অস্বস্তি অনুভব করছিলেন। ঠিক এ সময়ে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পর্দার আয়াত নাযিল হয়। ইরশাদ হচ্ছে –

'হে ঈমানদার লোকেরা। তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া না হলে তোমরা নবী গৃহে প্রবেশ করবে না। অবশ্য খাবার দাওয়াত পেলে যাবে, তবে ডাকবার আগে গিয়ে অনর্থক বসে থাকবে না। বরং ডাকবার পরে যাবে, খাওয়ার পরে চলে আসবে। বসে গল্প-গুজবে রত হবে না। নিশ্চয় এটা নবীর জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদেরকে বলতে সংকোচ বোধ করেন, কিন্তু আল্লাহ সত্য কথা বলতে সংকোচ বোধ করেন না। তোমরা নবীর স্ত্রীদের নিকট কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে।' (আহযাব ঃ ৫৩)

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রসূল (সা.) দরজায় পর্দা ঝুলিয়ে দেন। ফলে লোকদের ভেতরে যাওয়া বন্দ হয়ে যায়।

রসূল (সা.) ও জয়নব (রা.)-এর বিয়ের ফলে আরবের দীর্ঘদিনের প্রচলিত একটি ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটে, তা হল-পালক পুত্র আদৌ আপন পুত্র হতে পারে না। ফলে তার স্ত্রীকে বিয়ে করাও দোষণীয় নয়। ইসলাম পরিষ্কারভাবে ১৪ জন নারীকে বিয়ে করা নিষিদ্ধ করেছে। বাকী সবাইকে বিয়ে করা জায়েয।

এ বিয়ের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তা হল –

১. জাহেলী যুগে পালক পুত্র আসল পুত্রের মর্যাদাসম্পন্ন ছিল। এই প্রথার বিলুপ্তি ঘটানো হয়েছে।
২. লোকদেরকে আদেশ করা হয় যে, কাউকে তার প্রকৃত পিতা ব্যতীত অন্যের সাথে পিতৃ পরিচয়ে সম্পর্ক করা যাবে না।
৩. মানুষের মধ্যে উঁচু-নীচুর কোন ব্যবধান থাকবে না।
৪. আল্লাহ পাক ওহীর মাধ্যমে হযরত জয়নব (রা.)-এর বিয়ে দেন।

www.pathagar.com

৫. জয়নবের সাথে বিয়ের সময় পর্দার আয়াত নাযিল হয় এবং পর্দা প্রথার প্রচলন হয়।

৬. একমাত্র জয়নবের বিয়েতেই জাঁকজমকপূর্ণভাবে অলিমা অনুষ্ঠান করা হয়।

শারীরিক গঠনের দিক দিয়ে হযরত জয়নব (রা.) ছিলেন ক্ষুদ্রকায় কিন্তু সুন্দরী ছিলেন। সাথে সাথে শোভন শারীরিক গঠন ছিল তাঁর।

তিনি অত্যন্ত দীনদার পরহেযগার, উদার, দয়ার্দ্রচিত্ত, বিনয়ী ও সৎ স্বভাবী ছিলেন। আর তিনি ছিলেন পরিশ্রমী একজন মহিলা। তিনি হস্তশিল্পের কাজে খুবই পারদর্শী ছিলেন। তিনি নিজ হাতে রোজগার করে সংসার চালাতেন। তাঁর পরহেযগারিতার ব্যাপারে রসূল (সা.)-এর সাক্ষ্য পাওয়া যায়। একবার সাহাবীদের মধ্যে রসূল (সা.) কিছু মাল বিতরণ করছিলেন। কিন্তু বিবি জয়নবের পরামর্শক্রমে তা কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ রাখেন। এতে হযরত ওমর (রা.) গোস্বা হয়ে জয়নবকে ধমক দিলে রসূল (সা.) বলেন, 'ওমর! জয়নবকে কিছু বলো না। সে খুবই আল্লাহ ভীরু ও ইবাদতের সময় ক্রন্দনশীলা।'

একবার হযরত ওমর (রা.) বায়তুল মাল থেকে বিবি জয়নবকে এক বছরের খরচ পাঠিয়ে দেন। জয়নব (রা.)-এর সামান্য অংশ একটি চাদরে ডেকে রেখে বাকী সমস্ত কিছু গরীব মিসকীনদের মধ্যে বন্টন করে দেয়ার জন্য পরিচারিকাকে নির্দেশ দেন। এ সময় পরিচারিকা আরজ করলেন, আম্মাজান! গরীবদের মাঝে আমিও একজন। সুতরাং এ মাল হতে আমিও কিছু পেতে পারি। বিবি জয়নব বললেন, চাদরে ঢাকা যা আছে সবই তোমার, বাকীগুলো তুমি দান করে দাও।'

সব কিছু দান করার পর তিনি মহান রব্বুল আলামীনের উদ্দেশ্যে আরজ করলেন, 'ইয়া রাব্বুল আলামীন। বায়তুল মাল হতে দান যেন আর আমাকে গ্রহণ করতে না হয়।' তাঁর এ মুনাজাত কবুল হয় অর্থাৎ ঐ বছরেই তিনি ইন্তেকাল করেন।

স্ত্রীদের প্রশ্নের জবাবে রসূল (সা.) একদিন বলেছিলেন, 'হে আমার পবিত্রা স্ত্রীগণ! তোমাদের মাঝে যার হাত দীর্ঘ ও লম্বা সে আমার ইন্তেকালের পর আমার সাথে সর্বাগ্রে মিলিত হবে।' রসূল (সা.)-এর এ কথার অর্থ প্রথমদিকে সবাই করেছিলেন, যার হাত মাপে দীর্ঘ সেই বুঝি আগে ইন্তেকাল করবেন। কিন্তু যখন দেখা গেল হযরত জয়নব (রা.) ইন্তেকাল করেছেন, তখন সবাই বুঝলেন দীর্ঘ হাত বলতে রসূল (সা.) দানের হাত বুঝিয়েছেন।

www.pathagar.com

হযরত জয়নব বিনতু জাহাশ (রা.) ছিলেন আত্মমর্যাদা সম্পন্না মহিলা। মুহাম্মদ ইবনে ওমর বর্ণনা করেন যে, 'একদিন হযরত জয়নব (রা.) নবীজীকে বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! আমি আপনার অন্য স্ত্রীদের মত নই। তাঁদের মধ্যে একজনও এমন নেই, যার বিয়ে পিতা-ভাই বা বংশের অন্য কারো অভিভাবকত্বে সম্পন্ন হয়নি। একমাত্র আমিই ব্যতিক্রম। আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে আসমান থেকে আপনার স্ত্রী করেছেন।'

হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, 'আমি দীনের ব্যাপারে জয়নব (রা.) থেকে উত্তম কোন মহিলা দেখিনি।'

মূসা ইবনে তারেক হযরত জয়নব (রা.) সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা.) থেকে উদ্ধৃত করে বলেন, 'দীনদারী, তাকওয়া, সত্যবাদিতা, আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি সহানুভূতি, দানশীলতা এবং আত্মত্যাগে তাঁর চেয়ে উত্তম মহিলা আর কেউ ছিল না।'

হযরত আয়েশা (রা.) তাঁর সম্বন্ধে আরও বলেছেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা জয়নব বিনতু জাহাশের প্রতি রহম করুন। সত্যি দুনিয়ায় তিনি অনন্য মর্যাদা লাভ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় নবীর সাথে তাঁকে বিয়ে দিয়েছেন এবং তাঁর প্রসঙ্গে কোরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে।

তাঁর সম্বন্ধে হযরত উম্মে সালমা (রা.) বলেন, 'তিনি ছিলেন অতি নেককার, অতি রোযাদার এবং অতি ইবাদাত গুজার স্ত্রী।'

তিনি সর্বমোট ১১টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। উম্মে হাবীবা, যয়নব বিনতু আবি সালামা, কুলসুম প্রমুখ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হিজরী ২০ সালে হযরত ওমর (রা.)-এর শাসন আমলে ৫৩ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। ইন্তেকালের সময় শুধু একটি মাত্র গৃহ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তাঁর স্মৃতি চিহ্ন এই গৃহটি উমাইয়া খলীফা ওয়ালীদ ইবনে আবদুল মালেক ৫০ হাজার দিরহামের বিনিময়ে তাঁর আত্মীয়-স্বজনের নিকট থেকে ক্রয় করে মসজিদে নববীর আন্তর্ভুক্ত করেন।

মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর কাফনের কাপড় তৈয়ার করে যান। এ ব্যাপারে তিনি অছিয়ত করেন যে, 'ওমর আমার জন্য কাপড় পাঠাতে পারে। এমন হলে এক প্রস্থ কাপড় ছদকা করে দেবে।'

তাঁর অছিয়ত অনুযায়ী রসূলে খোদার খাটিয়ায় করে তাঁকে দাফন করতে নিয়ে যাওয়া হয়। এ খাটিয়াতে করে হযরত আবূবকর (রা.)-এর লাশও বহন করা হয়।

www.pathagar.com

তবে আবূবকর (রা.)-এর পর যাদের লাশ বহন করা হয়, তাদের মধ্যে জয়নব (রা.) ছিলেন প্রথম মহিলা।

আযওয়াজে মুতাহহারাতের মত অনুযায়ী হযরত ওমর (রা.)-এর নির্দেশে মুহম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ, উসামা ইবনে যায়েদ, আবদুল্লাহ ইবনে আবূ আহমদ ইবনে জাহাশ এবং মুহাম্মদ ইবনে তালহা তাঁর লাশ কবরে নামান। এঁরা সবাই ছিলেন হযরত জয়নব (রা.)-এর নিকটাত্মীয়।

হযরত আয়েশা (রা.) তাঁর মৃত্যুতে শোকাহত হয়ে বলেছিলেন, 'ভাগ্যবতী অন্যন্যা মহিলা বিদায় নিয়েছেন। এতীমরা হয়ে পড়েছে অস্থির ব্যাকুল। তিনি ছিলেন এতীমদের আশ্রয়স্থল।'

হযরত ওমর (রা.) তাঁর জানাযার নামায পড়ান। তাকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়। আকীল এবং হানফিয়ার কবরের মধ্যস্থলে তাঁর কবরের অবস্থান। তাঁর দাফন করার দিন প্রচণ্ড গরম পড়ছিল। এজন্য ওমর (রা.) সেখানে তাঁবু গাড়েন। জানা যায় কবর খননের জন্য জানাতুল বাকীতে এটা ছিল প্রথম তাঁবু।

www.pathagar.com

হযরত জুয়াইরিয়া (রা.)

নাম জুয়াইরিয়া। পূর্ব নাম ছিল বাররা। রসূল (সা.) তাঁর নাম পরিবর্তন করে রাখেন জুয়াইরিয়া। আব্বার নাম হারেস। ইনি বনু মুস্তালিক গোত্রের সর্দার ছিলেন। তাঁর বংশ লতিকা নিম্নরূপ, জুয়াইরিয়া বিনতু হারেস ইবনে আবিদিদার ইবনে হাবীব ইবনে আয়েয ইবনে মালেক ইবনে জুয়াইমা ইবনে আসাদ ইবনে আমর ইবনে রবীয়া ইবনে হারিসা ইবনে আমর মুযিকিয়া।

জুয়াইরিয়া (রা.)-র প্রথম বিয়ে হয়েছিল তাঁর নিজের গোত্রের মুসাফা ইবনে সাফওয়ান মুসতালেফীর সাথে। মুসাফ সম্পর্কে জুয়াইরিয়া (রা.)-র চাচাত ভাই ছিলেন। তিনি ইবনে যিয়ার নামেও পরিচিত ছিলেন।

জুয়াইরিয়া (রা.)-র পিতা এবং স্বামী দু'জনই ইসলামের ঘোর শত্রু ছিলেন। তারা কোরাইশদের প্ররোচনায় অথবা নিজেদের ইচ্ছায় মদীনার ওপর আক্রমণ করার পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন। সংবাদটি রসূল (সা.)-এর কানে পৌছুলে তিনি এর সত্যতা যাচাই-এর জন্য বুরাইদা ইবনে হাবীব আসলামীকে ঘটনাস্থলে প্রেরণ করেন সরেজমিনে তদন্ত করার জন্য। বুরাইদা ফিরে এসে সংবাদটি সত্য বলে জানালে রসূল (সা.) তাঁর বাহিনী নিয়ে রওনা হন এবং মুরাইস নামক স্থানে অবস্থান নেন। এই মুরাইসী নামক স্থানটি মদীনা থেকে নয় মাইল দূরে। আর সময়টি ছিল হিজরী ৫ম সনের শাবান মাস।

ওদিকে মুসলমান বাহিনীর আগমন, অবস্থান গ্রহণ ও রণসজ্জার খবর শুনে মুস্তালিক গোত্র প্রধান হারেস তাঁর সংগঠিত বাহিনী থেকে সটকে পড়েন। কিন্তু তাঁর বাহিনীর মনোবল ছিল অটুট। হারেসের অধীনস্থ বাহিনী কিছুমাত্র পিছু না হটে মুসলিম বাহিনীর সাথে মরণপণ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। প্রচণ্ড যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হওয়ার পর দেখা গেল মুসলিম বাহিনী জয়লাভ করেছে। এ যুদ্ধে বনী মুস্তালিক গোত্রের এগার জন নিহত হয় ও ছয়শত সেনা মুসিলম বাহিনীর হাতে বন্দী হয়। আর দুই হাজার উট ও পাঁচ হাজার ছাগলও মুসলমানদের দখলে আসে। এই যুদ্ধে জুয়াইরিয়ার স্বামী মোনাযেত নিহত হন।

উক্ত যুদ্ধবন্দীদের সাথে বন্দী অবস্থায় গোত্র প্রধান হারেসের কন্যা জুয়াইরিয়াও ছিলেন। তৎকালীন আরবের নিয়ম অনুযায়ী যুদ্ধবন্দীদেরকে গোলাম হিসেবে বিলি বন্টন করা হত। সেই মুতাবেক জুয়াইরিয়া সাবিত ইবনে কায়েসের ভাগে পড়েন।

www.pathagar.com

পূর্বেই বলেছি জুয়াইরিয়া ছিলেন গোত্র প্রধানের কন্যা। যে কারণে তিনি দাসীর জীবন মেনে নিতে পারছিলেন না। সে জন্য তিনি সাবিত (রা.)-এর কাছে অর্থের বিনিময়ে মুক্তির আবেদন জানান। সাবিত (রা.) ১৯ উকিয়াহ স্বর্ণের বিনিময়ে এ আবেদন মঞ্জুর করেন।

কিন্তু জুয়াইরিয়ার কাছে এত বিপুল স্বর্ণ বা সম্পদ না থাকার কারণে তিনি এ ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য স্বয়ং রসূল (সা.)-এর নিকট আবেদন করেন। এ ঘটনাটি হযরত আয়েশা (রা.) এভাবে বর্ণনা করেছেন, 'রসূলুল্লাহ (সা.) বনু মুস্তালিকের যুদ্ধ বন্দীদেরকে বন্টন করলে জুয়াইরিয়া বিনতু হারেস সাবিত ইবনে কায়েসের ভাগে পড়েন। জুয়াইরিয়া তৎক্ষণাৎ মুক্তিপণ দিয়ে মুক্তি লাভের উদ্যোগ নেন। তিনি ছিলেন খুবই লাবণ্যময়ী মিষ্টি মেয়ে। তাঁকে যে-ই দেখতো সেই মুগ্ধ হয়ে যেত। জুয়াইরিয়া মুক্তিলাভের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (সা.) কাছে সাহায্য কামনা করেন। তিনি রসূলুল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ (সা.) আমি হারেস ইবনে আবূ দিরারের কন্যা। আমার পিতা গোত্রের সরদার, আমি কি বিপদে পড়েছি তা আপনার অজানা নয়। আমি সাবিত ইবনে কায়েসের ভাগে পড়েছি। আমার মুক্তিপণ আদায়ে আপনার সাহায্য কামনা করছি। রসূলল্লাহ (সা.) বললেন, আমি যদি তোমার জন্য আরো ভাল কিছুর ব্যবস্থা করি ? তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল, সেটা কি ? তিনি বললেন, আমি তোমার পক্ষ হতে মুক্তিপণ আদায় করে দিয়ে তোমাকে বিয়ে করবো। জুয়াইরিয়া বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি এতে রাজি আছি। তখন রসূল (সা.) বললেন, আমি তাই করলাম। মুসলমানগণ যখন জানতে পারলেন যে, রসূলুল্লাহ (সা.) জুয়াইরিয়াকে বিয়ে করেছেন তখন তারা তাদের হাতে বন্দী বনু মুস্তালিকের সব লোককে রসূলুল্লাহ (সা.)-র আত্মীয় বিবেচনা করে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। এভাবে বনু মুস্তালিকের ছয়'শ বন্দী শুধু রসূলুল্লাহ (সা.)-র সাথে জুয়াইরিয়ার বিয়ে হওয়ার কারণে মুক্তি লাভ করলো। সত্যি বলতে কি নিজ গোত্রের জন্য জুয়াইরিয়ার চেয়ে কল্যাণকর প্রমাণিত হয়েছে এমন কোন মহিলার কথা আমার জানা নেই।'

অন্য একটি বর্ণনা এরূপ— ইবনে আসীর (রা.) বলেন, 'জুয়াইরিয়ার আব্বা যখন জানতে পারলেন যে, তার কন্যা বন্দী হয়ে আছে, তখন তিনি অনেক সম্পদ ও আসবাবপত্র কয়েকটি উটের ওপর বোঝাই করে কন্যার মুক্তির জন্য মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে পছন্দনীয় দু'টি উট 'মাফিক' নামক স্থানে লুকিয়ে রেখে অবশিষ্ট উট ও আসবাব নিয়ে রসূল (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, 'আপনি আমার কন্যাকে বন্দী করে এনেছেন। এইসব মাল ও আসবাবপত্র নিন, বিনিময়ে আমার কন্যাকে ফিরিয়ে দিন।'

www.pathagar.com

রসূল (সা.) বললেন, 'যে দু'টি উট তুমি লুকিয়ে রেখে এসেছ তা কোথায়?' রসূল (সা.)-এর কথা শুনে হারেস আশ্চর্য হয়ে গেলেন এবং তখনই ইসলাম গ্রহণ করলেন। এরপর যখন জানতে পারলেন যে, তাঁর কন্যা রসূল (সা.)-এর স্ত্রী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন, তখন তিনি সীমাহীন খুশি হন এবং কন্যার সাথে সাক্ষাৎ করে গৃহে ফিরে যান।

মূলত রসূল (সা.) এই বিয়েটা করেছিলেন সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে। একটু চোখ-কান খুলে বিয়ের বিষয়টা দেখলেই পরিষ্কার হয় যে, বিয়েটা ছিল রাজনৈতিক দূরদর্শীতার এক মাইল ফলক। এ বিয়ের ফলে রসূল (সা.) তথা মুসলমানগণ কূটনৈতিকভাবে বিজয় লাভ করেন। কারণ বনু মুস্তালিক গোত্রের সকল মানুষ ছিল ইসলাম ও মুসলমানদের চরম শত্রু। তারা কোন প্রকারেই রসূল (সা.) ও মুসলমানদের মেনে নিতে রাজি ছিল না। এমতাবস্থায় রসূল (সা.) জুয়াইরিয়াকে বিয়ে করার ফলে বনু মুস্তালিকের সফল যুদ্ধ বন্দী বেকসুর মুক্তি লাভ করে। ফলে হঠাৎ করেই জানি দুশমন বন্ধুতে পরিণত হয়। বনু মুস্তালিক গোত্রের কেউ আর কোনদিন রসূল (সা.) ও মুসলমানদের বিরোধিতা করেনি। এমন কি তারা ধীরে ধীরে সকলেই ইসলামের পতাকাতলে আশ্রয় গ্রহণ করে।

হযরত জুয়াইরিয়া (রা.) ছিলেন অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্না ও স্বাধীনচেতা মহিলা। যে কারণে তিনি বন্দী জীবন সহ্য করতো পারেন নি। তিনি দেখতে ছিলেন সুন্দরী এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী। তাঁর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আয়েশা (রা.) বলেন, 'জুয়াইরিয়া দেখতেই শুধু কেবল সুন্দরী ছিলেন না, বরং তাঁর অনুপম চেহারায়, চিত্তাকর্ষক লাবণ্যে এবং মধুর আচরণে এমন এক মাধুর্য নিহিত ছিল, যাতে করে যে কোন লোক তাঁর সান্নিধ্যে আসত, সে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল, বিমুগ্ধ ও আকৃষ্ট হয়ে যেত। তাঁকে দেখলেই দর্শকের মনে একটা স্থায়ী মমতার চিহ্ন ফুটে উঠতো।'

জুয়াইরিয়া (রা.) একজন ইবাদত গুজার মহিলা ছিলেন । জানা যায় তিনি প্রায় সার্বক্ষণিকভাবেই ইবাদতে মগ্ন থাকতেন। একদিন রসূল (সা.) তাঁর ঘরে প্রবেশ করে দেখলেন জুয়াইরিয়া তসবীহ পাঠ করছেন। রসূল (সা.) বললেন, 'তুমি কি সব সময় এ আমল কর?' তিনি উত্তর দিলেন, 'জি হ্যাঁ।'

একদিন ভোরে জুয়াইরিয়া (রা.) মসজিদে বসে দোয়া করছিলেন । এ অবস্থায় রসূল (সা.) তাঁকে দেখলেন এবং চলে গেলেন। দুপুরে ফিরে এসে রসূল (সা.) তাঁকে সেই অবস্থায় দেখতে পেলেন।

ঐতিহাসিক ইবনে সা'আদ বর্ণনা করেন যে, জুমার দিন নবীজী হযরত জুয়াইরিয়ার কাছে যান। সেদিন তিনি রোযা রেখেছিলেন। নবীজী যেহেতু একটা

www.pathagar.com

রোযা রাখাকে মাকরূহ মনে করতেন, তাই জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি গতকাল রোযা রেখেছিলে?' বললেন, 'না। নবীজী পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, আগামীকাল রাখবে? বললেন, না। নবীজী বললেন, তাহলে রোযা ভেঙ্গে ফেল।

রসূল (সা.) জুয়া রিয়াকে খুব ভালবাসতেন। একবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'ঘরে খাবার কিছু আছে কি? জুয়াইরিয়া বললেন, আমার এক দাসী ছদকার কিছু গোশত দিয়েছে, তাই আছে। এ ছাড়া আপাতত অন্য কিছু নেই। রসূল (সা.) বললেন, তাই নিয়ে এসো। কারণ, যাকে ছদকা দেয়া হয়েছে, তার কাছে তা পৌঁছেছে।'

এই পুণ্যবতী মহিলা রসূল (সা.) থেকে অল্প কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবনে আব্বাস, ইবনে ওমর, জাবের, আবূ আইউব মারাসী, তোফায়েল, মুজাহিদ, কুলসুম ইবনে মুসতালিক, কোরাইব এবং আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আমীর মুয়াবিয়ার শাসনামলে ৬৫ বছর বয়সে জুয়াইরিয়া (রা.) ইন্তেকাল করেন। সময়টা ছিল হিজরী ৫০ সালের রবিউল আউয়াল মাস। মদীনার তৎকালীন গর্ভনর মারওয়ান ইবনুল হাকাম তাঁর জানাযার নামায পড়ান। তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে সমাহিত করা হয়।

www.pathagar.com

হযরত উম্মে হাবীবা (রা.)

তাঁর আসল নাম রামলা। কারো কারো মতে 'হিন্দ'। ডাক নাম উম্মে হাবীবা। পিতার নাম আবূ সুফিয়ান। মাতার নাম সুফিয়া বিনতু আবূল আস। ইনি হযরত ওসমান (রা.)-এর ফুফু ছিলেন। অর্থাৎ কিনা ওসমান (রা.) ছিলেন উম্মে হাবীবা (রা.)-র আপন ফুফাতো ভাই।

তাঁর বংশ লতিকা হল, রামলা বিনতু আবূ সুফিয়ান সখর ইবনে হারব ইবনে উমাইয়া ইবনে আবদে শামস। পিতা-মাতা উভয়েই কোরাইশ বংশের লোক ছিলেন। পিতা আবূ সুফিয়ান তো ছিলেন ইসলামের এক নম্বরের শত্রু ও বিখ্যাত কোরাইশ নেতা।

উম্মে হাবীবাহ্ নবুয়াতের ১৭ বছর পূর্বে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মক্কার শ্রেষ্ঠ সুন্দরীদের অন্যতম ছিলেন। যে কারণে পিতা আবূ সুফিয়ান গর্ব করে বলতেন, 'আমার নিকট রয়েছে সারা আরবের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী লাবণ্যময়ী নারী (উম্মে হাবীবা)।' আবূ সুফিয়ান তাই অনেক দেখাশোনা, খোঁজ খবরের পর বনু আসাদ গোত্রের সুদর্শন পুরুষ ওবায়দুল্লাহ্ বিন জাহাশের সাথে উম্মে হাবীবার বিয়ে দেন। ওবায়দুল্লাহ্ বিন জাহাশ খৃস্টান ধর্মাবলম্বী ছিলেন। ইনি উম্মুল মুমীনীন জয়নব বিনতু জাহাশ (রা.)-এর ভাই ছিলেন।

নবুয়াতের প্রথম যুগেই উম্মে হাবীবাহ্ ও স্বামী ওবায়দুল্লাহ্ ইসলাম কবুল করেন। মক্কায় কাফেরদের অত্যাচারে তিষ্টাতে না পেরে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে হাবসায় হিজরত করেন। এই হাবশাতেই তাঁদের কন্যা হাবীবা জন্মগ্রহণ করেন। এই হাবীবার নামেই তাঁকে উম্মে হাবীবা বলা হয় এবং এ নামেই তিনি পরিচিতা হয়ে আছেন।

হাবশাতে আসার পর স্বামী ওবায়দুল্লাহর ভেতর ধীরে ধীরে পরিবর্তন দেখা দেয়। ইসলাম গ্রহণের আগে ওবায়দুল্লাহ্ ছিলেন প্রচণ্ড মদ্যপায়ী। মদ নিষিদ্ধ হলে অন্যান্যদের মত তিনি তা ত্যাগ করেন। কিন্তু হাবশা আসার পর ওবায়দুল্লাহ্ আবার মদ পান শুরু করেন। হযরত উম্মে হাবীবা স্ত্রী হিসেবে তাকে এ পথ থেকে ফেরানোর প্রাণপণ চেষ্টা করেন। কিন্তু কোন লাভ হয়নি। এক রাতে উম্মে হাবীবা তাঁর স্বামীকে বিভৎস অবস্থায় স্বপ্নে দেখেন। এরপর তিনি স্বামীকে ভয় দেখিয়ে সাবধান করার চেষ্টা করেন কিন্তু উল্টো ওবায়দুল্লাহ্ তাঁকে বলেন, 'উম্মে হাবীবা,

www.pathagar.com

ধর্মের ব্যাপারে চিন্তা করে বুঝলাম, খৃস্টবাদের চেয়ে উত্তম কোন ধর্ম নেই। আমি ইতোপূর্বে মুসলমান হলেও এখন পুনরায় খৃস্টধর্ম গ্রহণ করছি।' এর পর উম্মে হাবীবা তাকে তিরস্কার করলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না, সে খৃস্টান হয়ে গেল এবং একদিন মাত্রারিক্ত মদ পান করার কারণে মৃত্যুবরণ করে।

ওবায়দুল্লাহর সাথে ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর থেকে উম্মে হাবীবা বিদেশ-বিভূয়ে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ হয়ে যান এবং মানবেতর জীবন যাপন করতে থাকেন। এ সংবাদ রসূল (সা.)-এর নিকট পৌছুলে, ইসলামের জন্য উম্মে হাবীবার ত্যাগের কথা চিন্তা করে তিনি খুবই বিচলিত হন। পরে সব দিক বিবেচনা করে বিয়ের প্রস্তাবসহ আমর ইবনে উমাইয়া যাসিরীকে হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশীর কাছে পাঠান। বাদশাহ নাজ্জাশী নিজের দাসী আবরাহার মাধ্যমে এ প্রস্তাব উম্মে হাবীবার নিকট পৌছান। প্রস্তাব পেয়ে উম্মে হাবীবা এতই খুশি হন যে, তিনি আবরাহাকে দু'টি রূপার চুড়ি, পায়ের দু'টি মল এবং দু'টি রূপার আংটি উপহার দেন। উম্মে হাবীবা নিজের পক্ষ থেকে খালিদ ইবনে সাঈদকে উকিল নিয়োগ করেন।

বাদশাহ নাজ্জাশী সন্ধ্যায় স্থানীয় সকল মুসলমান এবং জাফর ইবনে আবূ তালিবকে ডেকে বিবাহ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। বাদশাহর পক্ষ থেকে মহরানা হিসেবে ৪০০ দেরহাম বা দীনার আদায় করা হয়। উল্লেখ্য যে এরপর বাদশা নাজ্জাশী নিজেই বিয়ে পড়ান। এই বিয়েতে কিছু খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

হিজরী ৬ অথবা ৭ সালে এ বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। বিয়ের সময় উম্মে হাবীবা (রা.)-র বয়স হয়েছিল ৩৬/৩৭ বছর। বিয়ের পর উম্মে হাবীবা জাহাজ যোগে মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। জাহাজ যখন মদীনায় পৌছে তখন রসূল (সা.) খায়বর অভিযানে ব্যস্ত ছিলেন এবং সেখানে অবস্থান করছিলেন। রসূল (সা.) উম্মে হাবীবাকে মূলত দু'টো কারণে বিয়ে করেছিলেন। প্রথমত স্বামীর সাথে ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে উম্মে হাবীবা প্রচণ্ড কষ্টের মধ্যে দিন যাপন করছিলেন। তার কষ্ট ছিল ইসলামের প্রতি মহব্বতের কারণে নিজের ওপর আরোপিত। তিনি স্বামীর মতই পুনরায় খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করতে পারতেন কিন্তু তিনি তা করেন নি। বরং স্বামীর এ ধরনের প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁর এ ত্যাগের পুরস্কার হিসেবে রসূল (সা.) তাঁকে বিয়ে করেন। দ্বিতীয়ত আবূ সুফিয়ান ছিলেন সেই কোরাইশ নেতা যিনি আবূ জেহেলের মৃত্যুর পর ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। নবুয়তের সেই প্রথম দিন থেকেই আবূ সুফিয়ান রসূল (সা.) ও মুসলমানদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন ও জুলুমের বন্যা প্রবাহিত করেছে। বলা যায় মানুষের পক্ষে যত প্রকার পন্থা অবলম্বন

www.pathagar.com

করা সম্ভব আবূ সুফিয়ান তার কোনটিই ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে ছাড়েনি।

ইসলাম ও মুসলমানদের এই জাত শত্রুরই কন্যা ছিলেন উম্মে হাবীবা (রা.)। এ জন্য রসূল (সা.) রাজনৈতিক কারণে সুদূর প্রসারী চিন্তা-ভাবনা করেই উম্মে হাবীবাকে বিয়ে করেন। ফলও পাওয়া যায়। আবূ সুফিয়ান ক্রমে নরম হতে থাকেন এবং মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম কবুল করেন।

হযরত উম্মে হাবীবা (রা.) ছিলেন নেককার ও বলিষ্ট ঈমানের অধিকারিণী। তিনি ঈমান ও ইসলামের ব্যাপারে কারো সাথে সমঝোতা করতে বা সামান্য দুর্বলতা দেখাতেও রাজি ছিলেন না। এর প্রমাণ তো আমরা তাঁর স্বামী ওবায়দুল্লাহ যখন পুনরায় খৃস্টান হন তখনই পেয়েছি। অন্যদিকে তাঁর পিতা আবূ সুফিয়ান একবার মদীনায় আসেন হুদায়বিয়ার সন্ধির সময়সীমা বাড়ানোর জন্য। তিনি ইচ্ছে পোষণ করছিলেন যে, তাঁর কন্যা উম্মে হাবীবাকে দিয়েই রসূল (সা.)-এর কাছে আবেদন পেশ করবেন, যাতে সহজেই তা পাস হয়। এ উদ্দেশ্যে তিনি উম্মে হাবীবার গৃহে পদার্পণ করেন।

আবূ সুফিয়ান যখন মেয়ের গৃহে প্রবেশ করে বিছানায় বসতে যান তখন উম্মে হাবীবা তা উল্টে দেন। ঘটনার আকস্মিকতায় আবূ সুফিয়ান খুব অপমানবোধ করেন এবং বলেন, 'তুমি এই বিছনায় নিজের পিতাকেও বসতে দিবে না?' উম্মে হাবীবা বললেন, 'একজন মুশরিক রসূলে পাক (সা.)-এর বিছানায় বসুক অবশ্যই আমি তা পছন্দ করি না।' কন্যার কথা শুনে আবূ সুফিয়ান ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, 'তুমি আমার বিরুদ্ধে খুব বেশি বিগড়ে গেছ।'

উম্মে হাবীবা নিজের পিতার সাথে যে রূঢ় আচরণ করেছিলেন তা শুধু মাত্র ঈমানের তাগিদে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে।

তিনি ছোট খাট ব্যাপারেও খুব গুরুত্ব দিতেন এবং অন্যদেরকেও সে ব্যাপারে উৎসাহিত করতেন ও তাগিদ দিতেন। একবার তাঁর ভাগিনা আবূ সুফিয়ান ইবনে সাঈদ ছাতু খেয়ে কুলি না করলে তিনি বললেন, 'তোমার কুলি করা উচিৎ ছিল। কারণ, নবীজী বলেছেন, আগুনে পাকানো জিনিস খেলে অযূ করতে হয়।' একবার তিনি রসূল (সা.)-কে বলতে শুনেছিলেন যে, প্রতিদিন বার রাকায়াত করে নফল নামায পড়লে জান্নাতে তার জন্য ঘর তৈরি করা হবে। এরপর থেকে তিনি আর এ নামায ছাড়েন নি। তিনি নিজেই বলেছেন, অতপর আমি নিয়মিত বার রাকায়াত নামায পড়তাম।

www.pathagar.com

তাঁর পিতা আবূ সুফিয়ান ইনতেকাল করলে তিনদিন পর তিনি খোশবু চেয়ে নিয়ে হাতে মুখে মাখেন এবং বলেন, ঈমানদার নারীর জন্য তিনদিনের বেশি শোক করা জায়েয নেই, অবশ্য স্বামী ছাড়া। স্বামীর জন্য স্ত্রীর শোক করার মেয়াদ হচ্ছে চার মাস দশ দিন। নবীজীকে একথা বলতে না শুনলে এ ব্যাপারে আমার কোন খবরই ছিল না।'

প্রথম স্বামী ওবায়দুল্লাহর ঔরসে তাঁর দু'জন সন্তান আবদুল্লাহ ও হাবীবার জন্ম হয়। যতদূর জানা যায় আর কোন সন্তান হয়নি।

উম্মে হাবীবা (রা.) সর্বমোট ৬৫টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবনে উতবা, সালেম ইবনে সেওয়ার হাবীবা, মুআবিয়া, ওৎবা, আবূ সুফিয়ান, আবদুল্লাহ বিন ওৎবা, সালিম বিন সাওয়াব, আবূল জিরাহ, জয়নব বিনতু আবূ সালমা, সুফিয়া বিনতু সায়বা, ওরওয়া বিন জোবায়ের, শাহার বিন হাওশাব, আবূ ছালেহ আস সামান প্রমুখ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আপন ভাই আমীর মুয়াবিয়ার শাসন আমলে হিজরী ৪৪ সালে ৭৩ বছর বয়সে উম্মে হাবীবা (রা.) ইন্তেকাল করেন। মদীনায় তাঁকে দাফন করা হয়। অন্য এক বর্ণনা থেকে জানা যায়, তাঁকে হযরত আলী (রা.)-র গৃহে দাফন করা হয়। এর প্রমাণ হলো হযরত জয়নুল আবেদীন (রা.) তার গৃহ খননকালে একটি শিলা লিপি পান, তাতে লেখা ছিল, এটা রামলা বিনতু ছাখর-এর কবর।

মৃত্যুর আগে তিনি হযরত আয়েশা (রা.) ডেকে বলেন, 'আমার এবং আপনার মধ্যে সতীনের মতো সম্পর্ক ছিল। কোন ভুলত্রুটি হয়ে থাকলে মাফ করে দেবেন এবং আমার মাগফেরাতের জন্য দোয়া করবেন। হযরত আয়েশা দোয়া করলে তিনি পুনরায় বললেন, আপনি আমাকে খুশি করেছেন, আল্লাহ আপনাকে খুশি করুন।'

www.pathagar.com

হযরত সুফিয়া (রা.)

তাঁর প্রকৃত নাম জয়নব। প্রসিদ্ধ নাম সুফিয়া। আরবের প্রথা অনুযায়ী যুদ্ধলব্দ মাল বন্টনের সময় যে উৎকৃষ্ট বা উত্তম মাল দলপতির জন্য রাখা হত তাকে সুফিয়া বলা হত। খায়বার যুদ্ধে প্রাপ্ত সকল কিছুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন জয়নব। শেষ পর্যন্ত এই জয়নবকে রসূল (সা.)-এর ভাগে দেয়া হয়। এজন্য তাঁর নামকরণ করা হয় সুফিয়া এবং এ নামেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল হুইয়াই ইবনে আখতাব। ইনি ছিলেন হযরত হারুন ইবনে ইমরান (আ.)-এর অধস্তন পুরুষ। তাঁর বংশ লতিকা হল, জয়নব বিনতু হুইয়াই ইবনে আখতাব ইবনে সাঈদ ইবনে আমের ইবনে ওবাইদ ইবনে কা'আব ইবনুল খাযরাজ ইবনে আবূ হাবীব ইবনে নুছাইর ইবনে নাহহাম ইবনে মাইখুম। তাঁর মায়ের নাম ছিল বাররা বিনতু সামওয়ান। এই সামওয়ান ইয়াহূদীদের সর্বশ্রেষ্ঠ খান্দান বনু কুরাইযার নেতা ছিলেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে সুফিয়া (রা.)-র পিতৃকুল নযীর ও মাতৃকুল বনু কুরাযার ইয়াহূদীদের এক বংশে গিয়ে মিলিত হয়েছে।

সুফিয়া (রা.)-র আব্বা ও দাদা উভয়েই ছিলেন তৎকালীন ইয়াহূদী জাতির সম্মানিত ও মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ। যে কারণে বনী ইসরাইলের সমস্ত আরবীয় গোত্রের মধ্যে তাদেরকে আলাদা রকম সম্মান করা হতো। বিশেষ করে তাঁর আব্বা হুইয়াই ইবনে আখতাব মর্যাদার শীর্ষে স্থান দেয়া হয়েছিল। ইয়াহূদীরা বিনা বাক্য ব্যয়ে তাঁর নেতৃত্ব মেনে চলতো। তাঁর নানা সামওয়ান মান মর্যাদা শৌর্য বীর্য এবং বীরত্বের দিক দিয়ে সারা যাজিরাতুল আরবে ছিলেন সম্মানিত। বুঝতেই পারছো সুফিয়া (রা.) ছিলেন সব দিক দিয়েই বিশিষ্টতার অধিকারিণী।

সুফিয়া (রা.)-র প্রথম বিয়ে হয় আরবের প্রখ্যাত কবি ও সর্দার সালাম ইবনে মিশকাম আল কারাবীর সাথে। প্রথম দিকে তাদের দাম্পত্য জীবন সুখের হলেও পরবর্তীতে মনোমালিন্য ঘটে এবং শেষ পর্যন্ত ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। ফলে সুফিয়া (রা.) পিতৃগৃহে ফিরে আসেন। এরপর কেনানা ইবনে আবূল আফীক-এর সাথে তাঁর দ্বিতীয় বিয়ে হয়। আবূল আফীক ছিলেন খায়বরের নামকরা দুর্গ আল-কামুদ-এর সর্দার। এ সময় তাঁর বয়স ছিল সতের বছর।

তাঁর আব্বা ও চাচা আবূ ইয়াসির রসূল (সা.)-এর জানের শত্রু ছিল। তারা মদীনা হতে বিতাড়িত হয়ে চতুর্থ হিজরীতে খায়বরে গিয়ে কিনানা ইবনে আল

www.pathagar.com

রাবীর সাথে বসবাস করতে থাকেন। এখানে বসেই হুয়াই ইবনে আকতাব মুসলমানদের ক্ষতি করবার সর্বপ্রকার চেষ্টা তদ্বির করতে থাকেন।

পরবর্তীতে রসূল (সা.)-এর নেতৃত্বে খায়বর অভিযানকালে মুসলমানদের হাতে আলকামুদ দুর্গের পতন ঘটে। যুদ্ধে ইয়াহূদীদের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে। বহু নেতৃস্থানীয় ইয়াহূদী মৃত্যুবরণ করে। কেনানা ইবনে আবুল আকীক দুর্গের অভ্যন্তরে নিহত হন। এমন কি তাঁর পিতা হুয়াই ইবনে আখতাব নিহত হন। সুফিয়া অন্যান্য পরিবার-পরিজনদের সাথে বন্দী হন।

সুফিয়া বন্দিনী হিসেবে মুসলিম শিবিরে আসার পর আরবের নিয়ম অনুযায়ী সাহাবী দাহইয়া কলবীর আবেদন মোতাবেক তাঁকে তাঁর ভাগে দিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু সুফিয়া (রা.) তাঁর মর্যাদার দিক বিবেচনা করে সাহাবী দাহইয়া কলবীর ঘরে যেতে অস্বীকার করেন। এ সময়ে কতিপয় সাহাবী আরজ করেন, 'ইয়া রসূলুল্লাহ (সা.) সুফিয়া বনু কোরায়যা এবং বনু নজীরের মহিলা। এ নেতৃস্থানীয়া মহিলাকে দাহইয়ার হস্তে বাঁদী হিসেবে সমর্পণ করলেন ? তাঁর মর্যাদা তো অনেক উঁচুতে আসীন। তিনি আমাদের নেতার জন্যই যথোপযুক্ত।'

রসূল (সা.) সাহাবীদের আবেদন কবুল করলেন এবং দাহইয়া কলবীকে অন্য একজন পরিচারিকা দান করলেন। সুফিয়াকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করে দিলেন। কিন্তু সুফিয়া কোথাও যেতে রাজি হলেন না। তিনি রসূল (সা.)-এর কাছে বিনীত আরজ করলেন, 'ইয়া রসূলুল্লাহ (সা.)! খায়বর যুদ্ধে আমার পিতা এবং স্বামী নিহত হয়েছেন। আমার নিকটতম আত্মীয়-স্বজনরাও যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছে। আর আমি ইয়াহূদী ধর্ম ত্যাগ করে পবিত্র ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছি। বর্তমানে আমার ইয়াহূদী আত্মীয়-স্বজন যারা বেঁচে আছে তাদের কেউই আমাকে আশ্রয় দেবে না এবং গ্রহণও করবে না। এই আশ্রয়হীন অবস্থায় আমি কোথায় যাব ? কে আমার এই অসহায় অবস্থার সহায়ক হবে ? কে আমাকে স্থান দিবে ? ইয়া রসূলুল্লাহ! আমি আর কোথাও যাব না, আমি আপনার অন্তঃপুরে একজন দাসী হয়ে থাকতে চাই। আপনি আমাকে আশ্রয় প্রদান করুন।'

সবদিক বিবেচনা করে রসূল (সা.) সুফিয়া (রা.)-র আবেদন মঞ্জুর করলেন এবং খায়বর হতে মদীনায় ফেরার পথে 'যাবাহা' নামক স্থানে এ বিয়ে সম্পন্ন হয়। এটা ছিল হিজরী সপ্তম সালের মহররম মাসের শেষ সপ্তাহ। এ বিয়েতে আলিমা অনুষ্ঠান অর্থাৎ খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এ ব্যাপারে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক স্যার সৈয়দ আমীর আলী লিখেছেন, 'ইয়াহূদী রমণী সুফিয়াকে খায়বরের বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

অভিযানের সময় মুসলমানরা বন্দী হিসেবে এনেছিলো। তাকেও মুহাম্মদ (সা.) উদারতার সংগে মুক্তি দিয়েছিলেন এবং তাঁর সনির্বন্ধ অনুরোধের জন্য তাঁকে স্ত্রীত্বে বরণ করেছিলেন।

এই বিয়ের ফলে আশ্রয়হীনা সুফিয়া (রা.) সুন্দর ও সর্বোত্তম আশ্রয় লাভ করেন। সাথে সাথে এ বিয়ের ফলে ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষোভের কিছুটা প্রশমন হয়। এমনকি ধীরে ধীরে ইয়াহূদীদের অনেকেই ইসলাম কবুল করেন।

হযরত সুফিয়া (রা.) সুন্দরী ও লাবণ্যময়ী ছিলেন। যে কারণে মদীনায় আসলে তাঁকে দেখার জন্য মহিলাদের ভীড় পড়ে যায়। এমনকি হযরত যয়নব বিনতু জাহাশ, হযরত হাফছা, হযরত আয়েশা এবং হযরত জুয়াইরিয়া (রা.) তাঁকে দেখতে আসেন। দেখা শোনার পর সকলে যখন চলে যান তখন রসূল (সা.) আয়েশা (রা.)-কে একা পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আয়েশা, তাকে কেমন দেখলে ? তিনি বললেন, সেতো ইয়াহূদী নারী। হযরত বললেন, এমন কথা বলবে না। সে তো মুসলমান হয়েছে। এখন ইসলামে সে উত্তম।'

তিনি ছিলেন ধীর স্থির মেযাজের চমৎকার একজন মহিলা। জনৈক দাসী অভিযোগ করলেন, তাঁর মধ্যে এখনও ইয়াহূদীদের গন্ধ পাওয়া যায়। কারণ সে এখনো শনিবার কে ভালবাসে। এছাড়া ইয়াহূদীদের সাথে এখনও তাঁর সম্পর্ক আছে। হযরত ওমর (রা.) যখন অন্য লোকের মাধ্যমে বিষয়টি যাচাই করতে চান, তখন তিনি বলেন, 'শনিবারের পরিবর্তে আল্লাহ যখন শুক্রবার দিয়েছেন তখন আর শনিবারকে ভালবাসার কোন প্রয়োজন নেই।' ইয়াহূদীদের সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে বলেন, 'ইয়াহূদীদের সঙ্গে তো আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক। আত্মীয়তার প্রতি আমাকে লক্ষ্য রাখতে হয়।' অতঃপর দাসীকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন কে তোমাকে এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেছে ? সে বললো, শয়তান। এটা শুনে হযরত সুফিয়া (রা.) চুপ থাকেন এবং দাসীকে মুক্ত করে দেন।

আল্লামা ইবনে আবদুল বার সুফিয়া (রা.)-র স্বভাব প্রকৃতি সম্বন্ধে লিখেছেন, 'সুফিয়া ছিলেন বুদ্ধিমতী, মর্যাদাশীলা এবং ধৈর্যের অধিকারিণী।'

আল্লামা ইবনে কাসীর লিখেছেন, 'রসূল (সা.)-এর স্ত্রীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমতি।' রসূল (সা.) সুফিয়াকে খুব ভালবাসতেন এবং তাঁর সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টির খোঁজ খবর রাখতেন।

একবার সফরকালীন সময়ে সুফিয়ার উটটি অসুস্থ হয়ে পড়ে। এ সময়ে হযরত জয়নব (রা.)-এর সাথে একটি অতিরিক্ত উট ছিল। রসূল (সা.) তাই জয়নবকে

www.pathagar.com

বললেন, জয়নব! তোমার অতিরিক্ত উটটি ছুফিয়ার সাহায্যের জন্য দাও। জয়নব বললেন, 'এই ইয়াহূদীর মেয়েকে আমি উট দিব না।' এ কথায় রসূল (সা.) খুবই নাখোশ হলেন এবং একাধারে দুই মাস জয়নবের (রা.)-এর সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রাখেন। পরবর্তীতে হযরত আয়েশা (রা.)-র মধ্যস্থতায়-এর পরিসমাপ্তি ঘটে।

অন্য একদিন রসূল (সা.) গৃহে ফিরে দেখলেন সুফিয়া কাঁদছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, 'আয়েশা এবং জয়নব বলেছেন, আমরা রসূলুল্লাহর স্ত্রী এবং বংশ গৌরবের দিক হতে এক রক্তধারার অধিকারিণী। সুতরাং আমরাই শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। রসূল (সা.) বললেন, 'তুমি কেন বললে না, আমি আল্লাহ্‌র নবী হারুনের বংশধর ও হযরত মূসার ভ্রাতুস্পুত্রী এবং রসূল (সা.) আমার স্বামী। অত্রএব তোমরা কোন দিক হতে আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হতে পার?'

দয়া দক্ষিণার ক্ষেত্রেও তাঁর উদার হাত ছিল। তিনি যখন প্রথম মদীনায় আসেন ও রসূল (সা.)-এর অন্তপুরে প্রবেশ করেন তখন তাঁর সর্বাঙ্গে বহু মূল্যবান স্বর্ণালঙ্কার ছিল। তিনি সেসব অলঙ্কার নবী নন্দিনী হযরত ফাতিমা ও অনান্য উম্মেহাতুল মুমিনীনদের মধ্যে ভাগ-বন্টন করে দেন।

হযরত ওসমান (রা.) ৩৫ হিজরীতে বিদ্রোহীদের দ্বারা অবরুদ্ধ হন। বিদ্রোহীদের প্রয়োজনীয় রসদপত্র এমন কি পানি সরবরাহ পর্যন্ত বন্ধ করে দেয়। এমতাবস্থায় সুফিয়া (রা.) ঘর থেকে বের হয়ে পড়েন এবং কিছু রসদপত্রসহ ওসমান (রা.)-এর গৃহের উদ্দেশ্যে খচ্চরে চেপে বসেন। কিন্তু পথিমধ্যে বিদ্রোহীরা তাঁর খচ্চরটিকে আক্রমণ করে বসলে তিনি বলেন, 'বাবারা। তোমরা আমাকে এভাবে অপমান করো না। আমি যাচ্ছি।' এরপর তিনি গৃহে ফিরে আসেন এবং হযরত হাসান (রা.)-কে দিয়ে দ্রব্য সামগ্রী পৌঁছে দেন। পরে যে ক'দিন ওসমান (রা.) অবরুদ্ধ ছিলেন হাসান (রা.)-কে দিয়েই প্রয়োজনী সব জিনিস পত্র পাঠিয়ে দিতেন।

এখান থেকে পরিষ্কার হয় সুফিয়া (রা.) কতবড় দায়িত্ববোধ সম্পন্ন মহিলা ছিলেন। তিনি অসম্ভব সুন্দর রান্না করতে জানতেন। এমন কি এ ক্ষেত্রে হযরত আয়েশাও (রা) তাঁর সমকক্ষ ছিলেন না।

হযরত সুফিয়া (রা.) লেখাপড়া জানা মহিলা ছিলেন। তিনি প্রায়ই তাঁর ইয়াহূদী আত্মীয়-স্বজনের কাছে ইসলামের সুমহান আদর্শ তুলে ধরে চিঠি লিখতেন। আর এ দাওয়াতী কাজের ফলে অনেকেই ইসলাম কবুল করেন।

www.pathagar.com

তিনি ইসলামী জ্ঞানের ক্ষেত্রে মোটামুটি বোদ্ধা একজন মানুষ ছিলেন। এ জন্য অনেকে তাঁর কাছ থেকে মাসলা মাসায়েল জানতে চাইতেন ও জেনে নিতেন। ছহীরা বিনতু হায়দার হজ্জব্রত পালন করার পর সুফিয়া (রা.)-র সাথে দেখা করতে এসে দেখেন যে, কূফার একদল মহিলা মাসআলা জিজ্ঞেস করার জন্য তাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছেন আর তিনি সুন্দরভাবে সকলের জিজ্ঞাসার জবাব দিচ্ছেন।

তিনি মাত্র কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। জয়নুল আবেদীন ইসহাক ইবনে আবদুল্লাহ, মুসলিম ইবনে সাফওয়ান, কিনানা এবং ইয়াজিদ ইবনে মা আতাব প্রমুখগণ তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৬০ বছর বয়সে হিজরী ৫০ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে সমাহিত করা হয়। তাঁর অছিয়ত অনুযায়ী মৃত্যুকালে রেখে যাওয়া সম্পত্তির একতৃতীয়াংশ তার ভাগিনাকে দেয়া হয়। বাকী সম্পত্তি গরীব মিসকিনদের মধ্যে বন্টন করা হয়। জানা যায় মৃত্যুকালে তিনি নগদ একলক্ষ দিরহাম রেখে যান।

www.pathagar.com

হযরত মায়মুনা (রা.)

পূর্বে তাঁর নাম ছিল বাররা। উম্মেহাতুল মুমীনীনদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর নাম রাখা হয় মায়মুনা। তাঁর পিতার নাম হারেস এবং মাতার নাম হিন্দ বিনতু আউফ। তাঁর বংশ লতিকা হল, বাররা বিনতু হারেস ইবনে হাজন ইবনে বুযাইর ইবনে হাযাম ইবনে রোতবা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হেলাল ইবনে আমের ইবনে সাসা'আ ইবনে মু'য়াবিয়া ইবনে বকর ইবনে হাওয়াযেন ইবনে মনসুর ইবনে ইকরামা ইবনে খলিফা ইবেন কায়স ইবনে আয়লান ইবনে মুদার। আর তাঁর মার দিক দিয়ে বংশ লতিকা হল, বাররা বিনতু হিন্দ বিনতু আউফ ইবনে যাহাইর ইবনে হারেস ইবনে হামাতা ইবনে জারাশ।

মায়মুনা ছিলেন কোরাইশ বংশের হাওয়াজিন গোত্রের হারেসের কন্যা যিনি সাসা'আ নামক এলাকায় বসবাস করতেন। অপরদিকে তিনি ছিলেন রসূল (সা.)-এর চাচা আব্বাস (রা.)-এর শালিকা এবং বিশ্বখ্যাত সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদের খালা। অন্যদিকে তিনি উম্মুল ফযল লুবাবাতুস সুগরার বোন ছিলেন।

মাসউদ বিন আমর বিন উমায়ের সাকাফীর সঙ্গে তাঁর প্রথম বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু দাম্পত্য জীবনে বনিবনা না হওয়াতে মাসউদ মায়মুনাকে তালাক দেন। পরে আবূ রহম ইবনে আবদুল্লাহর সাথে তাঁর দ্বিতীয় বিয়ে হয়। এই আবূ রহম সপ্তম হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। ফলে মায়মুনা সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে থাকেন। এমতাবস্থায় তাঁর দুলাভাই আব্বাস (রা.) উদ্যোগী হয়ে রসূল (সা.)-এর নিকট বিয়ের প্রস্তাব পেশ করেন। ইসলামের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে রসূল (সা.) ৫১ বছর বয়স্কা বৃদ্ধা মায়মুনাকে বিয়ে করতে রাজি হন।

সপ্তম হিজরী সালের জিলক্বদ মাসে হুদায়বিয়ার সন্ধি অনুসারে রসূল (সা.) ওমরাহতুল কাজা পালন করার উদ্দেশ্যে মক্কা রওয়ানা হন। এ সময় হযরত জাফর ইবনে আবূ তালিবকে হযরত মায়মুনার কাছে বিয়ের পরগাম দিয়ে পাঠানো হয়। তিনি হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালেবকে উকিল নিযুক্ত করেন। রসূল (সা.) ওমরাহর উদ্দেশ্যে যে এহরাম বাধেন, সেই অবস্থায় এ বিয়ে সম্পন্ন হয়। হযরত আব্বাস (রা.) এ বিয়ে পড়ান। ওমরাহ পালন শেষে মদীনা ফেরার পথে 'সরফ' নামক স্থানে এ বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়। এই বিয়ে মহরানা ধার্য করা হয় ৫০০ দেরহাম।

www.pathagar.com

রসূল (সা.) ও মায়মুনার এই বিয়ে সম্পন্ন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আব্বাস ও খালিদ বিন ওয়ালিদ ইসলাম কবুল করেন নি। মূলত এই বিয়ের ফলেই এ দু'জন বিশাল ব্যক্তিত্ব ইসলাম কবুল করেন এবং ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি করেন। আসলে এই বিয়ের প্রভাব ছিল সুদূর প্রসারী। এ প্রসংগে স্যার সৈয়দ আমীর আলী বলেন, 'মায়মুনাকে মুহাম্মদ (সা.) মক্কায় বিয়ে করেছিলেন। তিনি ছিলেন তাঁর আত্মীয় ও পঞ্চাশের উর্ধ্বে ছিল তাঁর বয়স। এই বিয়ে দীন (গরীব) আত্মীয়ার অবলম্বন হিসেবেই শুধু কাজ করেনি। অধিকন্তু এ ইসলামের জন্য লাভ করেছিল দু'জন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব ইবনে আব্বাস এবং ওহুদের দুর্ভাগ্যজনক যুদ্ধে কোরাইশের অশ্বারোহী দলের সেনাপতি ও পরবর্তীকালে গ্রীক বিজেতা খালিদ বিন ওয়ালিদ।'

অনেকের ধারণা রসূল (সা.) মায়মুনাকে বিয়ে না করলে খালিদ বিন ওয়ালিদ কোনদিন হয়তো ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করতেন না । সুতরাং একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, এ বিয়ে ইসলামের ও মুসলানদের জন্য কল্যাণ বয়ে এনেছিল।

মায়মুনা অত্যন্ত পরহেযগার একজন মহিলা ছিলেন। তিনি আল্লাহ্‌র ভয়ে সর্বদা কম্পিত থাকতেন এবং কান্নাকাটি করতেন। তিনি ছোটখাট আদেশ নিষেধকে সমান গুরুত্ব দিতেন। একবার এক মহিলা অসুস্থ অবস্থায় মানত করলো যে, 'সুস্থ হলে বায়তুল মুকাদ্দাস গিয়ে নামায পড়বে। আল্লাহ তাআলা তাকে রোগ মুক্ত করলে মানত পুরা করার উদ্দেশ্যে বায়তুল মুকাদ্দাস গমনের জন্য হযরত মায়মুনার নিকট বিদায় নিতে আসে। হযরত মায়মুনা (রা.) তাকে বুঝিয়ে বলেন যে, 'অন্যান্য মসজিদে নামায আদায়ের চেয়ে মসজিদে নব্বীতে নামায আদায়ের সওয়াব হাজার গুণ বেশি। তুমি এখানে থেকেই মসজিদে নব্বীতে নামায আদায় কর।'

তাঁর সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, 'হযরত মায়মুনা ছিলেন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহকে ভয়কারিণী এবং আত্মীয়তার সম্পর্কের প্রতি সবচেয়ে বেশি যত্নবান মহিলা।'

একবার তাঁর এক আত্মীয় বেড়াতে আসেন। কিন্তু তার মুখ দিয়ে মদের গন্ধ আসছিল। তাই মায়মুনা (রা.) ক্ষেপে গিয়ে বললেন, 'ভবিষ্যতে আর কখনো আমার কাছে আসবে না।'

হযরত মায়মুনা (রা.) সর্বমোট ৪৬টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এর বেশির ভাগই ছিল মেয়েদের বিষয়ে ফিকহী মাসয়ালা। এই হাদীসগুলোর মধ্যে বোখারী ও মুসলিম উভয়গ্রন্থে ৬টি স্থান পেয়েছে। এ ছাড়া ১টি বুখারী শরীফে ৫টি মুসলিম

www.pathagar.com

শরীফে এবং বাকীগুলো অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। তাঁর থেকে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ, আবদুর রহমান ইবনে সায়েব, ইয়াজিদ ইবনে আছম প্রমুখ সাহাবিগণ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

রসূল (সা.)-এর পদাংক অনুসরণে সতত তৎপর পরোপকারী, দানশীলা, গোলাম আযাদকারিণী হযরত মায়মুনা (রা.) হিজরী ৫১ সালে 'সরফ' নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন। উল্লেখ্য যে এই 'সরফে' তাঁর বিয়ে হয়েছিল। এটা তাঁর জীবনেতিহাসের এক স্মরণীয় ঘটনা। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস তাঁর জানাযার নামায পড়েছিলেন এবং তিনি লাশ কবরে নামিয়েছিলেন। লাশ বহনের সময় আবদুল্লাহ বলেছিলেন, 'সাবধান। এ উম্মুল মুমীনীনের লাশ। বেয়াদবী করো না, এমন কি তোমরা নড়াচড়াও করো না। খুব যত্ন সহকারে বহন করবে।'

www.pathagar.com

হযরত রায়হানা (রা.)

তাঁর নাম রায়হানা। পিতার নাম শামউন। তিনি ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ ইয়াহূদী বনু নাযীর গোত্রের মেয়ে। বংশ লতিকা হল, রায়হানা বিনতু শামউন ইবনে যায়েদ, অন্য মতে রায়হানা বিনতু যায়েদ ইবনে আমর ইবনে খানাফা ইবনে শামউন ইবনে যায়েদ।

তাঁর প্রথম বিয়ে হয় বনু কুরায়যা গোত্রের হাকামের সাথে। কিছুদিন পর হাকামের মৃত্যু হয়। ৬ষ্ঠ হিজরী সালে যখন মুসলমানরা বনু নাযীর ও বনু কুরায়যা গোত্রের সব কিছু দখল করে নেয় তখন রায়হানাকে যুদ্ধ বন্দী হিসেবে নিয়ে আসা হয়। এরপর কিছুদিন তাকে কায়েসের কন্যা উম্মে মুনফিরের কাছে রাখা হয়।

রসূল (সা.) বিদ্রোহী ইয়াহূদী গোত্রগুলির সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনের জন্য, সমগ্র আরবে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য রায়হানাকে আশ্রয় দিতে ও বিয়ে করতে মনস্থ করেন এবং তাঁকে বলেন, 'তুমি আল্লাহ এবং রসূলকে গ্রহণ করলে আমি তোমাকে আমার জন্য উপযুক্ত মনে করি। 'রায়হানা বিনতু শামউন রসূল (সা.)-এর এই প্রস্তাব আনন্দে গ্রহণ করেন। ফলে রসূল (সা.) তাঁকে মুক্ত করে ৪০০ দিরহাম মোহরানা প্রদান করে বিয়ে করেন।

ইবনে সা'আদের বর্ণনা মতে হিজরী ৬ষ্ঠ সালের মুহররম মাসে এই বিয়ে সম্পন্ন হয়। এই বিয়ের ফলে ইয়াহূদী গোত্রগুলির সাথে মুসলমানদের সম্পর্কের চমৎকার উন্নতি হয়। উভয়ের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুসম্পর্কও প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঐতিহাসিক ইবনে ইসাহাকের মতে রসূল (সা.)-এর ইন্তেকালের দশ বছর পূর্বে রায়হানা (রা.) ইন্তেকাল করেন।

www.pathagar.com

হযরত মারিয়া কিবতিয়া (রা.)

তোমারা নিশ্চয়ই হুদায়বিয়ার সন্ধির কথা শুনেছ। এই হুদায়বিয়ার সন্ধি সংঘটিত হওয়ার পর রসূল (সা.) পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলোতে রাষ্ট্রপ্রধানদের নিকট দূত মারফত ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত সম্বলিত চিঠি প্রেরণ করেন। এই চিঠির প্রেক্ষিতে মিসরের খৃস্টান শাসক মুকাউকিউস সৌহার্দ্র ও শুভেচ্ছার নির্দশনস্বরূপ আপন চাচাত বোন মরিয়ম বা মারিয়া কিবতিয়াকে রাষ্ট্রীয় পর্যাপ্ত উপঢৌকনসহ তৎকালীন প্রথানুসারে মুসলিম রাষ্ট্র প্রধান রসূল-এর দরবারে উপহারস্বরূপ প্রেরণ করেন।

রসূল (সা.) আন্তর্জাতিক রাজনীতির দিকে লক্ষ্য রেখে এই উপহার ও উপঢৌকন কবুল করেন। এই সকল উপঢৌকন পাওয়ার পর সর্বপ্রথম রসূল (সা.) মারিয়ার নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন। মারিয়া আনন্দের সাথে এই দাওয়াত কবুল করেন ও ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর মারিয়ার সম্মতিতে সম্পূর্ণ ইসলামী বিধান মোতাবেক রসূল (সা.) তাঁকে বিয়ে করেন। এইভাবে মিসরের রাষ্ট্র প্রধান মুকাউকিউসের উপহারের সঠিক মূল্যায়ন করেন।

সপ্তম হিজরী সালের শেষের দিকে এই বিয়ে সংঘটিত হয়। এরপর রসূল (সা.) আর কোন বিয়ে করেন নি। আর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেও রসূল (সা.)-এর জন্য নতুন কোন বিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে আয়াত নাযিল হয়। আল্লাহ বলেন, 'এরপর আর কোন নারী আপনার জন্য হালাল নয় এবং তাদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করাও হালাল নয়।' (সূরা আহযাব-৫২)

হযরত মারিয়া কিবতিয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে রসূল (সা.)-এর অন্যতম পুত্র সন্তান ইব্রাহীম। আওয়ালী নামক স্থানে হিজরী ৮ম সালে তাঁর জন্ম হয়। এখানেই মারিয়া (রা.) বাস করতেন। এখানে ইব্রাহীমের জন্ম হওয়ার কারণে স্থানটি 'মাশরাবাই ইব্রাহীম' নামে পরিচিতি লাভ করে। ইব্রাহীমের জন্মকালে ধাত্রী নিযুক্ত ছিলেন প্রখ্যাত সাহাবী আবূ রাফের পত্নী বিবি সালমা। তিনি যখন রসূল (সা.)-এর দরবারে হাজির হয়ে পুত্র সন্তান হওয়ার শুভ সংবাদটি দেন তখন রসূল (সা.) খুশি হয়ে তাকে একজন গোলাম দান করেন।

হযরত ইব্রাহীমের জন্মের সংবাদে রসূল (সা.) খুব খুশি হন। সাতদিনের দিন তাঁর আকীকা দেয়া হয় এবং মাথা মুড়িয়ে চুলের ওজন পরিমাণ রূপা গরীবদের

www.pathagar.com

মাঝে দান করে দেন। এ দিনেই মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর নামে তাঁর নামকরণ করা হয় ইব্রাহীম।

সদ্য প্রসূত শিশু ইব্রাহীমকে দুধ পান করানোর জন্য অনেক আনসার মহিলায় প্রার্থী হন। শেষমেষ খাওলা বিনতু জায়দুল আনসারীকে দাই নিযুক্ত করেন। এ জন্য রসূল (সা.) তাকে কয়েকটি ফলবান খেজুর গাছ দান করেন।

খাওলা বিনতু যায়দুল উম্মে রাফে নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি তাঁর স্বামী বারা বিন আউদু'র সাথে মদীনার উপকণ্ঠে বাস করতেন। বারা পেশায় ছিলেন কর্মকার। এ জন্য তার বাড়ি প্রায়ই ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন থাকতো। তবু রসূল (সা.) সন্তানের টানে প্রায়স সেখানে যেতেন এবং ইব্রাহীমের খোঁজ খবর নিতেন।

সতের আঠার মাস বয়সের সময়ে হযরত ইব্রাহীম ধাত্রী মাতা খাওলার গৃহেই ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে রসূল (সা.) সাহাবী আবদুর রহমানসহ সেখানে ছুটে যান। হাত বাড়িয়ে মৃত ইব্রাহীমকে কোলে তুলে নেন। আর তখনি রসূল (সা.)-এর দু'চোখ দিয়ে বাধ ভাঙা জোয়ারের মত পানি নেমে আসে। আবদুর রহমান আরজ করেন, ইয়া রসূলুল্লাহ (সা.)! আপনার অবস্থা এমন কেন ? রসূল (সা.) বলেন, 'আজ আমার অপত্য স্নেহ অশ্রু বিন্দু হয়ে ঝরে পড়ছে।'

ইব্রাহীমের মৃত্যুর দিন ঘটনাক্রমে সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। সকলে বলাবলি করতে লাগলো যে, রসূল (সা.)-এর পুত্র মারা গেছে বলেই আজ সূর্যগ্রহণ হয়েছে। তারা বলতে লাগলো, 'আকাশ শোকাভিভূত হয়ে পড়েছে, সে জন্যই দুনিয়ায় বিদঘুটে অন্ধকার নেমে এসেছে।' কিন্তু সংস্কারক রসূল (সা.) যখন এ সংবাদ শুনলেন তখনই তিনি এ কুসংস্কারের মূলৎপাটন করার জন্য সবাইকে ডেকে বললেন, 'সূর্যগ্রহণ এবং চন্দ্রগ্রহণ হচ্ছে আল্লাহ্‌র নির্দশন। কারো জীবন ও মরণের সঙ্গে এগুলোর কোনই যোগাযোগ নেই। সুতরাং গ্রহণ লাগা বা না লাগার পেছনে কারো মৃত্যুর কোন সম্বন্ধ নেই।'

ইব্রাহীমের লাশ ছোট একটা খাটিয়ায় করে আনা হয়। রসূল (সা.) নিজে আপন পুত্রের জানাযা পড়ান। তারপর তাঁকে বিশিষ্ট সাহাবী উসমান বিন মাযউতনের কবরের পাশে দাফন করা হয়। তাঁর লাশ কবরে নামান হযরত উসামা ও ফযল বিন আব্বাস। রসূল (সা.) দাফন শেষ হওয়া পর্যন্ত সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন। পরে কবরের ওপর সামান্য পানি ছিটিয়ে দেয়া হয় এবং নির্দিষ্ট চিহ্ন দিয়ে কবরটিকে চিহ্নিত করা হয়।

www.pathagar.com

খোলাফায়ে রাশেদার প্রথম ও দ্বিতীয় খলিফা হযরত আবূ বকর ও হযরত ওমর (রা.) মারিয়া (রা.)-কে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখতেন। রসূল (সা.)-এর ইন্তেকালের পর উভয় খলিফায় তাঁর প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এমন কি হযরত মারিয়া কিবতিয়ার মৃত্যুর পর তাঁর আত্মীয়-স্বজন কেউ উক্ত দু'জন খলিফা সম্ভাব্য সকল সাহায্য সহযোগিতা করেছেন।

হযরত ইব্রাহীম (রা.)-এর মৃত্যুর পাঁচ বছর পর হযরত মারিয়া কিবতিয়া ইন্তেকাল করেন। তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়।

www.pathagar.com

রাসূল (সা.)-এর চাচাগণ

কুরাইশ নেতা আবদুল মুত্তালিবের ১২ জন পুত্র সন্তানের নাম জানা যায়। এরা হলেন, হারিছ, যুবাইর, আবূ তালিব, হামযা, আবূ লাহাব, গাইদাক, জুলমকাম, জেরার, আব্বাস, কুছুম, মুগীরা ও আবদুল্লাহ। রাসূল (সা.)-এর এগার জন চাচার মধ্যে হযরত হামযা (রা.) ও হযরত আব্বাস (রা.) ইসলাম কবুল করেন। আমরা ইসলাম গ্রহণকারী হামযা (রা.) ও আব্বাস (রা.)-র ওপরই শুধু আলোচনা করবো।

হযরত হামযা (রা.)

তাঁর নাম হামযা। ডাক নাম আবূ ইয়ালা ও আবূ আম্মারা! আর উপাধি হল আসাদুল্লাহ, সায়্যিদুশ-শুহাদা। বংশ তালিকা হলো, হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম ইবনে আবদ মানাফ ইবনে কুসায়ি আল-কুরাশী। তিনি ছিলেন রাসূল (সা.)-এর আপন চাচা ও দুধভাই। হযরত হামযা (রা.) ও রাসূল (স.) আবু লাহাবের দাসী সুওয়াইবা'র দুধ পান করেছিলেন। তাঁর মাতা ছিলেন হালা বিন্তু উহায়ব ইবনে আবদ মানাফ ইবনে যুহরা, যিনি রাসূল (স.)-এর মাতা আমিনার চাচাত বোন ছিলেন।

তিনি রাসূল (সা.)-এর জন্মের চার বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। শিশুকাল থেকেই তরবারি চালনা, তীরন্দাযী ও কুস্তির প্রতি আগ্রহী ছিলেন। তৎকালীন আরবের একজন খ্যাতিমান বীর পাহলোয়ান ও সুনিপুণ যোদ্ধা ছিলেন তিনি। শিকার ও ভ্রমণের প্রতি তাঁর প্রচন্ড ঝোঁক ছিল। এমনকি একাজে তিনি তাঁর জীবনের একটা বিরাট অংশ ব্যয় করেন। আর এ কারণেই প্রায় সর্বদাই তিনি তীর-ধনুক, তরবারি নিয়ে আরবের মরুভূমি ও পথে প্রান্তরে ঘুরে বেড়াতেন ও শিকার করতেন।

www.pathagar.com

এমনি একদিনের ঘটনা– আল্লাহর নবী (স.) সাফা পর্বতের দিক থেকে ফিরছিলেন, পথে আবূ জেহেলের সাথে দেখা হলে সে অকথ্য ভাষায় নবী (স.) কে গালি গালাজ করে। কিন্তু ধৈর্যের প্রতিমূর্তি রাসূল (স.) কোন প্রতিবাদ না করে মনের কষ্ট মনে চেপে গৃহে ফিরে আসেন। ঘটনাটি আবদুল্লাহ্ ইবন জুদআন-এর দাসী প্রত্যক্ষ করে। এ ঘটনার পরপরই হযরত হামযা (রা.) তীর ধনুক হাতে ঐ পথ দিয়ে ফিরছিলেন। তাকে দেখে উক্ত দাসীটি বললো, 'হে-আবূ উমারা। তুমি যদি সেই সময় উপস্থিত থাকতে আবূ জেহেল যখন তোমার ভাতিজাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও তিরষ্কার করছিল। আর সে তার উত্তরে কিছুই বলেনি, অসহায়ের মত ফিরে গেছে।' একথা শুনা মাত্র বীর হামযার রক্ত টগবগ করে ফুটে উঠলো। তিনি তৎক্ষণাত আবূ জেহেলের খোঁজে বের হলেন। তাঁর অভ্যাস ছিল, শিকার থেকে ফিরে প্রথমে হারাম শরীফে যেতেন এবং বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করতেন। অতঃপর কুরাইশদের নিকট গিয়ে কিছু কথা বার্তা বলতেন, এরপর ঘরে ফিরতেন। ঐদিন কাবা শরীফে গিয়ে তিনি দেখলেন, আবূ জেহেল কিছু লোকের সাথে বসে আছে। সোজা গিয়ে তিনি আবূ জেহেলের মাথায় ধনুক দিয়ে সজোরে আঘাত করলেন। ফলে তার মাথা ফেটে যখম হয়ে গেল। আঘাত করারপর হামযা (রা.) বললেন, 'তুমি গালি দাও, অথচ আমি তো তাঁর দ্বীন গ্রহণ করেছি।' উপস্থিত মাখযুম গোত্রের লোক উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আবূ জেহেলের পক্ষে রুখে দাঁড়াতে চাইলে, আবূ জেহেল তাদেরকে বাঁধা দিয়ে বললো, 'থাম , হামযাকে তার অবস্থায় থাকতে দাও। কারণ আল্লাহর কসম! আমি আজ কিছুক্ষণ পূর্বে তার ভ্রতুষ্পুত্রকে শক্তভাবে গালিগালাজ ও তিরষ্কার করে এসেছি।' হামযা (রা.) কে উপস্থিত কেহ কেহ প্রশ্ন করলো, 'হামযা! তুমি কি স্বধর্ম ত্যাগ করেছ?' উত্তরে হামযা (রা.) বললেন, 'কেন করবো না, অথচ রাসূলূল্লাহ (স.) যে হক তা আমার নিকট দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে গেছে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর রাসূল। তিনি যা বলেন তা সত্য। আল্লাহর কসম! আমি এ পথ থেকে ফিরবো না, তোমাদের যা ইচ্ছে করতে পার (ইবনে হিশাম, আস-সীরাতুন নববী, ১খ, ৩২১-২২)। একথা বলে হামযা (রা.) ঘরে ফিরে এলেন কিন্তু তার মধ্যে এক ধরনের দ্বন্দ্ব কাজ করতে লাগলো।

পরবর্তিতে এ ব্যাপারে তিনি নিজেই বলেছেন, 'আমি ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে কথাগুলি তো বলে ফেললাম; কিন্তু আমার পূর্ব পুরুষ ও গোত্রের ধর্মত্যাগের

www.pathagar.com

জন্য আমি অনুশোচনায় দগ্ধিভূত হতে লাগলাম। একটা সন্দেহ ও সংশয়ের আবর্তে পড়ে সারা রাত ঘুমোতে পারলাম না। কাবা ঘরে এসে অত্যন্ত বিনীতভাবে আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করলাম, যেন আমার অন্তরের দুয়ার সত্যের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায়, অন্তর থেকে সংশয় বিদূরিত হয়। দু'আর পর আমার অন্তর দৃঢ় প্রত্যয়ে পূর্ণ হয়ে যায়। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ্‌ নিকট উপস্থিত হয়ে আমার অবস্থা বর্ণনা করলাম। তিনি আমার অন্তরের স্থিতির জন্য দোআ করলেন।

মুসতাদরাক হাকিম-এ বর্ণিত আছে, হামযা (রা.) রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলেছিলেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই তুমি সত্য নবী, সত্যায়নকারী এবং জ্ঞানী ব্যক্তির সাক্ষ্যের ন্যায়।' তিনি আরও বললেন, ' হে ভাতিজা! তুমি প্রকাশ্যে তোমার দ্বীন প্রচার করতে থাক। আল্লাহ্‌র কসম! আমাকে যদি দুনিয়া ও এর সকল কিছুর মালিক বানিয়ে দেয়া হয় তবুও আমি তোমার দ্বীন পরিত্যাগ করে পুনঃরায় পিতৃপুরুষের দ্বীন গ্রহণ করবো না।' একথা বলার পর তিনি নীচের কবিতাটি আবৃতি করেন (অনুবাদ)–

"আমি আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রশংসা করছি, যখন তিনি আমার অন্তরকে হিদায়াত দান করেছেন ইসলাম ও দ্বীন-ই হানীফ (ইবরাহীমী দ্বীন) গ্রহণ করাবর জন্য! তিনি আমাকে সেই দ্বীনের হিদায়াত দান করেছেন, যা এমন এক প্রতিপালকের পক্ষ হতে এসেছে, যিনি বান্দাদের সকল অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত এবং দয়ালু। যখন তাঁর কিতাব আমাদের সামনে তিলাওয়াত করা হয় তখন পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তির চোখ দিয়েও অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। সেই কিতাব এনেছেন আহমাদ (স.) মানুষের হিদায়েতের জন্য, যার আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট। আহমাদ (স.) আল্লাহ্‌ তা'আলার মনোনীত ব্যক্তি, আমাদের মধ্যে তাঁর আনুগত্য করা হয়। তাই কঠোর বাক্যদিয়ে তা ঢেকে দিওনা। আল্লাহ্‌র কসম! তরবারির সাহায্যে ফয়সালা না করা পর্যন্ত আমরা তাঁকে কাফির সম্প্রদায়ের নিকট সোপর্দ করবো না।" (ইদরীস কানধলাবী, সীরাতুল, মুসতাফা, ১খ –১৮৩-১৮৫)।

সময়টা ছিল মুসলমানদের জন্য খুবই দুঃসময়। মুষ্টিমেয় যে কয়জন ইসলাম কবুল করেছেন তারাও নিরাশ্রয়। খোদ রাসূলুল্লাহ্‌ (স.) আরকাম ইবনে আবুল আরকামের বাড়িতে থেকে গোপনে ইসলমের দাওয়াত প্রচার করছিলেন। এহেন পরিস্থিতিতে কোরাইশ বীর হামযা (রা.)-র ইসলাম গ্রহণে পুরো পরিস্থিতি পাল্টে যায়। মুসলিমদের সাথে কাফেররা যে বাড়বাড়ি করছিল সেটা অনেকটা বন্ধ হয়ে যায়।

www.pathagar.com

এ সময় আরও একটা বড় ঘটনা ঘটে। রাসূল (স.) আরকামের গৃহে সাহাবা পরিবেষ্ঠিত অবস্থায় বসে ছিলেন, সেখানে হযরত হামযা (রা.)-ও ছিলেন। তাঁরা দেখলেন মহাবীর ওমর উন্মুক্ত তরবারী হাতে সেদিকে আসছে। উপস্থিত সাহাবা (রা.)গণ প্রমাদ গুনলেন। কিন্তু হযরত হামযা (রা.) বললেন, তাকে আসতে দাও। যদি সে ভালো উদ্দেশ্যে এসে থাকে, আমরাও তার সাথে ভালো ব্যবহার করবো। অন্যথায় তারই তরবারি দিয়ে তাকে হত্যা করা হবে।' শেষমেষ হযরত ওমর ভেতরে ঢুকেই কলেমা শাহাদাত পাঠ করে ইসলাম কবুলের ঘোষণা দিলেন। তাঁর ঘোষণার সাথে সাথে সাহাবাগণও তকবীর ধ্বনি দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করলেন ও তাঁকে স্বাগত জানালেন।

বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, এ দু'জন মহাবীরের ইসলাম গ্রহণের ফলে ইসলাম এক অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে পরিণত হয়। অপরদিকে মক্কার কাফেরগণ ইসলাম ও মুসলমানদেরকে আমলে আনতে বাধ্য হয়।

মক্কায় অবস্থানকালে রাসূল (স.) হামযা (রা.)-র সাথে তাঁর পালক পুত্র যায়েদ ইবনে হারিসার সাথে ভ্রাতৃ সম্পর্ক পাতিয়ে দেন। তাঁদের দু'জনের মধ্যে সর্বদায় সু'সম্পর্ক বজায় ছিল। হামযা (রা.) কোথাও গেলে যায়েদকেই সব ব্যাপারে অসিয়ত করে যেতেন।

নবুয়তের ত্রয়োদশ বছরে অন্যান্যদের সাথে হামযা (রা.) মদীনায় হিজরত করেন! সেখানে তিনি কুলছুম ইবনুল হিদম (রা.)-এর বাড়িতে আতিথিয়তা গ্রহণ করেন। অবশ্য মুহাম্মদ ইবনে সালিহ ও আসিম ইবনে উমার-এর মতে সাদ ইবনে খায়ছামা-র বাড়িতে ওঠেন।

রাসূল (স.) হামযা (রা.) নেতৃত্বে কাফিরদের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযান পরিচালনা করেন। তিনিই ইসলামের প্রথম ঝান্ডা বাহক। ৩০ জনের একটি পদাতিক দলের নেতৃত্ব প্রদান করে রাসূল (স.) হযরত হামযা (রা.) কে উপকূলীয় অঞ্চলে প্রেরণ করেন। এসময় ইসলামের প্রথম ঝান্ডা প্রস্তুত করে হামযা (রা.)-এর হাতে দেয়া হয়। এ সমুদ্র উপকূলের তিনি আবু জেহেলের নেতৃত্বে মক্কার তিনশো অশ্বারোহী বাহিনীর মুখোমুখি হন। এখানে যুদ্ধ হয়নি।

রাসূলুল্লাহ (স.) দ্বিতীয় হিজরী সনের সফর মাসে হামযা (রা.)-এর নেতৃত্বে ৬০ জনের সশস্ত্র একটি দল কুরাইশদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য আবওয়া

www.pathagar.com

নামক স্থানে প্রেরণ করেন। কুরাইশ কাফেলা মুসলিম বাহিনী পৌছানোর আগেই উক্ত স্থান অতিক্রম করায় এবারও কোন যুদ্ধ হয়নি।

এই দ্বিতীয় হিজরী সনেই সংঘটিত হয় ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধ! তিনি এ যুদ্ধে অসীম সাহসীকতা ও বিরত্বের পরিচয় দেন। যুদ্ধের শুরুতেই কুরাইশ বীর উতবা, শাইবা ও ওয়ালিদ সারি থেকে বের হয়ে আসে এবং দ্বন্দ্ব যুদ্ধের আহবান জানায়। তাদের আহবানে প্রথমে তিনজন আনসার জওয়ান উঠে দাঁড়ালে উতবা চিৎকার করে বলে উঠে, মুহাম্মদ, আমাদের সমকক্ষ লোকদের পাঠাও। আমরা এসব অনুপযুক্ত লোকদের সাথে লড়তে চাইনা। অতঃপর রাসূল (সা.)-এর নির্দেশ মত হামযা, আলী ও উবাইদা (রা.) উঠে এগিয়ে যান। হযরত হামযা (রা.) প্রথম আঘাতেই উতবা ইবনে রাবীয়াকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেন। হযরত আলী (রা.) শাইবাকে পরপারে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু আবূ ওবায়াদা ও ওয়ালিদের মধ্যে যুদ্ধ প্রচণ্ডরূপ নেয়। তখন হামযা (রা.) ওবায়দা (রা.)-র সাহায্যে এগিয়ে যান এবং আবু ওবায়দা (রা.) ওয়ালীদকে হত্যা করে। এ যুদ্ধে হযরত হামযা (রা.) তাঁর পাগড়িতে উটপাখির পালক গুঁজে রেখেছিলেন। তিনি দু'হাতে তরবারী ধরে শত্রুদের ওপর আক্রমণ করছিলেন এবং যেদিকে যাচ্ছিলেন সব ছাফ হয়ে যাচ্ছিল।

উমাইয়া ইবনে খালাফ আবুদর রহমান ইবনে আউফকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, উটপাখির পালক লাগানো এ লোকটি কে? তিনি বললেন, রাসূল (সা.)-এর চাচা হামযা; তখন সে বললো, 'এ লোকটিই আজ আমাদের সবচেয়ে বেশী সর্বনাশ করেছে।'

ইয়াহুদী গোত্র বনুকাইনুকা যখন সন্ধির চুক্তি ভঙ্গ করে এবং বিদ্রোহ করে তখন তাদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় হিজরীর সাওয়াল মাসে রাসূল (সা.)-এর নির্দেশে এক সামরিক অভিযান পরিচালিত হয়। হযরত হামযা (রা.) এ অভিযানেরও পতাকাবাহী।

তৃতীয় হিজরী সনের শাওয়াল মাসে ওহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধের শুরুতে কুরাইশদের পক্ষ থেকে 'সিবা' নামক এক বীর যোদ্ধা দ্বন্দ যুদ্ধের আহবান জানালে হযরত হামযা এগিয়ে যান এবং হুংকার দিয়ে বলেন, 'ওরে উম্মে

www.pathagar.com

আনমারের অপবিত্র পানির সন্তান, তুই এসেছিস আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে লড়তে?' এ পর্যন্ত বলেই তিনি প্রচন্ড আঘাত করলেন 'সিবাকে' লক্ষ্য করে। ব্যাস! এক আঘাতেই সিবা জাহান্নামে চলে গেল। সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হলে প্রচন্ড আক্রমণে হামযা (রা.) কাফিরদের ব্যূহ ভেঙ্গে তছনছ করে দিল। এ যুদ্ধে তিনি একাই তিরিশজন কাফের সৈন্যকে হত্যা করেছিলেন।

পরবর্তীতে জুবাইর ইবনে মুতইম এর হাবশী ক্রীতদাস ওয়াহ্শীর হাতে হামযা (রা.) শাহাদাত বরণ করেন। ওয়াহ্শীর জবানীতে ঘটনাটি ইবন হিশাম তাঁর সীরাত গ্রন্থে এভাবে উল্লেখ করেছেন, 'আমি ছিলাম জুবাইর ইবনে মুতাইমের এক হাবশী ক্রীতদাস। বদর যুদ্ধে জুবাইরের চাচা তুয়াইম ইবন আদী হামযার হাতে নিহত হয়। মক্কায় ফিরে জুবাইর আমাকে বললো, যদি তুমি মুহাম্মদের চাচা হামযাকে হত্যা করে আমার চাচার হত্যার বদলা নিতে পার, আমি তোমাকে মুক্ত করে দেব। আমাকে সে বিশেষভাবে ট্রেনিংও দিল। আমি শুধু হামযাকে হত্যার উদ্দেশ্যেই উহুদের দিকে রওনা হলাম। যুদ্ধ শুরু হলো। একটা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে হামযার প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। এক পর্যায়ে হামযা আমার কাছাকাছি উপস্থিত হলে অতর্কিতে আক্রমণ করে হত্যা করলাম। তারপর আমার স্বপক্ষ সৈন্যদের নিকট ফিরে এসে নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকলাম। যুদ্ধে আর অংশগ্রহণ করলাম না। কারণ আমার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে গেছে। আমি মক্কায় ফিরে এলে আমাকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেয়া হয়।'

হযরত হামযা (রা.) শাহাদাত লাভের ঘটনার কাফেররা রমণীয় আনন্দ সংগীত গেয়েছিল। আর আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী হামযা (রা.)-র নাক, কান কেটে অলংকার বানিয়েছিল এবং গলায় পরেছি। পেট বুক চিরে কলিজা বের করে এনে চিবাতে থাকে, এক পর্যায়ে গলধকরণ করতে না পেরে ছুড়ে ফেলে দেয়।

এ সংবাদ শুনে রাসূল বললেন, 'হামযার দেহের কোন একটি অংশও জাহান্নামে যেতে দেবেন না।'

রাসূল (স.) যখন লাশের কাছে পৌঁছুলেন, তখন হামযার নাক, কান কাটা এবং পেট, বুক ফাড়া বিকৃত লাশ দেখে তিনি উচ্চারণ করলেন, 'ওহে চাচা! আল্লাহ্ তা'আলা আপনার প্রতি রহম করুন। আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক

www.pathagar.com

স্থাপনকারী এবং সৎকর্মপরায়ণ ছিলেন। সাফিয়া (হামযা (রা.)-র বোন) দুঃখ না পাইলে আমি আপনাকে এইভাবে রেখে দিতাম, যাতে পশু পাখি আপনাকে খেয়ে ফেলে এবং কিয়ামতের দিন আপনি তাদের পেট থেকে উত্থিত হন। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আপনার পরিবর্তে তাদের ৭০ জনের নাক-কান, কেটে দেয়া আমার ওপর জরুরী হয়ে পড়েছে।'

এরপরই আল্লাহ্ এ আয়াত নাযিল করলেন, 'যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে ঠিক ততখানি করবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে; তবে তোমরা ধৈর্যধারণ করলে ধৈর্যশীলদের জন্য সেটাই তো উত্তম। ধৈর্যধারণ করো, তোমার ধৈর্য তো হবে আল্লাহ্‌রই সাহায্যে। তাদের দরুন দুঃখ করো না এবং তাদের ষড়যন্ত্রে তুমি মনক্ষুণ্ন হয়ো না।' এ আয়াত নাযিলের পর রাসূল (স.) সংকল্প ত্যাগ করে ধৈর্য ধারণ করেন এবং তিনি যে কসম করেছিলেন তার কাফ্‌ফারা আদায় করেন।

হযরত হামযা (রা.)-র বোন সাফিয়া ভায়ের কাফনের জন্য দু'খানি চাদর পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু কাফনহীন অবস্থায় হযরত হামযার পাশেই আর একটি লাশ পড়েছিল। তাই মানবিক কারণে লটারী করে চাদর দু'টি দু'জনের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়। এ ব্যাপারে হযরত খাববাব ইবনুল আরাত (রা.) বলেন, 'একটি চাদর ছাড়া হামযাকে কাফন দেয়ার জন্য আর কোন কাপড় আমরা পেলাম না। তা দিয়ে পা ঢাকলে মাথা এবং মাথা ঢাকলে পা বেরিয়ে যাচ্ছিল। তাই আমরা চাদর দিয়ে মাথা এবং ইজখির ঘাস দিয়ে পা ঢেকে দিলাম।

শহীদের মধ্যে সর্বপ্রথম রাসূল (স.) হযরত হামযা (রা.)-র নামাজে জানাযা পড়ান। অতঃপর অন্যান্য শহীদ গণের প্রত্যেকেই তার পাশে এনে রাখা হয় এবং আলাদা আলাদা জানাযার নামায আদায় করা হয়। হিসাব মোতাবেক ঐদিন হামযা (রা.)-র ওপর ৭০ বার জানাযার নামায আদায় করা হয়।

উহুদের ময়দানেই তাকে দাফন করা হয়।

মক্কা বিজয়ের পর হামযা (রা.)-র হত্যাকারী ওয়াহশী ইসলাম গ্রহণ করে রাসূল (সা.)-এর খেদমতে হাযির হলে, রাসূল (স.) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি ওয়াহশী? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। তুমিই কি হামযাকে হত্যা করেছ? জবাব

www.pathagar.com

দিলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল যা শুনেছেন তা সত্য।' রাসূল (স.) বললেন, তুমি কি তোমার চেহারা আমার নিকট একটু গোপন করতে পার?'

মুহূর্তে ওয়াহ্‌শী (রা.) সেখানে থেকে বের হয়ে যান, জীবনে আর কখনো রাসূল (সা.)-এর সামনে আসেননি। পরবর্তীতে হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রা.)-র খেলাফত কালে ভন্ডনবী মুসাইলামাকে হত্যা করে হযরত হামযা (রা.)-র হত্যার কাফ্‌ফারা আদায় করেন।

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্‌ (রা.) বর্ণিত, 'হযরত হামযা (রা.)-এর শাহাদাতের প্রায় চল্লিশ বছর পর মোআবিয়া (রা.) যখন উহুদ প্রান্তর দিয়ে ঝর্ণা খনন করতে মনস্থ করলেন তখন শহীদদের কবর খুঁড়ে অনত্র দাফন করার নির্দেশ দিলেন। জাবির (রা.) বলেন, আমি দেখলাম লোকে কাঁধে করে তাদের লাশ বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল যেন তাঁরা ঘুমিয়ে আছেন। কবর খনন করার সময় হামযা (রা.)-এর পায়ে কোদালের একটু আঘাত লাগায় তা থেকে রক্ত বের হচ্ছিল।

হযরত হামযা (রা.) কে নিয়ে নানা ভাষায় বহু বীরত্ব কাহিনী রচিত হয়েছে। এর মধ্যে– দাসতানই আমীর হামযা, হামযাঃ নামাহ্‌, কিসসা-ই আমীর হামযা, আসমার-ই হামযা থবা রুমূয-ই হামযা এবং জর্জীয় ভাষায় আমীরান-দারেজানিয়ানি বিশেভাবে উল্লেখযোগ।' আমীর হামযার পুঁথি নামে বাংলা ভাষায় রচিত হয়েছে একটি গ্রন্থ। বাঙালী পাঠকের কাছে এ পুঁথিটি বহুল পঠিত একটি গ্রন্থ।

www.pathagar.com

হযরত আব্বাস (রা.)

নাম আব্বাস! উপনাম আবুল ফজল! পিতার নাম আবদুল মুত্তালিব। মাতার নাম নাতিলা বিনতু নামের বিন কাসেত। তিনি রাসূল (সা.)-এর আপন চাচা ছিলেন।

আব্বাস (রা.) আমূল ফিলের এক বছর পূর্বে ৫৬৯ খ্রীঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাসূল (সা.)-এর দু'বছরের বড় ছিলেন, এক ব্যক্তি এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আপনি বড় না রাসূলে পাক।' উত্তরে তিনি বলেন, 'বড়তো তিনিই তবে আমার জন্ম হয়েছে তার পূর্বেই।'

আন-নাসর বংশের মেয়ে ছিলেন আব্বাস (রা.)-এর মাতা। তিনিই প্রথম গিলাফে কাবাগৃহ আবৃত করার প্রথা প্রবর্তন করেন। এই গিলাফটি রেশম ও কিংখাব নির্মিত ছিল। জানা যায় বাল্য বয়সে একবার আব্বাস (রা.) হারিয়ে গিয়েছিলেন, যে কারণে তাঁর মা নাতিলা মানত মানেন যে ছেলেকে ফিরে পেলে কাবাকে গিলাফ মন্ডিত করবেন। তাই ছেলেকে ফিরে পাবার পর তিনি তার মানত পূর্ণ করেন।

আব্বাস (রা.) জাহেলী ও ইসলামী উভয় যুগেই কুরাইশ সর্দারদের অন্যতম একজন ছিলেন। তাঁর হাতেই কাবা ঘরের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ছিল এবং উত্তরাধিকার সূত্রে হজ্জ্ব যাত্রীদের পানি পান করানো দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। তিনি যমযম কূপের পানির সাথে তাঁর তায়েফস্থিত বাগানে উৎপন্ন কিসমিশ মিশিয়ে দিতেন। তিনি তৎকালীন সময়ের একজন বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। ইবনে হিশাম ও তাবারীর মতে তিনি প্রাচীন রাজবংশীয়দের ন্যায় জাঁক-জমকের সাথে বাণিজ্য সফরে বের হতেন। ব্যবসা করে তিনি বিপুল অর্থ উপার্জন করেন।

নবুওয়তের প্রথম পর্যায়েই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন কিন্তু বিশেষ কারণে তা গোপন রাখেন। আবূ তালিবের মৃত্যুর পর তিনি রাসূল (সা.)-এর পাশে এসে দাঁড়ান। হজ্জের সময় ইয়াসরীল বাসী নব দিক্ষিত মুসলমানদের সাথে আকাবার বৈঠকে গোপনে মিলিত হন এবং গুরুত্বপূর্ণ কিছু পরামর্শ দেন। বদরের যুদ্ধের

www.pathagar.com

দিন মুশরিকরা তাঁকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে বাধ্য করে। তিনি মুসলমানদের হাতে বন্দী হন এবং মুক্তিপণ আদায়ের মাধ্যমে মুক্তিলাভ করে মক্কায় ফিরে আসেন। পরবর্তীতে তিনি মদীনায় হিজরত করার অনুমতি চাইলে রাসূল (স.) তাঁকে মক্কায় থাকার পরামর্শ দেন।

হুনাইনের যুদ্ধের প্রথম ভাগে যখন মুসলমানদের অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে পড়েছিল এমনকি পরাজয়ের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিল তখন তিনি রাসূল (সা.)-এর উটের লাগাম ধরে সুদৃঢ় এবং শক্তভাবে দাঁড়ান। তিনি রাসূল (সা.)-এর নির্দেশে মুসলমানদেরকে যুদ্ধে বীরবিক্রমে পুনরায় ঝাঁপিয়ে পড়ার আহবান জানান। তাঁর জোরালো কণ্ঠের আহবানে মুসলমান সৈনিকরা মনের বল ফিরে পান এবং শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। ফলে মুশরিকরা চরমভাবে বিপর্যস্থ ও পরাজিত হয়।

রাসূল (সঃ) চাচা আব্বাস (রা.) কে পিতার মতই শ্রদ্ধা করতেন। সাহাবাগণও তাঁকে সম্মান ও মর্যাদার চোখে দেখতেন। তাঁর কাছ থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও উপদেশ নিতে কেউ কুণ্ঠাবোধ করতেন না। সুপরামর্শ দাতা হিসাবে তাঁর সুনাম ছিল।

ঐতিহাসিক ইবনে বাক্কার বলেন, 'অন্ন, বস্ত্রহীনদের আশ্রয় দাতা ছিলেন হযরত আব্বাস।'

হযরত ওমর (রা.)-এর শাসন আমলে মসজিদের জন্য তিনি নিজগৃহ দান করেন। তাঁর অবিস্মরণীয় তিনটি গুণের কথা কবিতার ভাষায় লিখেছেন ইবরাহীম ইবনে হারমা। তিনি লিখেছেন–

(১) জুলুম নিপীড়ন বন্ধ করা; (২) নাদার সম্বলহীন ক্ষুধার্থদের জন্য উটের গোশত এবং পানাহার সামগ্রী সরবরাহ করা; ও (৩) বস্ত্রহীনদের জন্য অন্ন বস্ত্রের ব্যবস্থা করা।

এস্তেস্কার নামাযে হযরত ওমর (রা.) আল্লাহ্ পাকের দরবারে মুনাজাত করতে গিয়ে বলেন, 'হে আল্লাহ্ পাক! আমরা আপনার প্রিয় নবীর উছিলায় মুনাজাত করে অনাবৃষ্টির গজব থেকে রক্ষা পেয়েছি। আজকে প্রিয় নবীর চাচাজানের উছিলা দিয়ে আপনার মহান দরবারে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছি। সুতরাং তার বরকতে বৃষ্টি বর্ষণ করুন। সাথে সাথে বৃষ্টি শুরু হলো।' রাসূল (স.) ব[illegible]ন, 'আব্বাস আমার আমি তার [illegible]'আদ ইবনে ওয়াক্কাস (রা.)

www.pathagar.com

বলেন, আমরা রাসূলে পাকের সাথে খেজুরের বাগানে বসা ছিলাম এমন সময় হযরত আব্বাসকে আসতে দেখে রাসূল (স.) বললেন, 'আব্বাস সমকালীন সকলের তুলনায় অধিক দানবীর এবং আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি সর্বাধিক সহানুভূতিশীল।'

ইবনে রবীয়া বলেন, 'একদিন হযরত আব্বাস ভারাক্রান্ত মনে রাসূল (সা.)-এর দরবারে হাজির হলে রাসূল (স.) কারণ জানতে চান। হযরত আব্বাস (রা.) বলেন, কুরাইশরা পরস্পর মিলিত হলে আনন্দিত হয় আর আমাকে দেখলে বিষণ্নমনা হয়ে যায়। এই শুনে রাসূল (স.) অসন্তুষ্ট হয়ে ইরশাদ করেন, যে আপনাকে এবং আল্লাহর রাসূলকে ভালবাসবে না তার অন্তরে কখনও ঈমান প্রবেশ করবে না। হে মানব সমাজ! যে আমার চাচার মনে কষ্ট দিবে সে আমাকে কষ্ট দিলো, কারণ চাচা প্রকৃতপক্ষে পিতাতুল্য।' তিরমিযী।

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স.) আপন চাচা আব্বাসকে বললেন, 'সোমবার দিন সকালে আপনি আপনার ছেলেকে নিয়ে আসবেন; আমি আপনার এবং আপনার ছেলের জন্য দোয়া করব। আল্লাহ্ পাক আমার দোয়ার অছিলায় আপনাদের কল্যাণ সাধন করবেন। সোমবার সকালে আমরা রাসূল (সা.)-এর দরবারে হাজির হলে তিনি আমাদেরকে একটি চাদর মুড়িয়ে এই দোয়া করেন, 'হে আল্লাহ! আব্বাস এবং তার সন্তানের জাহেরী বাতেনী সমস্ত গোনাহ্ মাফ করে দাও। তারা যেন কখনও গোনার কাজে লিপ্ত না হয়। হে আল্লাহ! আব্বাসকে তাঁর সন্তানের ব্যাপারে সংযত রাখ।'

হিজরী ৩২ সালের ১২ রজব তারিখে হযরত আব্বাস (রা.) ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। হযরত ওসমান (রা.) তাঁর জানাযার ইমামতি করেন। তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়। মুজাহিদ (রা.) বলেন, আব্বাস (রা.) মৃত্যুকালে ৭০টি গোলাম আযাদ করেছিলেন।

www.pathagar.com

গ্রন্থপঞ্জী

১. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম ও ২য় খণ্ড — দ্বিতীয় সংস্করণ, নভেম্বর ১৯৮৭। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

২. ইসলামী বিশ্বকোষ, বিভিন্ন খণ্ড — ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্প, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

৩. আসহাবে রাসূলের জীবন কথা — মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ; প্রথম প্রকাশ, ১-৩ খণ্ড। বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার।

৪. বিশ্বনবীর সাহাবী — তালিবুল হাশেমী; অনুবাদ ঃ আবদুল কাদের, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১-৫ম খণ্ড, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা।

৫. মহিলা সাহাবী — নিয়ায ফতেহপুরী, আনুবাদ ঃ গোলাম সোবহান সিদ্দিকী, তৃতীয় প্রকাশ-১৯৯৫; আল ফালাহ পাবলিকেশন্স।

৬. রাসূলুল্লাহর (সা.) সহধর্মিনীগণ — আলহাজ্জ মৌঃ মোঃ নূরুজ্জামান, দ্বিতীয় প্রকাশ –১৯৯৬, বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী লিঃ।

৭. বিশ্বনবীর দাম্পত্য জীবন — ফজলুর রহমান মুন্সী। প্রথম প্রকাশ –১৯৮৬। বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী লিঃ, ঢাকা।

৮. আসমাউর রিজাল বা রাবী চরিত — মাইন উদ্দিন সিরাজী, আল-বারাকা লাইব্রেরী, ঢাকা।

৯. আসমাউর রেজাল বাংলা — আবূল মোহছেন আবদুল্লাহ আল মাহমুদ, প্রথম প্রকাশ –১৯৯৪, ছাহাবা প্রকাশনী, লক্ষীপুর।

১০. বহুবিবাহ ইসলাম ও মুহাম্মদ (সা.) — আহমদ মনসুর, প্রকাশাল-১৯৯৫। তাসনিম পাবলিকেশন্স, মিরপুর ঢাকা।

১১. সংগ্রামী নারী — মোহাম্মদ নূরুজ্জামান, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা।

১২. খাতুনে জান্নাত ফাতেমা যোহরা (রাঃ) — শাহ আলম চৌধুরী, জান্নাত কিতাব মহল, চকবাজার, ঢাকা, আগস্ট – ১৯৮৫।

১৩. হযরত ফাতেমা যোহরা — কাজী আবুল হোসেন, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ৩য় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর – ১৯৯৬।

১৪. নবী পরিবারের প্রতি ভালবাসা – মাওলানা মাহমুদুল হাসান, মজলিসে ইলমী, দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী, ঢাকা, আগস্ট – ১৯৯৫।

১৫. মহিলা সাহাবী – তালিবুল হাশেমী, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ – জুন ১৯৯০।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com